মানস-গঙ্গার পথে

পরেশ ভট্টাচার্য



ক্লাসিক প্রেস

৩।১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—প্রথম প্রকাশ—
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

—প্রকাশক—
শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

—প্রচ্ছদপট—
শ্রীগণেশ বসু

—মুদ্রাকর—
শ্রীকালিপদ দত্ত
করুণা প্রিন্টার্স
২৭।২, অরবিন্দ সরণি
কলিকাতা-৫

ছয় টাকা

পরম পূজনীয়া

জননী শ্রীমতী সুরবালা দেবী

শ্রীচরণ কমলেষু

কৈশোরে স্বপ্ন দেখতাম হিমালয়ের। হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াবো এই ছিল বাসনা। সে বাসনা পূর্ণ হল যৌবনে। আপন করে নিলাম হিমালয়কে। মুসাফিরের বেশে হিমালয়ের পথচলা শুরু করলাম। কখনো তীর্থপথে, কখনো দুর্গম গিরি শিখরে, কখনো গঙ্গার উৎস সন্ধানে।

চলার পথে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছি হিমালয়কে তেমনি দেখেছি পথচলা অসংখ্য-তীর্থ পথিককে। যেমন দেখেছি—যা দেখেছি তারই আলেখ্য এই কাহিনীটি।

'মানস গঙ্গার পথে' ইতিপূর্বে 'শ্রীমন্ত' ছদ্মনামে চিত্রাঙ্গদা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনীটি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন শ্রীঅমলচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীমান মনীন্দ্র দাস। শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে এঁদের ঋণ শোধ করা যায় না।

পুস্তকে গ্রথিত আলোক চিত্রগুলি পেয়েছি বন্ধুবর শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অগ্রজপ্রতিম শ্রীপ্রবোধ দে মহাশয়ের কাছ থেকে। তাঁদের কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিনীত

'গ্রন্থকার'

এই লেখকের অন্য বই

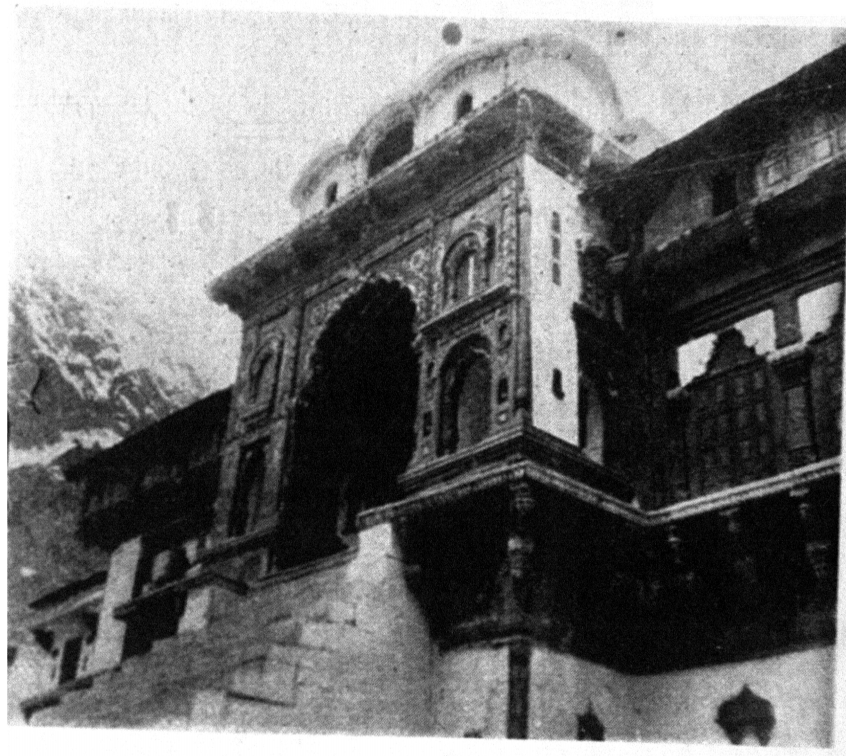
আমি মুসাফির

স্বর্ণমৃগ

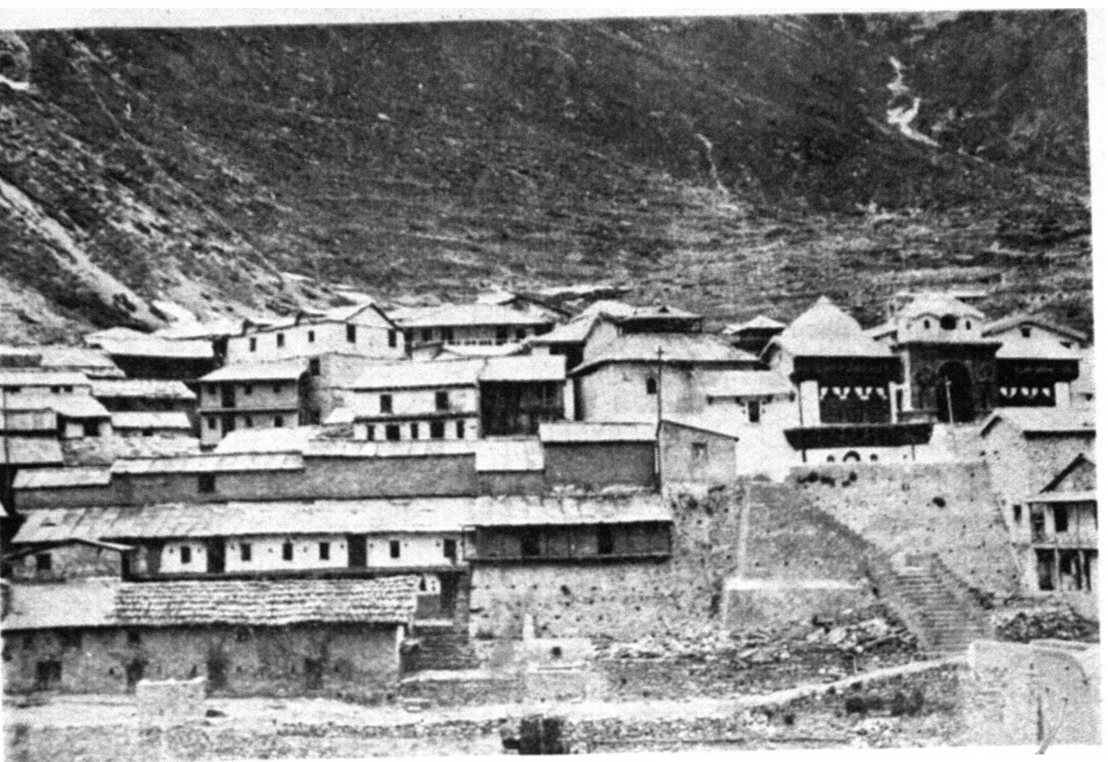
দরবারী কানাড়া

নাম তার রূপসী

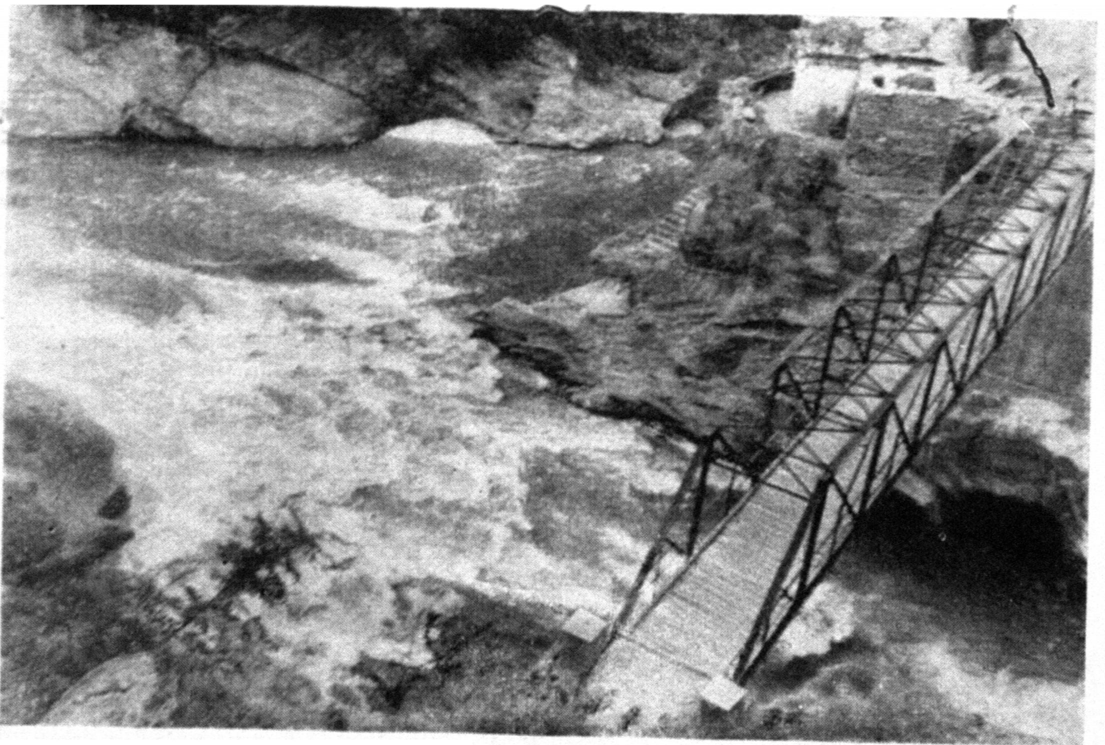
দুই দিগন্ত।



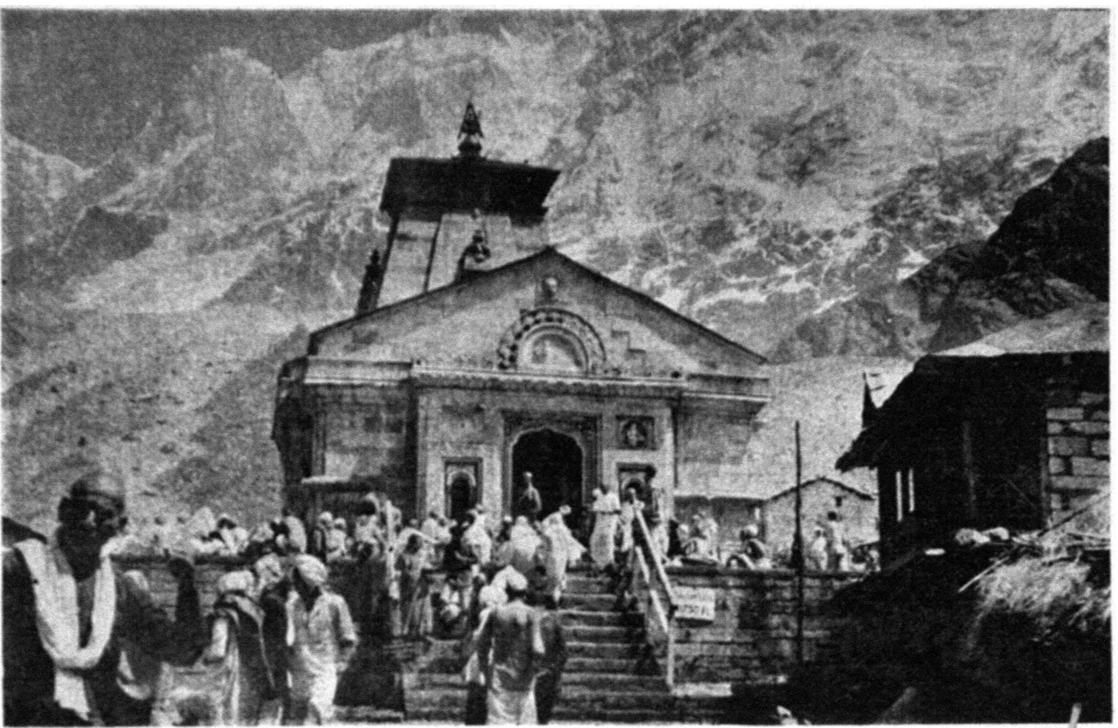
বদ্রীনাথের মন্দির



বদ্রীনাথের বসতি



বিষ্ণু প্রয়াগ



কেদারনাথের মন্দির



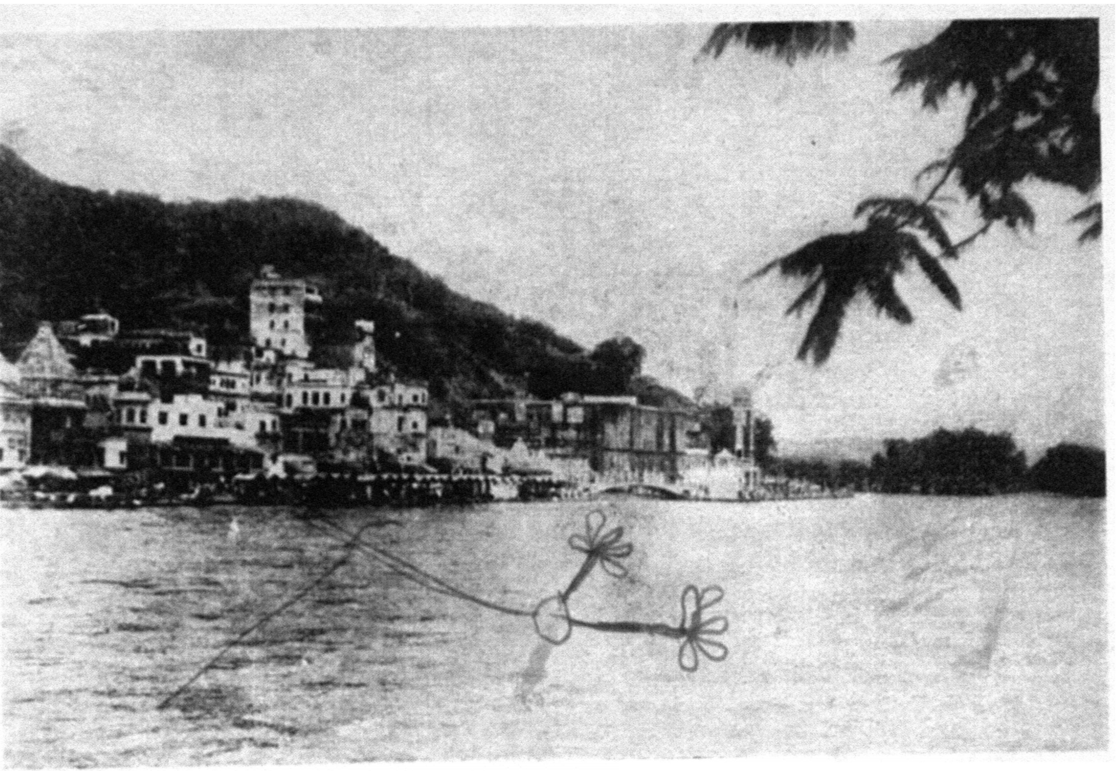
দেবপ্রয়াগ



হনুমান-চট্টি ছাড়িয়ে



ভোরের কর্ণ-প্রয়াগ



মায়াপুরী

কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে যাযাবর মন। উন্মাদ হয়ে ওঠে। বাধা মানে না। নিষেধ শোনে না।

অশান্ত মন। সমুদ্রের মতো। শান্ত হতে জানে না। হবে না। দুর্বার গতির আনন্দে সে পূর্ণ হতে চায়।

এক বাউল মানুষ লুকিয়ে আছে আমার মনের গোপনে। যে আমারে ডাক দিয়েছে—সে শুনেছে তার ডাক। সে আমাকে নিয়ে যাবে নতুন কোন ঠিকানায়।

কিন্তু কোথায় যাবো?

কেদার-বদ্রীর পথে।

তাই হবে।

বোশেখ মাস। অক্ষয়-তৃতীয়ার পরদিন। ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। আয়োজন নেই, আড়ম্বর নেই—শুধু নীরবে বাড়ীর বাইরে আসা। পেছনে কে দাঁড়িয়ে আছে ফিরে দেখার অবকাশ নেই—শুধু এগিয়ে চলার নেশা।

যথাসময়ে এসেছি হাওড়া ষ্টেশনে। ট্রেণে উঠেছি। বসেছি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণে জানালার ধারে। দেখছি কতো নর-নারী এসেছে, বিদায় মুহূর্তে তাদের প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে। কথা-হাসি-কলরব আর চোখের জল। যেন একটি একাংক নাটকের শেষ দৃশ্য।

—চিঠি দিও, কেমন থাকো জানিও, অজানা নারীকণ্ঠের শেষ-সংলাপ কানে এলো।—কিছু না পারো একটা পাথরের নুড়ি নিয়ে এসো।

এর পরেই ষ্টেশনের ঘণ্টা উঠলো বেজে। বার কয়েক বাঁশীর সংকেত দিয়ে চলতে শুরু করে ট্রেণ।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কেউ রুমাল ওড়াচ্ছে, কেউ চোখের জল মুছে মুখে হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কারো শেষ কথা বলা হয় নি, তাই চলন্ত

ট্রেণের কামরার জানালা ধরে ছুটছে। হায়রে দুরাশা—তবু শেষ কথা বলা হলো না।

আমাকে বিদায় জানাতে কেউ আসেনি। একটি রুমালও ওড়েনি আমার জন্যে। কোন দুটি চোখ ছল ছল করে ওঠেনি।

আমি একা। আমার পৃথিবীতে আমি একা।

বসে আছি জানালার ধারে। শহর—শহরতলী পেরিয়ে একের পর এক ষ্টেশন পেছনে রেখে দূর পাল্লার ট্রেণ ছুটে চলেছে।

জানালার ধারে বসে চেয়ে আছি রাতের আকাশের দিকে। চতুর্থীর চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে, শুধু আকাশের পটে আঁকা অজস্র নক্ষত্রের মুখ। তার মধ্যে উজ্জল নক্ষত্রটিকে খুঁজে বার করে তারই মুখ চেয়ে বসে আছি উন্মনা হয়ে।

জানি না কখন পেরিয়ে এসেছি পশ্চিমবাংলার মাটি। জানি না কখন কামরার কলরব থেমে গেছে—ঘুমিয়ে পড়েছে যাত্রীরা। জেগে বসে আছি ঘুম দূরের কথা তন্দ্রাও আমার এ দুচোখের বাইরে।

নিশুতি রাত। আকাশের কোণে উজ্জল নক্ষত্রটির মুখ চেয়ে বসেছিলাম। কখন যেন হারিয়ে গেল সে নক্ষত্রের মুখ। ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় বন্ধ হলো চোখের পাতা।

জানিনা কখন রাত শেষ হয়েছে। ঘুম ভাঙতে দেখি, পূব দিগন্তে রক্তিম ইসারা। সূর্য উঠছে। সূর্যের স্বাক্ষর বুকে নিয়ে জন্ম নিল একটি নতুন দিন।

বেলা বাড়ছে। ইতিমধ্যে মোগলসরাই, বারাণসী, জৌনপুর পার হয়ে এসেছি। আরও কত অজানা অচেনা গ্রাম-শহর-প্রান্তর রইলো পেছনে পড়ে। ট্রেণ ছুটে চলেছে সুমুখের পথে।

আগুন জ্বলছে আকাশে। প্রান্তর ধূ ধূ করছে বোশেখের খর তাপে। বাতাস নয়, যেন আগুনের হল্কা। কামরার জানালা খোলার উপায় নেই—বাতাসের সংগে উত্তপ্ত ধূলিকণা সূঁচের মতো গায়ে বিঁধবে। কামরার সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। কামরাটাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

অনবরত গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। জল আছে সংগে, কিন্তু পান করে তৃপ্তি নেই। গরম হয়ে উঠেছে জল।

প্রতিটি যাত্রী কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কারো মুখে কথা নেই, হাসি নেই। প্রতিটি যাত্রীর মনে একই চিন্তা, কখন দিন শেষ হবে।

সমস্ত দিন গেল প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে। অবশেষে উৎকণ্ঠার অবসান হলো। সন্ধ্যা নামলো। একটু আরাম যেন আমাদের জন্তে ছিল। ক্লান্তিকর দিনের যদিও অবসান হলো, কিন্তু সর্বাংগে জড়িয়ে এলো অবসাদ।

পঞ্চমীর চাঁদ উঠেছে আকাশের এককোণে। ভাঙা চাঁদ। তার আলোর মৃদু সংকেত পৃথিবীর মাটিতে।

পঞ্চমীর চাঁদ—কতটুকুই বা তার আয়ু। দেখতে দেখতে সে চাঁদ নিভে গেল। রাত এলো ক্লান্ত অবসন্ন যাত্রীদের ঘুম পাড়াতে।

আমার চোখেও ঘুম নামলো নিঃশব্দে। গাঢ় ঘুম। অগোচরে ফুরিয়ে গেল রাত। দিনের আলোর পদধ্বনি শুনে ঘুম ভেঙে যায়। ফিরে চাই দিগন্তের দিকে। যেখানে সূর্য উঠছে। শিশু সূর্য।

কামরার যাত্রীরা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমার মনেও সে অহেতুক চাঞ্চল্য। সময় হয়ে এলো। আর ঘণ্টা দুয়েক বাদেই পৌঁছবো হরিদ্বার। কিন্তু এই সামান্য সময়টুকু যেন কাটতে চায় না। মনে হয় আর কতদূর—

বেলা আটটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। ট্রেণ এসে দাঁড়ালো হরিদ্বারে। ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে নেমে পড়ি। অগণিত যাত্রীর ভিড়ে আমিও একজন পথিক—পথ চিনে চিনে এলাম ভোলাগিরির ধর্মশালায়।

যাত্রীর ভিড়ে গমগম্ করছে ধর্মশালা। অনেকে ঘরে জায়গা না পেয়ে বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে। সবাই অচেনা, অজানা। তবু চেয়ে চেয়ে দেখি, যদি চেনা মুখ দেখতে পাই।

জিনিষপত্তর ঘরে রেখে এলাম হর-কী-প্যারীতে। প্রাণ-মন ভরে গেল অনির্বচনীয় আনন্দে। সামনে গঙ্গার জলধারা, নীল নীল রং। কাঁচের মতো স্বচ্ছ। বয়ে চলেছে অবিরাম ধারায়। যতি নেই—ছেদ নেই।

দেবভূমি হরিদ্বার। হিমালয় কন্যা গঙ্গা এখানে মর্তের মাটি স্পর্শ করেছে। স্বর্গের মন্দাকিনীর অমৃতধারা মর্তকে দিয়েছে তার অমৃত স্পর্শ। তাই পুণ্যতীর্থ এই হরিদ্বার। লক্ষ যুগের তীর্থ-পথিকের চরণ স্পর্শে এখানকার ধূলিকণা হয়েছে স্বর্ণরেণু।

নীল ধারার পারে চণ্ডী পাহাড়। শিখরে যার দেবী চণ্ডীর মন্দির। এদিকে মনসা পাহাড়ের শীর্ষে মনসাদেবীর মন্দির। মনসা পাহাড়ের ওপারে সূর্যকুণ্ড—পাদদেশে বিশ্বেশ্বর মহাদেব। পুণ্য তীর্থ হরিদ্বার। হর-কী-প্যারী,

হরি-কী-চরণ, গঙ্গা মন্দির, ব্রহ্মকুণ্ড—যুগ যুগ ধরে তীর্থ-পথিককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ইতস্তত ঘুরে ঘুরে ফিরে এসেছি কুশাবর্ত ঘাটে। স্নান, দান, তর্পণ করছে যাত্রীরা। কানে আসছে সুমধুর মন্ত্র—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতা মহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্
আব্রহ্মভুবনোল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥

স্নান করেছি। সুশীতল গঙ্গার জল। স্নানের সংগে ধুয়ে মুছে গেছে সঞ্চিত অবসাদ। তারপর ফিরে এসেছি ধর্মশালায়।

ভেবেছিলাম, কনখল যাবো। পবিত্র তীর্থ কনখল। যেখানে দক্ষরাজ দুহিতা সতীর সংগে শিবের বিবাহ হয়েছিল। রাজকন্যা সতী আর সর্বত্যাগী শংকর। যাঁদের কথা অমর হয়ে আছে, পুরাণ-কাব্য-গল্প-কাহিনী আর উপকথায়। কিন্তু এ যাত্রায় হলো না কনখল যাওয়া। বেলা চারটের আগেই যে রওনা হতে হবে হৃষীকেশের পথে।

দুপুর থেকে বিকেল। যেটুকু সময় হাতে ছিল, চুপচাপ বসে রইলাম ধর্মশালার বারান্দায়।

যে পথে যাবো—মনে মনে সে পথের স্বপ্ন-ছবি এঁকে চলেছি। হিমালয়ের দুর্গম পথে এর আগেও পথ হেঁটেছি, এর আগেও গায়ে মেখেছি হিমালয়ের পথের ধুলো, পাথরে পাথরে চুম্বন দিয়েছি, ঝরণায় করেছি অবগাহন, গুহায় তৃণশয্যায় রাত কাটিয়েছি—আবার যখনই ফিরে এসেছি সে পথ থেকে, তখনই হিমালয় আমার কাছ থেকে লক্ষ যোজন দূরে সরে গেছে। ফিরে এসেছি নিজের ঠিকানায়, কিন্তু শান্তি পাইনি। চির-বৈরাগী হিমালয়কে যে ভালোবেসেছে, ঘরের ঠিকানায় সে কেমন করে শান্তি পাবে। তাইতো অশান্ত মন বারবার ছুটে যেতে চায় সেই পথে। কতোবার মনে করেছি, হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াবো সারাটি জীবন—শেষ পর্যন্ত সেই হিমালয়ের পথ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে পুরোনো ঠিকানায়।

দুদণ্ড বসে চিন্তা করার অবসর নেই। বেলা চারটে বাজে। এখনি রওনা না হলে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ। মাত্র কয়েক মাইল পথ। শহর-শহরতলী পার হয়ে অরণ্যের বুক চিরে গেছে হৃষীকেশের পথ।

মাঝপথে বাস দাঁড়ালো। এখানের জঙ্গলের মধ্যে সত্যনারায়ণজীর মন্দির আর কালী কমলিওয়ালার ক্ষেত্র। অধিকাংশ যাত্রী নেমে গেল মন্দিরে দেব দর্শন করতে। আমি যেমন ছিলাম, তেমনি বসে রইলাম বাসের এক কোণে।

কয়েক মিনিটের যাত্রা বিরতি। তারপর আবার চলতে আরম্ভ করলো বাস। একভাবে তাকিয়ে আছি অরণ্যের দিকে। গভীর অরণ্য।

সামান্য পথ ফুরিয়ে এলো দেখতে দেখতে। হৃষীকেশের মাটিতে পা দিয়েই পথের ধূলিকণা মাথায় তুলে নিলাম।

আশ্রয়ের সন্ধানে প্রথমে এলাম কালী কমলিওয়ালার ধর্মশালায়। স্থান নেই। গেলাম গোপাল কুঠিতে। একই অবস্থা। শুনলাম, দুটি ঘর খালি আছে, কিন্তু ঘর দুটি তালাবন্ধ রয়েছে উড়িষ্যার কোন এক মহারাণীর জন্যে। মহারাণী আসবেন এক সপ্তাহ পরে, ঘর দুটি তালা বন্ধ রয়েছে পনেরো দিন আগে থেকে। রাজারাজড়ার ব্যাপারই আলাদা। শেষে এলাম ভগবান আশ্রমে। ঘর খালি আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার একার জন্যে একটি ঘর দিতে নারাজ। অগত্যা স্থান করে নিলাম নীচের তলার বারান্দায়। যেখানে আরও যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়েছে। কম্বল বিছিয়ে নিয়ে আধশোয়া ভংগীতে বসে আছি। দেখছি অন্য যাত্রীদের। শুনছি তাদের কথাবার্তা, হাসি, কলরব।

অচেনা অজানা পরিবেশ। অপরিচিত মানুষের ভিড়। এখানে অন্যের মতো আমিও পথিক। তবে তীর্থ-পথিক হয়ে পুণ্যের নেশায় আমি আসিনি। এসেছি বাউল মনের তাড়নায়। যাযাবরের মতো ছুটে চলবো এই আশায়। অথচ এই মুহূর্তে আমি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। বুঝতে পারি এ অবসাদ অর্থহীন।

ধর্মশালার বাইরে এলাম রাত সাড়ে নটায়। কিছু না খেলে নয়। কাছেই ছোট একটি হোটেলে রাতের আহার্য গ্রহণ করে আবার ফিরে এসেছি ধর্মশালায়।

রাত সাড়ে দশটা হবে, একদল অবাঙালী যাত্রী এলো কলরব করতে করতে। ঘরে জায়গা নেই। যে যার বোঁচকাবুচকি নিয়ে বারান্দায় বসে গেল। কথাবার্তায় বুঝতে পারি ওরা আসছে পাটনা থেকে, যাবে কেদার-বদ্রী দর্শন করতে। ওরা কথা বলছে বলুক, গল্প করছে করুক—আমি আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙলো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটবার আগে। এর-ই মধ্যে শুরু হয়েছে যাত্রীর কলরব। কোন কোন দলের বিছানা-পত্তর বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে।

রুদ্রপ্রয়াগের বাস ছাড়বে সওয়া সাতটায়। গতকাল আসার সময় নাম লিখিয়ে এসেছি বাস কোম্পানীর অফিসে, জানি টিকিট পাওয়ার অসুবিধে হবে না। প্রথমেই বাসষ্ট্যাণ্ডে না এসে গেলাম বাজারে, একটা লাঠি সংগ্রহ করতে।

পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া রঙিন টুপী, দু'কাঁধে ঝোলাঝুলি, হাতে লাঠি—টিকিট কেটে এসেছি রুদ্রপ্রয়াগগামী বাসে।

'জয় কেদারনাথ কী জয়—জয় বদ্রী বিশাল কী জয়'—যাত্রীদের সমবেত জয়ধ্বনির মধ্যে বাস চলতে শুরু করে।

একনাগাড়ে জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছে যাত্রীদল। একটি নয়, দুটি নয় পঁচিশটি যাত্রী বোঝাই বাস। হৃষীকেশের পথে ধুলো উড়িয়ে চলেছে একের পর এক।

আমার কণ্ঠে ওই জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগলো না। কিন্তু মনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি আর উন্মাদনা। কোথায় ছিলাম, কোথায় চলেছি, আর কোথায় যাবো! চিন্তায় ছেদ পড়লো লছমনঝোলায় পৌঁছে। একের পর এক বাসগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের তাঁবুর সামনে।

প্রতি যাত্রীকে এখানে দেখাতে হবে কলেরা ও বসন্তের প্রতিষেধক নেওয়ার প্রমাণপত্র। নইলে প্রতিষেধক ইনজেকশন নিতে হবে। যাদের সংগে প্রমাণপত্র আছে তারা নিশ্চিন্ত। নইলে অংগে সূঁচ বিঁধবেই।

আধঘণ্টার জন্যে বাস দাঁড়ালো। তারপর চলার নির্দেশ পেয়ে একে একে চলতে আরম্ভ করে। জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখলাম লছমনঝোলার বিখ্যাত ঝুলন্ত পুল। দেখতে পেলাম স্বর্গাশ্রম, গীতাভবন। দূর থেকে দেখা, না দেখার সামিল। ইচ্ছে রইলো প্রত্যাবর্তনের পথে দুদিন কাটিয়ে যাবো এখানে।

লছমনঝোলায় গঙ্গার সেতু পার হয়ে বাস ছুটে চলেছে। এবারে পার্বত্য পথের সূচনা। পথের ধারে ইংরেজীতে লেখা সতর্কবাণী—'সাবধান, দুর্গম পার্বত্য পথ তোমার সামনে'।

পাহাড়ের পাদদেশ ধরে প্রশস্ত সড়কের ওপর দিয়ে চলেছি। যে দিকে চাই পাহাড়ের প্রচ্ছদপট। পথের দুধারে ঘন অরণ্য। খর বোশেখের তাপেও সে অরণ্যের শ্যামলিমা ম্লান হয়নি। দুচোখ ভরে যায় অরণ্যের সৌন্দর্য সুষমায়। মন ভরে যায় বৈচিত্র্যের প্লাবনে।

ক্রমে পাহাড়ের পাদদেশ ছেড়ে পথ চলে গেছে চড়াই-এ। এ চড়াই এমন কিছু নয়। কিন্তু যতো এগিয়ে চলেছি ক্রমেই পথ দুর্গম হয়ে পড়ছে। একদিকে পাহাড়ের দেয়াল, অন্য দিকে গভীর খাদ।

খোলা জানালার ধারে বসে আছি। দুচোখে দেখার নেশা। দেখছি। প্রতি মুহূর্তের সংগে বিস্ময় জড়ানো। একই পাহাড়, একই অরণ্য—কিন্তু একটি পাথরের নুড়ি, একটি সবুজ তৃণের মধ্যেও জড়িয়ে আছে সে বিস্ময়।

এবারে কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই। কখনো সে পথ সমান্তরাল রেখার মতো চলে গেছে দৃষ্টির অন্তরালে।

দুর্গমকে সুগম করেছে মানুষ। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক সুবিধে দিয়েছে, অনেক সুযোগ। আজ যে পথে বাস ছুটেছে, একদিন এই পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হতো।

এই পথ আজকের নয়। হাজার হাজার বছর আগেও এই হিমালয়ের বুকে ছিল পথরেখা। পুরোনো দিনের সে পায়ে চলা পথ আজ তার কৌলিন্য হারিয়েছে। আজ সে অপাংক্তেয়ের মতো পড়ে আছে পাহাড়ের বুকে। কিন্তু একদিন সেই পথ অনুসরণ করে স্বর্গের সন্ধানে গিয়েছিলেন মহাভারতের নায়ক-নায়িকা। যুগ যুগ ধরে সেই পথে পায়ের চিহ্ন এঁকে গেছেন কতো মুনি, ঋষি, মহাপুরুষ—আবার গৃহী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলের দল সেই পথে গেছে স্বর্গের ঠিকানা খুঁজতে। দুঃখ, কষ্ট, বিপদকে সে মানুষ পরোয়া করেনি, পর্বতের বাধাকে গ্রাহ্য করেনি, জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও সে ভয় পায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের চরণস্পর্শে সে পথ ধন্য। এই পাহাড়, নদী, ঝরণা, অরণ্য জানে সে পথের ইতিহাস—তার ইতিকথা লেখা আছে পাথরের টুকরোর বুকে, ধূলিকণার অন্তরে।

বেলা সাড়ে এগারোটা।

দেবপ্রয়াগে বাস দাঁড়ালো। এখানে আধঘণ্টার জন্যে যাত্রা বিরতি।

ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গম তীর্থ এই দেবপ্রয়াগ। পঞ্চ-প্রয়াগের অন্যতম। অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র, লঙ্কা-যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করার পর পাপ মুক্তির জন্যে এখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির।

কাছেই পাহাড়ের ওপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে দেবী মন্দির। দেবী মন্দিরের প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ ঘণ্টা—বহু যোজন দূর থেকেও যে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়।

সঙ্গম ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওপর শিবলিঙ্গ। মন্দির নেই। অনাবৃত অবস্থায় দেবাদিদেব বিরাজ করছেন।

মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর এই শহর দেবপ্রয়াগ। মানুষের বসতি, দোকানপসার, মন্দির, ধর্মশালা, ডাকঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র—সবই আছে।

ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই ঘুরে ঘুরে দেখার। সংক্ষিপ্ত অবসর। একটি দোকান থেকে শুকনো রুটি তরকারী খেয়ে পথের ধারে একান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। দেখছি, ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গম ক্ষেত্র। শুনছি মিলিত জলস্রোতের তীব্র কলোচ্ছাস।

ইতিমধ্যে ফিরতি পথের বাসগুলো এসে পৌঁছলো একের পর এক। সামান্য দুপাঁচ জন যাত্রী তাতে। এখনও যে তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হয়নি।

'জয় কেদারনাথ কী জয়—জয় বদ্রী বিশাল কী জয়'—আবার সেই মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি। ক্ষণ-বিরতির পর আবার শুরু হবে যাত্রা।

মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে বাসগুলো চলতে আরম্ভ করলো। মুখর হয়ে উঠলো আমাদের চলার পথ। শুধু আমি নীরব, এখনও একটি বারের জন্যে আমার কণ্ঠে ওই ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগেনি।

দেবপ্রয়াগ পেছনে পড়ে রইলো। পেছনে চলে গেল সুমুখের পথ। চলেছি শ্রীনগরের পথে। খোলা রেখেছি দৃষ্টির দর্পণ। যতদূর চাই—শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সংখ্যা নেই, শেষ নেই।

পাহাড়ের গায়ে কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও ছোট ছোট গ্রাম, কোথাও ঢালু পাহাড়ের গায়ে ফসলের জমি। কতো পরিশ্রমে এ-দেশের মানুষ এই অকরুণ মাটিতে ফসল ফলায়। কতো মেহনত, কতো যত্ন।

দুর্গম পথ আরও দুর্গম হচ্ছে। খাদের দিকে চাইলে ভয় হয়। নীচে, অনেক নীচে নেমে গেছে খাদ। গভীর খাদ। যেখানে বয়ে চলেছে অলকানন্দার জলধারা।

একদিকে খাদ, অন্যদিকে পাহাড়ের বাধা—তার-ই মধ্যে সংকীর্ণ বঙ্কিম পথ। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। তার ওপর বিপদজনক বাঁক। প্রতি মুহূর্তের চিন্তা—যদি ড্রাইভার এক সেকেণ্ডের জন্যে অন্যমনস্ক হয়? যদি কোন কারণে এন্‌জিন বিকল হয়ে যায়, যদি—

হঠাৎ বমির শব্দে ফিরে তাকাই। আমার পাশে বসে এক রাজস্থানী বৃদ্ধ, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বমি করছে। বমি করার পর বৃদ্ধ বুক চেপে হাঁপাতে আরম্ভ করলো। বলে বোঝাতে চাই—বমি বন্ধের ওষুধ আছে আমার কাছে, খেলে বমি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কথা কিছুতেই বোঝাতে পারি না বৃদ্ধকে। শেষটা ঝুলি থেকে ওষুধের বড়ি বার করে ইংগিতে বোঝাই—এটা খেলে বমি বন্ধ হবে। এতোক্ষণে বৃদ্ধ হাত পেতে নিল ওষুধের বড়ি।

ওষুধে কাজ হয়েছে। বমি বন্ধ হয়েছে বৃদ্ধের। ও ওর নিজের ভাষায় আমাকে জানালো, বাবা কেদারনাথ আমার ভালো করবেন। আরও কয়েকটি হাত এগিয়ে এলো। বমি বন্ধের দাওয়াই চাই। কাউকে নিরাশ করি না। কেনই বা করবো? যে ওষুধ আমার সংগে আছে, তাতে অনেকের প্রয়োজন মিটতে পারে।

হৃষীকেশ থেকে আসছি এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন রাজস্থানী নর-নারীর দলটির সংগে। ওদের ধরনধারণ দেখে মনে হয়, রাজস্থানের কোন গ্রামাঞ্চল থেকে ওরা আসছে। দল বেঁধে চলেছে কেদার-বদ্রী দর্শন করতে।

—মহারাজ, রুদ্রপ্রয়াগ আর কতো দূর? রাজস্থানী বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলে।

মহারাজ! সম্বোধনে বিস্মিত হই। পরক্ষণে ভাবি, আমার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা—ওদের চোখে আমি সাধু মহারাজ।

রুদ্রপ্রয়াগ এখনও অনেক দূর, পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে—শুনে বৃদ্ধ চোখ কপালে তুলে বলে ওঠে—হা ভগবান।

একা ওই বৃদ্ধ নয়, বাসের প্রতিটি যাত্রী যেন পথের ধকলে কাতর হয়ে পড়েছে। সকলের চোখে মুখে ব্যাকুল উৎকণ্ঠার চিহ্ন। ওরই মধ্যে ক'জন যাত্রী মাঝে মাঝে কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে নিজেদের চাঙ্গা করে তুলছে।

চড়াই পেরিয়ে উৎরাই পথে নামছে বাস। দূরে উপত্যকা নজরে পড়লো। কীর্তিনগরের পথে চলেছি। দেখতে দেখতে কীর্তিনগর পার হয়ে এলাম। চলেছি শ্রীনগরের পথে। সুন্দর মসৃণ পথের ওপর দিয়ে বাস ছুটেছে। পথের দু'ধারে গাছের সারি। ছায়া জড়ানো মনোরম পথ। এতোক্ষণে রাজস্থানী নর-নারীর দলটি যেন কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে।

বেলা আড়াইটে। শ্রীনগরে পৌঁছে বাসগুলো পরপর দাঁড়ালো। ফিরতি পথের বাস না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

গাড়োয়ালের অন্যতম শহর এই শ্রীনগর। কিংবদন্তী বলে, সত্যযুগে রাজা সত্যসন্ধ এখানে বহুদিন তপস্যা করেছিলেন। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত যাই হোক, শ্রীনগরের ইতিহাস আছে।

প্রাচীন কালের বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত এই শ্রীনগর—অতীতের রাজন্য-বর্গের রাজধানী শ্রীনগর, বর্তমানে রাজধানী না হলেও গাড়োয়ালের অন্যতম শহর রূপে পরিগণিত।

শ্রীনগরের অন্যতম আকর্ষণ কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সেই সুদূর অতীত কাল থেকে কতো রাজার রাজত্বকাল শেষ হয়েছে এই শ্রীনগরে, ঘটেছে কতো পতন-উত্থান, অলকানন্দার স্ফীত জলধারায় বারবার প্লাবিত হয়েছে এই শহর, কমলেশ্বর মহাদেব যুগযুগ ধরে তা প্রত্যক্ষ করেছেন মহাকালের মতো।

দাঁড়িয়ে আছি শহরের রাজপথে। দাঁড়িয়ে আছি অচঞ্চল। দেখছি, যে পথ পেছনে রেখে চলে এসেছি, সেই পথের দিকে। এই মুহূর্তে আবার সেই পুরোনো চিন্তা—কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, কোথায় যাবো।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ফিরতি বাসগুলো সাড়ে তিনটের পর। একটি বাস বিকল হয়েছিল পথে, তাই এতো দেরী। বিরতির ক্ষণটুকু ফুরালো এতোক্ষণে। আবার শুরু হলো আমাদের চলা। শ্রীনগরের পথ মুখর হয়ে উঠলো হাজার কণ্ঠের মিলিত জয়ধ্বনিতে।

উপত্যকার পথ শেষ হতে শুরু হলো চড়াই। পথও বিশ্রী ধরনের। যেমন সংকীর্ণ, তেমন অসমতল। এক নাগাড়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চড়াই পথে উঠছে বাস। তার ওপর ধুলো। নাকে মুখে কাপড় দিয়েও নিষ্কৃতি নেই।

রাজস্থানী মেয়েরা আচমকা গান গাইতে শুরু করে দেয় সমস্বরে। তাতে না-আছে সুর, না আছে সুরেলা কণ্ঠের স্পর্শ—তাল-লয়-মাত্রা দূরে থাক। একে এই পথের ধকল, তারপর এই বেসুরো গান।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খাদের দিকে ফিরে চাই। গভীর খাদ। হারিয়ে গেছে কোন অতলে। অলকানন্দার জলরেখাও হারিয়ে গেছে কোন অন্ধকারে।

এক পাহাড় পার হয়ে আর এক পাহাড়ে। আবার সে পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি অন্য পাহাড়ে। গোলকধাঁধার মতো চলে গেছে এই পথরেখা।

বাসের ক্লিনার নন্দলাল, হৃষীকেশ থেকে আমার পাশে বসে আসছে। ওর কাছ থেকে গাড়োয়ালের কথা শুনছিলাম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটি বাঁকের কাছে এসে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ সেই দূর পাহাড়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ও। তারপর চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, ওই পাহাড় পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। আগাগোড়া বালি আর পাথরে গড়া ওই পাহাড়। যখন তখন ধ্বস নামে। গেল বছর ওই পথে ঘটেছিল এক নিদারুণ দুর্ঘটনা। ধ্বস নেমে যাত্রীবাহী বাস পড়েছিল খাদের মধ্যে। বেঁচে থাকা দূরের কথা, একটি দেহও অবিকৃত ছিল না। সৈন্যবাহিনীর লোক চার পাঁচ দিন ধরে খোঁজাখুঁজি করে অলকানন্দার গর্ভ থেকে কয়েকটি গলিত শব উদ্ধার করেছিল মাত্র।

সত্যি, এ পাহাড়ের আগাগোড়া বালি আর টুকরো পাথরে গড়া। এখনো জায়গায় জায়গায় ধ্বস নেমে পথ সংকীর্ণ হয়ে রয়েছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে বাস চালিয়ে নিয়ে চলেছে ড্রাইভার। ষ্টিয়ারিং একটু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষে নেই। তার ওপর একটানা চড়াই আর বিপদজনক বাঁক। প্রতি মুহূর্তে ভয়ার্ত শিহরণ জাগে মনে।

যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, নন্দলাল সে জায়গাটি দেখিয়ে বললে, এখানে এলে আমার বুক কেঁপে ওঠে বাবুজী। নন্দলাল বাসের ক্লিনার, আমার দোস্ত্।

জিজ্ঞাসা করি—কতো দিন তুমি এ পথে যাতায়াত করছো নন্দলাল।

—তিন বছর। জীবন হাতে করে বাসে চলাফেরা করি। রোজ সকালে যখন কাজে বেরোই, তখন ভাবি আজও কি বেঁচে থাকবো! সন্ধ্যে বেলা ডেরায় পৌঁছে তবে মনে করতে পারি আমি বেঁচে আছি। শংকরজী, আর নারায়ণজী ভরসা—বলে হাত জোড় করে প্রণাম করলো নন্দলাল।

কোথাও কিছু নয়, আচমকা বাস দাঁড়ালো। পর পর সব কটি বাস দাঁড়িয়ে গেছে। ঘটনা এই, ধ্বস নেমে পথ বন্ধ হয়েছে। পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরিষ্কার হতে কম পক্ষে আধ ঘণ্টা সময় লাগবে।

অধিকাংশ যাত্রী নেমেছে বাস থেকে। দেখছি যাত্রীদের। পা থেকে মাথা অব্দি ধুলোয় ঢাকা। গেরুয়া রং-এর ধুলো।

পথের ধারে গিয়ে দাঁড়াই। অতলস্পর্শী খাদ। অলকানন্দাকে দেখতে পাচ্ছি না। শুনছি তার চলার শব্দ। গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে উপল খণ্ডের বাধা অতিক্রম করে ছুটে চলেছে অলকানন্দা।

যেদিকে তাকাই, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। অদূরে পাহাড়ের কোলে মানুষের বসতি। ছোট ছোট গ্রাম। দূর থেকে ছবির মতো দেখায়। নীচে পাহাড়ের গায়ে ফসলের ক্ষেত। এখন ফসল নেই। শূন্য ক্ষেত পড়ে রয়েছে।

দেখতে দেখতে পাঁচটা বাজলো। সূর্য মুখ ঢেকেছে পাহাড়ের আড়ালে। তবে দিন শেষ হতে এখনো দেরী আছে।

পথ পরিষ্কার হয়েছে। আবার যে যার বাসে উঠলো। এবারেও অজস্র-কণ্ঠে জাগলো জয়ধ্বনি। 'জয় কেদারনাথকী জয়'।

আজকের মত চড়াই পথের শেষ। বাস চলেছে উৎরাই পথে। চক্রাকারে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ গেছে নীচে। অনেক নীচে।

তবু যেন পথ ফুরোয় না। কতোক্ষণে পৌঁছবো রুদ্রপ্রয়াগ। হয়তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

হঠাৎ দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো দূরে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গম। মন্দাকিনী আর অলকানন্দার দুইধারা এসে মিশেছে।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে আজকের মতো পূর্ণচ্ছেদ পড়লো যাত্রার। নদীর এপারে বাসষ্ট্যাণ্ড। কিন্তু সঙ্গম ক্ষেত্রে যেতে হলে অলকানন্দার পুল পার হয়ে যেতে হবে ওপারে।

এলাম সঙ্গমের কাছে। দেখলাম অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম ক্ষেত্র। সঙ্গমের ওপরেই রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দির। দর্শনার্থীর ভিড় সেখানে। সিঁড়ি পথে নামবার মুখেই কালি ঔষধালয়—একটি দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র। সামনেই পাহাড়ের ওপর সচ্চিদানন্দ আশ্রম। উঠবার সিঁড়ি আছে। শুনলাম, এ আশ্রমে তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থাও আছে।

আশ্রমের অধ্যক্ষের সংগে দেখা করলাম। স্বল্পভাষী মানুষ। চলনসই বাংলা বলতে পারেন। আশ্রয়ের কথা বলতে স্বামীজি না বলতে পারলেন না। তবে আমি একা এসেছি শুনে একটু ইতস্তত করলেন। এক জনের জন্যে একটি ঘর ছেড়ে দিলে আর পাঁচজনের অসুবিধে হতে পারে।

বললাম—আমাকে একটি ঘর না দিলেও চলবে। অন্যের সংগে থাকতে আমার আপত্তি নেই।

স্বামীজি মৃদু হেসে একটি ঘর দেখিয়ে বললেন—ঠিক আছে, আপনি ওঘরে জিনিষপত্তর রাখুন। যদি তেমন বুঝি আরও দু'চারজনকে ওঘরে পাঠাতে পারি।

ঝোলাঝুলি ঘরের কোণে রেখে সাবান গামছা নিয়ে কলতলায় এলাম। সর্বাংগে ধুলো। গা না-ধুলে নয়। গায়ের জামা খুলেছি এমন সময় শুনতে পেলাম স্বামীজির কথা—আহা, ও কাজটি করবেন না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। দেখছেন না, কী রকম ঠাণ্ডা এখানে। তার ওপর ওই কলের জল লাগাবেন না সন্ধ্যে বেলা। এমনি মুখহাত ধুয়ে ফেলুন।

মুখ হাত ধুয়ে জিনিষপত্তর গোছগাছ করে ঘরে শিকল টেনে বাস কোম্পানীর আফিসে এসেছি। নাম না-লেখালে টিকিট পাওয়া যায় না। নামের তালিকা অনুযায়ী টিকিট দেওয়া হয়।

যাত্রীর অনুপাতে বাসের সংখ্যা কম। আসছে কাল তো টিকিট পাওয়া যাবে না, এমন কি পরশুর টিকিটও মিলবে কি-না সন্দেহ! তবে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, কাল থেকে কয়েকটি বেশী বাস চালু করতে পারবেন। এখানেই শুনলুম, প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রী ইতিমধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে এসে অপেক্ষা করছে।

—দাদা, আপনার নাম লেখানো হয়ে গেছে? ফিরে দেখি একজন বাঙালী ভদ্র মহিলা। একনজরে দেখে বুঝতে পারিনি, ভালো করে লক্ষ্য করলাম। মহিলা হয়তো বয়সের হিসাবে তরুণী। দেখে মনে হয়, কোনদিন তন্বী ছিল না। গায়ের রং কালো, পাকানো চেহারা, তার ওপর বিশ্রী রকমের ঢ্যাঙা আর রোগা। পরনে আটপৌরে শাড়ী, গায়ে স্কার্ফ—কমলালেবু রঙের। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কুমারী, কি বিধবা—বুঝতে পারি না।

—বাস জার্নি কেমন লাগলো বলুন? মহিলা অন্তরংগ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে।

—চমৎকার, মনে রাখবার মতো।

—চমৎকার মানে? আমার তো হাড় মাস ব্যথা হয়ে গেছে। কী বলবো দাদা, আগে জানলে আসতুম না। কষ্ট হবে জানি, কিন্তু এমন কষ্ট জানলে—বলতে বলতে মহিলা কথা বন্ধ করলে। পরক্ষণে বললে—না, না, নিশ্চয়ই আসতুম। তবে—না, সে কথা ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না দাদা।

মহিলার কথার ধরনে আমি বিস্মিত। কী রকম খাপছাড়া লাগলো প্রথম আলাপে।

—কোথায় উঠেছেন? বাস কোম্পানীর অফিসের বাইরে এসে মহিলা জিজ্ঞাসা করলে।—ধর্মশালায় নিশ্চয়ই।

—না। সচ্চিদানন্দ আশ্রমে।

—আমরা উঠেছি কালী কমলিওয়ালার ধর্মশালার পাশে একটা চটিতে। কিন্তু কী মুস্কিল বলুন তো, যে রকম শুনছি তাতে মনে হয় দু'তিন দিন মিছে বসে থাকতে হবে রুদ্রপ্রয়াগে।

—হয় হবে।

—হয় হবে, তার মানে? মহিলা ঠোঁট চেপে 'চুষ' শব্দ করে বললে—যেখানে যাবো বলে বেরিয়েছি, সেখানে না পৌঁছনো অব্দি কি স্বস্তি আছে।

—দু'দিন আগে আর পরে। এইতো কথা।

খানিক পথ এগিয়ে এসে মহিলা জানতে চাইলে, আমার সংগে আর কেউ আছে কি-না। আমি একা এসেছি শুনে ভদ্রমহিলা মুচকি হেসে বললে—পথের আনন্দ আপনি পুরোপুরি উপভোগ করবেন দেখছি।

মহিলা আমার পেছনেই আসছে। আমার কথা বলার অপেক্ষা না করে নিজের মনে বকেই চলেছে। আর মাঝে মাঝে জানতে চাইছে, আমি তাঁর কথা শুনছি কি-না।

—এই আমাদের ঘর। ভদ্রমহিলা পাশেই একটি দোতলা বাড়ীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললে—আসুন না দাদা। মা-পিসিমার সংগে আলাপ করবেন।

এখন থাক। দেখে তো যাচ্ছি, পারি যদি পরে এক সময়ে আসবো। বলে সোজা চলতে আরম্ভ করি।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াই। চারজনের একটি দল আমার জিনিষপত্তর একান্তে ঠেলে দিয়ে পাকাপাকি হয়ে বসেছেন। দলটি বাঙালীর। দু'জন পুরুষ, দুজন নারী। তবে লটবহর দেখে মনে হয়, সংগে আরো মানুষ আছে।

—ওই ঝোলাঝুলিগুলো আপনার? একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

—আজ্ঞে হাঁ। দয়া করে ওগুলো যদি একটু যত্ন করে গুছিয়ে রাখতেন, ভালো হতো।

—ওগুলো নিয়ে যান। সন্ন্যাসীকে কী ঘরে মানায়? বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন ভদ্রলোক।

আমাকে নীরব দেখে ভদ্রলোক একটু মেজাজী ভাবে বললেন—আমরা ছজন লোক। তারমধ্যে চারজন মেয়েছেলে। আপনি অচেনা অজানা মানুষ—

—ভয় নেই, আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। বলে আমার জিনিষপত্তর গুছিয়ে রেখে, কম্বল বিছিয়ে দিই।

—আপনি—

—হাঁ, এই ঘরেই থাকবো। যদি অসুবিধে মনে করেন, আপনাদের ওই ভারী ট্রাঙ্কগুলো দিয়ে আড়াল করে নেবেন।

—আপনি ঠাট্টা করছেন?

—আঃ চুপ করোনা রজনী। এতো সময় চুপচাপ বসেছিলেন, আর এক ভদ্রলোক। বললেন—সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছো কেন? মনে করো না, আমরা সাতজন একসংগে এসেছি—

—কিন্তু অচেনা-অজানা মানুষের সংগে—

—দেখুন, রজনীবাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলি, বারবার অচেনা অজানা বলছেন কেন? মানুষ চিনতে জানলে, চিনতে দেরী হয় না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এরকম পথে এই প্রথম বেরিয়েছেন।

—আপনি কিছু মনে করবেন না। সংগের ভদ্রমহিলা, বোধহয় রজনীবাবুর স্ত্রী, বললেন—ওর একটুতে মাথা গরম হয়। ব্লাডপ্রেসারের রোগী কি-না?

—না, না। আমি কিছু মনে করিনি। সামান্য কথায় কিছু মনে করতে গেলে কি চলে?

চুপচাপ বসে থেকে দেখছি ওদের গৃহস্থালী। প্রচুর লটবহর সংগে এনেছেন। চারপাঁচটা কুলিতেও বইতে পারবে কিনা সন্দেহ।

—বাজারে যাবে, না চুপ করে বসে থাকবে? রজনীবাবুর স্ত্রী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—কোথায় উনুন, কোথায় কাঠ—এসব কী আমরা দেখবো। আর সে মেয়ে দুটোই-বা গেল কোথায়? আমার হয়েছে নানান্ জালা।—যাও বাজারে গিয়ে যেন দুঘণ্টা দেরী করো না।

—না, না। যাবো আর আসবো। থলেটা দাও। এসো পরিতোষ—

সংগের ভদ্রলোকের নাম পরিতোষ। দেখে মনে হয় নিপাট ভালো মানুষ। কোন কথা না বলে রজনীবাবুর সংগে বেরিয়ে গেলেন।

—ভাখো আমি পই পই করে মানা করেছিলাম, মেয়েদের সংগে এনো না। শুনলে না। শ্রীমতী রজনী পরিতোষ বাবুর স্ত্রীকেও দু'কথা শোনাতে ছাড়লেন না—তোমাকেই বা কী বলবো—তুমিতো ওদের বারণ করলে পারতে।

—এসেছে যখন, তখন আর কী করবে বলো। আমার কর্তাকে তো জানো, আমি বারণ করে কি আটকাতে পারতাম মেয়েকে। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন পরিতোষবাবুর স্ত্রী।

প্রথম দেখাতেই সুন্দর লাগলো পরিতোষবাবুর স্ত্রীকে। বয়সে প্রৌঢ়া। মাতৃত্বের সুষমা জড়ানো মুখে। ঠোঁটের কোণে হাসির স্পর্শ জড়িয়ে আছে। এঁদের দুজনের কথাবার্তায় মনে হয়, এঁদের পরস্পরের সম্পর্কটা নিবিড়।

চুপচাপ ঘরে বসে না থেকে বাইরে এলাম। আশ্রমের নীচেই সঙ্গমের ঘাট। কয়েকধাপ নেমে রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরে এলাম। আরতি শেষ হয়েছে। এখনো ধূপের সুরভি হারিয়ে যায়নি। প্রদীপ জ্বলছে মন্দিরের ভিতরে। দেবতাকে দেখলাম। পাথরের দেবতা—মানুষের বিশ্বাস ওই দেবতার বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

কজন ভিখারী বাউল মন্দিরের চত্বরে বসে। গল্প করছে। একজনের হাতে খঞ্জনি। ও বোধ হয় গান গাইবে।

সিঁড়ি পথ নেমে গেছে আরো নীচে। দুই নদীর সঙ্গম স্থলে। নির্জন ঘাট। বসেছি ঘাটের শেষ ধাপে। পায়ের কাছে জল ফেটে পড়ছে। উদ্দাম স্রোতে ছুটে আসতে আসতে দুই নদী মিলেছে এখানে। দুই ধারা একধারায় বয়ে চলেছে।

বসে আছি। দেখছি নিসর্গ শোভা। দূর পাহাড়ের শীর্ষে, আকাশ ললাটে সপ্তমীর চাঁদ। নক্ষত্রের বাসরে জেগে আছে মধ্যমণির মতো। কয়েক টুকরো মেঘ ভাসছে আকাশে। মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদের মুখ।

সঙ্গমের জলে পড়েছে চাঁদের আলো। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর জলধারা ফেটে পড়ছে অজস্র স্বর্ণবিন্দু হয়ে।

মন্দিরের অঙ্গন থেকে সুর ভেসে এলো। উদাত্ত কণ্ঠস্বর। ভক্তিরসের সিঞ্চনে সে স্বর হয়েছে আরো মধুর।

"তু দয়াল, দীন হুঁ, তু দাতা ময় ভিখারী।
ময় প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী"॥

গান শেষ হলো, কিন্তু সুরের রেশটুকু কানের কাছে বাজতে লাগলো।

'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'—। চোখের সামনে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর কলোচ্ছ্বাস, অদূরে পাহাড়ের ছায়া মূর্তি। আকাশ-ললাটে সপ্তমীর চাঁদ। তার ওপর ফিকে কুয়াশার ওড়না।

এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কেমন যেন আত্মসম্মোহিত হয়ে পড়েছি। কতো রাত হয়েছে জানি না। শুধু দেখছি, চাঁদ আরো দূরে সরে গেছে। এক পাহাড় ডিঙিয়ে আর এক পাহাড়ের কাছে।

শুনতে পাই হাসির শব্দ। নারী কণ্ঠের হাসি। ফিরে চাই। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে কারা যেন নামছে সিঁড়ি দিয়ে।

নেমে এলো। পাশাপাশি দুজন। একজন স্পর্শ করলো সঙ্গমের জল। অন্যজন দাঁড়িয়ে রইলো।

—জল মাথায় দিলে না রাঙাদি?

—না।

ছোট একটি কথার জবাব।

—জানো, এই সঙ্গম তীর্থের মাহাত্ম্য। বলে মেয়েটি একটি বহু প্রচলিত কিংবদন্তীর কথা শোনায়। গয়রাজার যজ্ঞে অসন্তুষ্ট পরশুরামের শাপে দুলক্ষ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হয়েছিল। রুদ্রপ্রয়াগে তাঁরা মুক্তিলাভ করেন।

—আমার ওপর কোন পরশুরামের অভিশাপ নেই সীমা।

—কী যে বলো রাঙাদি।

রাঙাদির মৃদু হাসির আওয়াজ কানে এলো।

—একটু বসবে না রাঙাদি?

—বসবো বৈকি। বোস্।

—তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে?

—না, বসছি।

পাশাপাশি বসলো ওরা দুজনায়। ওদের চিনি না, জানি না—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তবু ফিরে ফিরে দেখার আগ্রহ।

অলকানন্দা আর মন্দাকিনী আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। চাঁদ ঢলে পড়েছে দূরে পাহাড়ের আড়ালে। অন্ধকারের সংগে মেখেছে গাঢ় কুয়াশা।

অস্পষ্ট দুই ছায়ামূর্তি বসে আছে সিঁড়ির ধাপে। মৌন মূর্তি।

তারপর আবার ওদের কথা কানে এলো।

—আচ্ছা সীমা বলতে পারিস, জীবনের সত্যি মূল্য কী?

—জীবনকে জানা। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিল সীমা।

—কিন্তু, জানবো বললেই তো জীবনকে জানা যায় না।

এবারে সীমা নীরব।

—জানিস সীমা, আমি ভাবি অন্যরকম। সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে যে পারে, সেই বুঝতে পারে জীবনের মূল্য কী। দৈনন্দিন জীবনে যা আসে আসুক, যা হবার হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু ঘটনার আবর্তের সংগে এগিয়ে চলা। এক বিন্দুতে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে জীবন বিশ্লেষণ করতে চাওয়া মিছে। বিচিত্র ঘটনার অভিজ্ঞতার মধ্যেই জীবনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

—একি তোমার মনের কথা রাঙাদি?

—মন বাদ দিয়ে আমি নই। রাঙাদির নিঃশ্বাসের শব্দ পেলাম। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর কলোচ্ছ্বাসে হারিয়ে যায়নি রাঙাদির দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

আবার নীরব হলো ওরা দুজনে। ওদের এ নীরবতার মধ্যেও যেন কথা লুকিয়ে আছে। যে কথা—কথা না বলেই স্পষ্ট করে বলা যায়।

—তুমি ভুল করেছো রাঙাদি।

—ভুল করাতো মানুষের ধর্ম। আর ভুল করেই তো মানুষ ভুল শোধরায়।

—না, তোমাকে কথায় হারাতে পারবো না।

রাঙাদির হাসির শব্দ কানে এলো। মৃদু হাসি। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠের কথা—ভুল আমি করি নি সীমা। এছাড়া আর কী করতে পারতাম, বল?

সীমা এবার আর কোন কথা বললো না। রাঙাদিও কথা বাড়াতে চায় না। কিছুক্ষণ দুজনে বসে রইলো চুপচাপ। তারপর রাঙাদিকে বলতে শুনি—ওঠ্, অনেক রাত হয়েছে।

—আর একটু বোসো রাঙাদি, বেশ লাগছে।

—তাহোক, এখন চল। গেলেই তো দশ কথা শুনতে হবে তোর মার কাছে।

চলে গেল রাঙাদি আর সীমা। যাক্। আমি যেমন ছিলাম, তেমন বসে রইলাম আলোছায়া জড়ানো দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। যে পথ দিয়ে চাঁদ চলে গেছে পাহাড়ের আড়ালে, সে পথ থেকে এখনও আলোর রেখাটুকু নিঃশেষে মুছে যায়নি।

রাঙাদির কথাগুলো মনের মধ্যে অকারণ গুঞ্জন করছে। জানি না, কে রাঙাদি—জানি না, কে ওই সীমা। জানবার প্রয়োজন নেই। তবু কৌতূহল—কী ওদের পরিচয়।

আর নয়। রাত হয়েছে। অন্ধকারে সিঁড়ি পথে ওঠাই মুস্কিল। উঠছি সন্তর্পণে।

রুদ্রেশ্বর মন্দিরের প্রদীপ নিভে গেছে। চত্বরে শুয়ে আছে কয়েকজন। হয়তো ওরা তীর্থযাত্রী। ধর্মশালায় বা চটিতে জায়গা না পেয়ে এখানে মন্দিরের চত্বরে ছাউনীর নীচে আশ্রয় নিয়েছে।

সঙ্গমক্ষেত্র থেকে উঠে এলাম খাবারের দোকানে। পুরি তরকারি আর দুধ দিয়ে খাওয়ার পাট চুকিয়ে আশ্রমে এসেছি। যাত্রীর ভিড়ে আশ্রম গুলজার। আশ্রম সংলগ্ন শিব মন্দিরের বারান্দায়, চত্বরে, অশ্বত্থগাছের নীচে পাথর বাঁধানো উঠোনেও তীর্থ-পথিকের দল আশ্রয় নিয়েছে। রাত কাটানো নিয়ে কথা। ঘরে জায়গা নেই বলে কি রাত কাটবে না? কোথাও তিন টুকরো পাথরের উনুনে রান্না চেপেছে, কোথাও চলেছে খাওয়া-দাওয়ার পালা, কোথাও বসেছে গল্পের আসর, আবার কেউ-বা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিজের আস্তানায় ফিরেছি। পরিতোষবাবু গল্প করছেন বন্ধুর সংগে। ঘরে আর কেউ নেই।

—বাপরে কী ধোঁয়া। খিচুড়ির হাঁড়ি ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রেখে দুহাতের কব্জি দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগলেন রজনীবাবুর স্ত্রী।—রান্না করা না তো, জ্বলেপুড়ে মরা।

পরক্ষণে এলেন ভদ্রমহিলার সই—পরিতোষ বাবুর স্ত্রী। হাতে তরকারির থালা। পিছু পিছু এলো দুজন তরুণী। সুবেশা সুন্দরী।

—তোদের কি আক্কেলেরে সীমা। সেই সন্ধ্যের পর বেরিয়েছিলি, আর

এই এলি। খিচুড়ি থেকে আলু আলাদা করে রাখতে রাখতে রজনীবাবুর স্ত্রী বললেন—জানিস, এটা বিদেশ বিভূঁই।

সীমা! দুজনের মধ্যে কার নাম সীমা! কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি। চিনেছি সীমাকে। যে মেয়েটি বয়সে ছোট, সে-ই সীমা। অপরাকে রাঙাদি বলে চিহ্নিত করেছি মনে মনে। দেখছি তাকে। সুন্দরী সে। তবে একটু কৃশ, একটু নিষ্প্রভ। নয়তো গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো, সুন্দর দুটি চোখ আর বাঁকা ভ্রূ। যেন তুলি দিয়ে আঁকা।

একটু আগে এরাই গিয়েছিল সঙ্গমের ঘাটে! ও:: কী আমি এদের কথাই শুনেছি!

রাঙাদি লক্ষ্য করলো আমাকে। আমি কে এবং এঘরে কেন; এই বোধ হয় ওর দৃষ্টির জিজ্ঞাসা।

—নে তোরা থালাটালাগুলো পেতে দে—রজনীবাবুর স্ত্রী বললেন।

—এর মধ্যে কেন মা? সীমা জিজ্ঞাসা করলো।

—খিচুড়ি জুড়িয়ে যাবে যে। আর কতো রাত হয়েছে, তার ঠিক আছে।

—রাঙাদি, তোমার হাতে তো ঘড়ি আছে। সীমা মুখ টিপে হাসলো।—ভাখো তো কটা বেজেছে।

—দশটা।

—ঠিক দশটা?

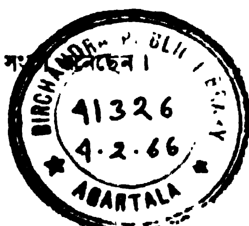
—হাঁ, একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।

রাঙাদিকে দেখি। সীমার রাঙাদি; যে আমার কাছে এখনো অপরিচিতা। রাঙাদির মাথায় স্কার্ফ জড়ানো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, সীমন্তে রক্ত চিহ্ন আছে, কী নেই। হাতে শঙ্খবলয়ও দেখছি না, শুধু একগাছি করে সোনার কাঁকন।

চোখের ইসারায় পরিতোষবাবুর স্ত্রী কিছু বললেন স্বামীকে। খিচুড়ির প্রথম গ্রাস মুখে দেবার আগেই পরিতোষবাবু জানতে চাইলেন আমার আহারাদি হয়েছে কি না।

—হাঁ, বাইরে দোকান থেকে খেয়ে এসেছি। রান্নাবাড়ার জিনিষপত্তর সংগে এনেছি, কিন্তু ভালো লাগলো না ওসব ঝঞ্ঝাটে। বলে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা খুলে বসি।

সীমা বললে—আপনি দেখছি বইপত্তর সংগে এনেছেন।



—পথে এর চেয়ে বড়ো বন্ধু আর নেই।

—সীমা আর কোন কথা বললে না। রাঙাদি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে লক্ষ্য করছে। ওর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট কৌতূহল। বুঝতে পারছি, ও কথা বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না।

ওঁদের খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো। এঁটো বাসন জড়ো করা রইলো ঘরের কোণে। মেঝে পরিষ্কার করলো রাঙাদি। সীমা পরিপাটি করে বিছানা পাতলো।

সকলের শেষে শয্যাগ্রহণ করেছি আমি। পাশেই পরিতোষবাবু। ঘর প্রায় অন্ধকার। শুধু এক কোণে জ্বলছে ছোট একটা লণ্ঠন।

এক সময় পরিতোষবাবু আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমার ঠিক-ঠিকানা বললাম। তারপর জানতে চাইলেন, আমি কি করি। বললাম—যা না করার তাই করি।

শুনে পরিতোষবাবু হাসলেন।—তার মানে?

—পরে শুনবেন।

—বাবা, এখন আর গল্প ফেঁদে বোসো না। রাত এগারোটা বাজে। রাঙাদি হাই তুলে অলসকণ্ঠে বললে,—তাছাড়া তোমার গল্পতো দুকথায় শেষ হবে না।

—আচ্ছা মা শুয়ে পড়ছি। পরিতোষবাবু কম্বল মুড়ি দিলেন।

লণ্ঠনটা জ্বলছিল মিট্ মিট্ করে, আচমকা নিভে গেল। যেটুকু আলো ছিল তাও ফুরোল। অন্ধকার ঘর, অদেখা পাহাড়ী টিক্‌টিকির ডাক শুনতে শুনতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়ি, জানিনা।

রাত ভোর। ঘুম চোখে বাইরে এলাম। পাহাড়ের মাথায় সূর্যের আলোর রক্তিম স্পর্শ।

কলতলায় দেখা পেলাম পরিতোষবাবুর। মুখ ধুচ্ছেন।

—বেশ জব্বর শীত।—পরিতোষবাবু রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, —চলুন, চা খেয়ে আসি।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে চায়ের দোকানে বসেছি। পরিতোষবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সেই যে কথা শুরু করলেন, সে কথা আর শেষ হয় না। নিজের

প্রসঙ্গে বললেন, উনি শিক্ষকতা করেন কলকাতায়। পৈতৃক বাড়ী আছে বৌবাজারে। কিছু বাড়ী ভাড়াও পান। ছোট সংসার। স্ত্রী শান্তিলতা, আর দুই পুত্র কন্যা—অসিত ও পূরবী। ঐ পূরবীকেই সীমা রাঙাদি বলে তাকে। শান্তির সংসার ছিল এতদিন। কিন্তু সে শান্তি আর নেই। পূরবীকে নিয়েই অশান্তি।

কিন্তু পূরবীকে নিয়ে কেন সংসারে অশান্তি, সে সম্পর্কে নীরব রইলেন। আমিও কোন প্রশ্ন তুলিনি।

রজনীবাবু ওঁর বাল্যবন্ধু। ব্যবসা করেন লোহা-লক্কড়ের। আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো। কলকাতায় একাধিক বাড়ী গাড়ী আছে। রজনীবাবু যেমন ওঁর বাল্যবন্ধু, তেমন দুজনের স্ত্রীর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। দুজনেই শান্তিপুরের মেয়ে। ছোট বেলার সই।

তীর্থে আসা এই প্রথম নয় পরিতোষবাবুর। এর আগে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেছেন, কিন্তু দুর্গম তীর্থপথে এই প্রথম আসা।

আরো অনেক কথাই বললেন পরিতোষবাবু। দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন তিনি, এখনও দর্শনের পূজারী। যদিও ঘটনার আবর্তে পড়ে ওঁর জীবন থেকে দর্শন উবে যেতে চলেছে।

চায়ের দোকান থেকে উঠে পরিতোষবাবুর সংগে পথ চলি। মন্দাকিনীর পুল পার হয়ে বেশ কিছুদূর চলে এসেছি। এক নির্জন টিলার পাদদেশে বসে পরিতোষবাবুর মুখ থেকে দর্শনের কথা শুনি।

সময়ের দিকে কারোর খেয়াল ছিল না। আশ্রমে ফিরেছি যখন, দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। ইতিমধ্যে রজনীবাবু বাজার করে এনেছেন। রান্না চাপিয়েছেন ওঁর স্ত্রী। আর শান্তিলতা ছুরি দিয়ে তরকারি কুটছেন একান্তে বসে।

আমাকেও আজ রান্না করতে হবে। যদিও হোটেল এখানে আছে কিন্তু সে নোংরা হোটেলে ঢুকতে রুচি নেই আমার। বাজারে গেলাম—সামান্য তরকারি চাল ডাল আর শুকনো কাঠ নিয়ে এলাম। আশ্রমে পাকশালার উনুন খালি নেই। অগত্যা তিনটুকরো পাথর দিয়ে উনুন বানিয়ে নিই।

কাঠগুলো তেমন শুকনো নয়। জ্বলতে চায় না। ফুঁ দিয়ে বুক ব্যথা হয়ে গেছে। কখন জানিনা শান্তিলতা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফিরে চাইতে বললেন—তুমি সর বাছা, আমি উনুন জেলে দিচ্ছি। পুরুষ মানুষ কি এসব পারে?

আরো একবার ফিরে চাই শান্তিলতার দিকে। মাতৃত্বের মহিমায় গড়া মুখ। মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। লাল কস্তা পেড়ে শাড়ী পরনে, কপালে জল জল করছে সিঁদুরের টিপ্। ঠোঁটের কোণে জড়ানো মৃদু হাসি। ঠিক যেন দেবীর মত।

অদূরে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে সীমা। কেন, সেই জানে। সীমাকে ডেকে শান্তিলতা জিজ্ঞাসা করলেন—তোর রাঙাদি কোথায়?

—কী জানি।

—ঐ এক মেয়ে। ওকে নিয়ে আমি আর পারিনা। বলে শান্তিলতা চলে গেলেন।

রান্না খাওয়ার পালা চুকতে বেলা একটা বাজে। তারপর একটু বিশ্রামের আশায় এলাম বাইরে। আশ্রমের চত্বরে ছায়াঘন অশ্বত্থ। রোদ নেই, কিন্তু রোদের আঁচটুকু আছে সেখানে।

কম্বল বিছিয়ে অশ্বত্থের ছায়ায় শুয়ে ছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙলো যখন, তখন দিনের খেয়ায় সূর্য গেছে অন্ধকারের দেশে। সন্ধ্যা নেমেছে। আশ্রমের মন্দিরে শুরু হয়েছে সন্ধ্যারতি।

আরতি শেষ হলো। অধ্যক্ষ মহারাজ মন্দির প্রাঙ্গণে বসে গীতাপাঠ শুরু করলেন। ভক্ত নরনারীর ভীড় সেখানে। সবাই একাগ্র চিত্তে শুনছে গীতার অমৃত বাণী। ভিড়ের মধ্যে রাঙাদিকে দেখলাম। এক মনে সেও শুনছে—

উদ্ধরেৎ আত্মানা আত্মানং
নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হি আত্মনো বন্ধুঃ
আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

বসে থাকতে ভাল লাগলো না। উঠে এলাম—অলকানন্দার পুল পেরিয়ে এপারে। এপারে শহর—দোকান পাট, বাজার, ডাকঘর, হাসপাতাল, বাড়ী-ঘর, লোকজন।

হঠাৎ পরিচিত নারী কণ্ঠের ডাকে ফিরে তাকাই।—কী দাদা, কোথায় যাচ্ছেন?

গওজাল বাস ষ্ট্যাণ্ডে আলাপ হয়েছিল ভদ্রমহিলার সংগে। বললাম—বসে থেকে কী করবো, তাই এদিকটায় একটু ঘুরছি, ফিরছি। আপনি কোথায় চলেছেন?

—হ্যারিকেনের চিম্‌নি কিনতে এসেছি। তারপর, বাস কোম্পানীর অফিসে খোঁজ খবর করলেন কিছু? শুনছি কাল থেকে বেশী বাস যাতায়াত করবে।

—আমি খোঁজ খবর কিছু করিনি। নাম যখন লেখানো আছে, সময় মতো টিকিট পাবো।

কথা বলতে বলতে বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছি। বসেছি রাস্তার পাশে একটি পাথর খণ্ডের ওপর। ভদ্রমহিলা বড্ড বেশী কথা বলে। একভাবে বকে চলেছে। কী যে বলছে, তার মাথামুণ্ডু নেই। অসংলগ্ন কথাবার্তা। সব কথা কানে নিচ্ছি না, শুধু শুনতে হয় শুনছি। তবে কথাবার্তায় মনে হলো, ভদ্র মহিলার দেশভ্রমণের নেশা আছে। অনেক বেড়িয়েছেনও।

কথার মধ্যে একসময় জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি করেন?

অসংকোচে বলে গেল নিজের কথা—কর্পোরেশন ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে। সংসারে মা-পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই। কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে জীর্ণ একতলা একটি ছোট বাড়ী আছে ঠাকুর্দার আমলের। সেইখানেই থাকে। বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না, তাই কোন রকমে দিন চলে যায়।

—রাত হয়েছে। চলুন ওঠা যাক্।—বলতে ভদ্রমহিলা ঠোঁটে 'চুক্' শব্দ করে বলে উঠলো—দেখুন কথায় কথায় একদম ভুলে গিয়েছি। আলোর চিমনি কেনা হয়নি। এতো সময় দোকান-পসার বন্ধ হয়ে গেছে কিনা কী জানি!

রাত নটা বেজে গেছে। এখনো দোকান-পসার খোলা। এ সময়ে রাত বারোটা-একটার আগে দোকান পসার বন্ধ হয় না। এই তো মরশুম।

শুধু চিম্‌নি নয়, আরো কিছু টুকিটাকি জিনিষপত্তর কিনলেন ভদ্রমহিলা। তারপর হন্‌হন্‌ করে চলতে আরম্ভ করলেন।

—অতো তাড়াতাড়ি চলছেন কেন?

—সাধারণত আমি একটু তাড়াতাড়ি পথ হাঁটি। বলে ভদ্রমহিলা চলার গতি মন্থর করলো।

পথে এক সময় জিজ্ঞাসা করি ভদ্রমহিলার নাম। নাম কমলা ঘোষ, ডাক নাম বুলি।

—আপনার নাম? কমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—আপনার কোন পরিচয় তো জানতে পারি নি।

আমার নাম শুনে কমলা হাসলো। শ্রীমন্ত—নামটা নাকি বড্ড সেকেলে। হতে পারে, কিন্তু এই নাম নিয়েই তো একালে চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।

আজও ওদের বাসার কাছে পৌঁছে কমলা আহ্বান জানালো আমাকে। কিন্তু গেলাম না। পথের পরিচয় পথেই থাক, নাই-বা পৌঁছলো ঘরের চৌহদ্দিতে।

আশ্রমে ফিরেছি।

নির্দিষ্ট ঘরের দরজা অব্দি পৌঁছে থমকে দাঁড়াই। শুনতে পাই রজনীবাবুর কথা। পরিতোষ বাবুকে বলছেন—ত্যাখো পরিতোষ, তোমার মাষ্টারী বুদ্ধিতে ওসবের মানে বুঝতে পারবে না। কোথাকার কে ঠিক নেই, তার সংগে অতো আত্মীয়তা কেন? গেরুয়া পরেছে বলে কী সন্ন্যাসী ঠাউরেছো? এ-পথে অনেক যাত্রীই গেরুয়া পরে। সে যাই হোক, তুমি ওর সংগে বেশী মাখামাখি না করলেই ভালো করবে।

পরিতোষবাবু বললেন—তোমার সংগে আমি একমত নই রজনী। ছেলেটিকে আমার বেশ লাগে। যে হাসতে জানে, সে কখনো খারাপ হতে পারে না।

রজনীবাবু কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন—ভুলো না, আমাদের সংগে দুটি মেয়ে আছে।

পরিতোষবাবু নিরুত্তর। এবারে কানে এলো শ্রীমতী রজনীর কথা।—ওর চোখের চাউনি দেখেছো? ড্যাব ড্যাব করে চায় মেয়ে দুটোর দিকে। কোথাকার কে, শান্তির চোখ ছল ছল করে উঠলো তার খাবার কষ্ট দেখে।

নিজের মনে হাসি। ভাবি, কতো রকমের মন নিয়ে মানুষ এই পৃথিবীতে আসে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে ঢুকি। ফিরেও চাইনা কারো মুখের দিকে।

স্ত্রীর পাশে বসে তাদের কাঁকর বাছছিলেন রজনীবাবু। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—এই যে এসে গেছেন সাধু মহারাজ। আপনার কথাই হচ্ছিল। বাঁচবেন অনেক দিন।

রজনীবাবুর কথার সুরে মৃদু শ্লেষ মেশানো ছিল। হেসে বললাম—কতোদিন বেঁচে থাকবো জানি না, তবে আমি বেঁচে থাকতে চাই অনেক দিন।

পরিতোষবাবু সায় দিলেন আমার কথায়।—এই পৃথিবীতে যারা মৃত্যু চিন্তা করে তারা তো অন্ধকারের জীব।

রজনীবাবু বললেন—তোমার ওসব দর্শনশাস্ত্রের বাঁধা বুলি আমাকে শুনিও না।

পরিতোষবাবু ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। বললেন—তুমিও তো আমাকে অনেক সময় লোহালক্কড়ের দাম শোনাও রজনী। তুমিতো জানো ব্যবসা আমার মাথায় ঢোকে না। তারপর নিরেট লোহার ব্যবসা।

—ছাখো পরিতোষ, তোমার মগজে—

পূরবী আর সীমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে রজনীবাবু চুপ করে গেলেন।

কিছুক্ষণ থমথমে হয়ে রইলো ঘরের আবহাওয়া। শুধু লক্ষ্য করলাম শ্রীমতী রজনী মাঝে মাঝে বক্র কটাক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে মনে মনে কিছু বলছেন।

এক সময় পরিতোষবাবু বললেন—চলুন বেড়িয়ে আসি।

—চলুন।

পরিতোষবাবুর সংগে এলাম সঙ্গম ক্ষেত্রে। ঘাটের সিঁড়িতে বসে পরিতোষবাবু নিজে থেকেই কথা আরম্ভ করলেন। সাধারণ গল্পকথা থেকে আরম্ভ হলো দর্শনের তত্ত্বকথা। এমন সুন্দর বাচনভংগী, সত্যি মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। একটানা বলে চলেছেন পরিতোষবাবু। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

—মাষ্টার মশায়।

—কী শ্রীমন্ত ?

—বোধহয় অনেক রাত হয়েছে।

—রাত হয়েছে বলছো, তা হবে। বলে মাষ্টারমশায় চুপচাপ বসে রইলেন। সঙ্গমক্ষেত্রে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি।

—দেখেছো, দুই নদীর জলধারা কি আনন্দে ফেটে পড়ছে। এ আনন্দ, মিলনের আনন্দ। বিরহে কী এ আনন্দের স্পর্শ আছে শ্রীমন্ত ?

—না।

—না ! ক্ষণমাত্র নীরব থেকে মৃদু হাসলেন মাষ্টারমশায়।—বিরহের মধ্যেও ঠিক এমনি আনন্দ আছে। সে আনন্দের নেশা আরও তীব্র। বলে মাষ্টারমশায় আবার ফিরে তাকালেন সঙ্গমক্ষেত্রের দিকে। যেখানে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর জলধারা বিপুল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে।

সঙ্গমক্ষেত্রে এসেছিলাম বলেই আজ মাষ্টারমশায়কে এতো কাছে পেয়েছি। আমাকে সস্নেহে 'তুমি' সম্বোধন করেছেন মাষ্টারমশায়। মানুষ যখন পরস্পরের কাছে আসে, বোধ হয় এমনি করেই আসে।

—বাবা। কণ্ঠস্বর পূরবীর। ওপরে রুদ্রেশ্বর মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলে বলছে—বাবা, এই রাত অব্দি ঠাণ্ডায় বসে আছো!

—এক পাগল আর এক ক্ষ্যাপাকে খুঁজে পেয়েছে। মাষ্টারমশায় ডাকলেন, আয় পূরবী।

—না, এগারোটা বেজে গেছে। জ্যাঠামণি খুব রাগ করছেন। বলতে বলতে পূরবী নেমে এলো সিঁড়ি পথে।—একটা টর্চ সংগে নিয়ে বেরোতে কী হয়েছিল?

—আকাশে চাঁদ ছিল বলে টর্চ আনিনি মা-মণি। তাছাড়া টর্চ সংগে থাকলে তুইতো আলো দেখাতে আসতিস নে। বোস—সীমা আসে নি?

—না। জ্যাঠামণি আসতে দিলেন না।

মাষ্টারমশায় নিজের মনে হাসলেন। যার মনে সমুদ্রের ঢেউ সেখানে খোলামকুচি ফেলে কী হবে।

আরও দুদণ্ড বসে থাকার ইচ্ছে ছিল মাষ্টার মশায়ের। কিন্তু পূরবীর তাড়াতে ফিরতে হলো।

ঘরের কোণে গুম হয়ে বসেছিলেন রজনীবাবু, মাষ্টারমশায় দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন—দাও, আমাদের খেতে দাও। দার্শনিক প্রবর এসে গেছেন।

—লোহার ব্যবসায়েও তো দর্শন আছে রজনী। মাষ্টারমশায় পরিহাসের সুরে বললেন,—লৌহ দর্শন নিয়েই তো জীবন কাটালে।

রসিকতা বোঝেন না রজনীবাবু। বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন, —রাত সাড়ে এগারোটা বাজে, রান্না হয়েছে দুঘণ্টা আগে। এখন তোমার দর্শনের উত্তাপে গরম করে নাও ঠাণ্ডা খাবার।

ওদিকে ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা। ডাল ভাত পাঁপরের ডালনা আর টম্যাটোর চাটনি—শ্রীমতী রজনী নিজে থেকেই বলছেন রান্নার ফর্দ। এদিকে আমি কম্বল বিছিয়ে বসেছি, খরমুজা আর আপেল নিয়ে।

—শুধু ওই খেয়েই রাত কাটাবেন? সীমা জিজ্ঞাসা করলো।

—খাদ্যপ্রাণ এতে কম নয়। খরমুজার ওপর ছুরি চালাতে চালাতে বলি, —তাছাড়া পথের দিনগুলো কোন মতে কাটিয়ে দেওয়া বৈতো আর কিছু নয়।

পরদিন।

সকালে বাস কোম্পানির অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আজ দুপুরে টিকিট পাওয়া যাবে। তবে বেলা দুটোর আগে নয়।

কুলি ইউনিয়নের অফিসে গেলাম। একজন কুলির প্রয়োজন। এখানে কুলিদের জন্যে নির্দিষ্ট হার, সেরপিছু দুটাকা। একজন কুলি দেড়মণ পর্যন্ত মাল নিতে পারে।

আমার জিনিষপত্তরের ওজন বেশী নয়, বড়ো জোড় আধমণ হবে। সুতরাং একজন কুলি আমার একার জন্যে সংগ্রহ করা মুস্কিল। অনেক চিন্তা করে কুলি ইউনিয়নের কর্মকর্তা জানালে, একজন কুলিই সে আমাকে দেবে। তবে সে বয়সে কিশোর। যা মাল আছে, তার হিস্তা, আর কিছু বখশিস দিলেই সে যাবে।

বেলা একটায় বাসের টিকিট পেলাম। কুলির জন্যেও টিকিট নিয়েছি! সে এলো আমার সংগে। গাড়োয়ালী কিশোর। ফুটফুটে চেহারা। কচিকচি মুখ। নাম লালসিং। বাড়ী গুপ্তকাশীতে।

লালসিং বেঁধে নিয়েছে মোটঘাট। বেলা আড়াইটেয় বাস ছাড়বে। লালসিং মোট নিয়ে আগেই গেল বাসষ্ট্যাণ্ডে। আগে গিয়ে আমার জন্যে ভালো জায়গা রাখবে সে।

সওয়া দুটো আন্দাজ বাস ষ্ট্যাণ্ডে এলাম। টিকিটে বাসের নম্বর দেওয়া আছে, সেই মতো উঠতে হবে।

পরিতোষবাবুকে দেখলাম অন্য একটি গাড়ীতে। রজনীবাবুকেও দেখতে পাই, নীচে দাঁড়িয়ে সীমাকে কী যেন বলছেন হাতমুখ নেড়ে। রাঙাদিকে দেখতে পাচ্ছিনা। হয়তো আড়ালে বসেছে।

—কী দাদা, আগেভাগে বেশ জায়গাটি নিয়ে বসে পড়েছেন দেখছি।—মা-পিসিকে নিয়ে বাসে উঠছে কমলা ঘোষ।

—কী করি বলুন। তবে চিন্তা নেই, এখনো জায়গা রয়েছে।

বেলা আড়াইটের বাস ছাড়ার কথা। তিনটে বাজে, এখনো বাস ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। ফিরতি পথের বাস না আসা পর্যন্ত আমাদের বাস ছাড়বে না।

ফিরতি বাস এলো সওয়া তিনটেয়। তারপর যাত্রী বোঝাই বাসগুলো এক

এক করে চলতে শুরু করে। অগণিত যাত্রীর কণ্ঠে জাগে জয়ধ্বনি।—'জয় কেদারনাথ কী জয়'।

গেরুয়া রঙিন ধুলো উড়িয়ে একটির পর একটি সারি বেঁধে বাস ছুটে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল পথ ধরে। এ পথের ধারে পাহাড়গুলো কেমন যেন রুক্ষ। সে অরণ্যের শ্যামলিমা আর নেই।

সংকীর্ণ পথ। একেবারে খাদের গা ঘেঁষে চলেছি আমরা। নীচে মন্দাকিনীর জলধারা। উপলখণ্ডের বাধা পেরিয়ে ছুটে চলেছে।

পায়ে হাঁটা যাত্রীদের দেখছি। কতো নর-নারী চলেছে পথের ধুলো গায়ে মাখতে মাখতে। সকলের কণ্ঠে কেদারনাথের নাম। এ পথে নামই সম্বল। নাম ছাড়া গতি নেই। নামেই গতি।

কেন জানি না, নাম নিতে আমার দ্বিধা। শুধু নাম নিয়ে কী করবো, যদি তাঁকে আপন করে না পাই। তিনি কে, তাঁর ঠিকানা জানিনা, জানিনা তিনি কেমন, কেমন তাঁর রূপ। শুনেছি তিনি ছড়িয়ে আছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে। তা যদি হয়, তবে নির্দিষ্ট ঠিকানায় কেন তাঁকে খুঁজতে চলেছে মানুষ?

এক প্রশ্ন থেকে আর এক প্রশ্ন। এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা। মনের মধ্যে নানা কথার জটলা। আসল কথা হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কথার আবর্জনায়।

তেরো মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি। বাস থেমেছে অগস্ত্যমুনিতে। দশ পনেরো মিনিট দাঁড়াবে। নেমে এলাম লালসিং-এর সংগে। কাছেই অগস্ত্য মন্দির। দেখে এলাম। প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের কাছে কয়েকটি ধর্মশালা, চটি ও কিছু দোকান পসার। আশপাশে জনপদ—গ্রাম।

সামান্য সময় হাতে, তারই মধ্যে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। লালসিং বললে, যখন বাসের পথ হয়নি, তখন এ-সব জায়গা আরো সুন্দর ছিল। ওই চটিগুলোর তখন এমন জীর্ণ দশা ছিলনা। তখন পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হতো তীর্থ যাত্রীদের। দুপুরে বা রাতে এই সব চটিতে, ধর্মশালায় যাত্রীরা আশ্রয় গ্রহণ করতো। বাস হবার পর থেকে এসব জায়গার দুর্দশার অন্ত নেই। আজ যে আমরা দেখছি, পাঁচবছর পরে হয়তো এ অবস্থাও দেখতে পাবো না।

সামান্য সময় ফুরিয়ে গেল। আবার শুরু হলো আমাদের চলা। বাসের জানালা দিয়ে আঙুলের নিশানা করে লালসিং বলে, মন্দাকিনীর ওপারে রুদ্রাক্ষের গাছ আছে। সাধু মোহন্তরা যায় রুদ্রাক্ষ সংগ্রহ করতে।

সৌরী চটি পার হয়েছি। চন্দ্রাপুরীও দেখলাম চলতি বাস থেকে। চন্দ্র-মন্দাকিনী সংগমে শিব-দুর্গার মন্দির। দূর থেকে দেখি।

আরও কিছু পথ অতিক্রম করে একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দূরে। যেখানে হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত শৃঙ্গ অপরাহ্নের আলোয় রূপোর মতো জলজল করছে। অবাক হয়ে দেখি। শুধু দু'চোখে নয়, মনেও অফুরন্ত বিস্ময়।

দিনের আলো নিভবার আগেই বাস থামলো কুণ্ড চটিতে। এইখানেই বাসের পথ শেষ। পায়ে হাঁটা পথ আরম্ভ।

সময় নেই। এখনই রওনা না হলে গুপ্তকাশী পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। সময় নষ্ট না করে লালসিংকে অনুসরণ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি।

মন্দাকিনীর সেতুর ওপর দেখা হলো রাঙাদির সংগে।

—চলুন এক সংগে যাই। এই প্রথম কথা বললে রাঙাদি।

—আর সকলে কোথায় ?

—পেছনে আসছে।

ওপার থেকে মন্দাকিনীর এপারে এসেছি। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে মন্দাকিনীর তীর ঘেঁষে পথ চলেছে এঁকে বেঁকে। অসমতল পথ। পথের ধারে কুষ্ঠরোগীদের ডেরা। ছোট ছোট খুপরির মধ্যে বসে ভিক্ষা চাইছে করুণকণ্ঠে। কারো হাত-পায়ের আঙুল খসে গেছে। অতিকষ্টে যাত্রীদের কাছে প্রার্থনা করছে—বাবুজী, এক পাই দে বাবুজী, রাণীমা—।

থমকে দাঁড়িয়ে রাঙাদি বললে—ওরাও মানুষ, ওদেরও জীবন আছে, আছে মানুষের মত মন। হয়তো ওদের পৃথিবী থেকে এখনো রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ হারিয়ে যায়নি। কিন্তু এই পৃথিবীতে ওরা কত অসহায় !

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে রাঙাদি আবার পথ হাঁটে। পথের পাশে যতো কুষ্ঠরোগী ভিখারী, সকলকেই কিছু না কিছু দিচ্ছে ও। থমকে দাঁড়াচ্ছে মাঝে মাঝে। পরক্ষণে আবার পথ হাঁটছে।

সামনে চড়াই। ঘোড়াওয়ালারা দাঁড়িয়ে আছে চড়াই-এর মুখে। বলছে ভাঙা হিন্দীতে, এই চড়াই ওঠা খুবই কঠিন। সময় থাকতে ঘোড়ায় চেপে চড়াই পার হওয়া ভালো। পরে আর ঘোড়া মিলবে না। এখান থেকে গুপ্তকাশী পৌছে দেবে দুটাকার বিনিময়ে।

—আপনি কি সন্ন্যাসী? চড়াই-এ উঠতে উঠতে রাঙাদি জিজ্ঞাসা করলো। সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম—আপনি তো বেশ হাঁটতে পারেন।

—পারি বৈকি। রাঙাদি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন না যে?

—উত্তর দেবার মতো কিছু নেই। বলে রাঙাদির মুখের দিকে ফিরে চাই, —আমার সংগে চলে এলেন, কেউ কিছু মনে করবেন না তো?

—এটা পথ, ঘর নয়। পথের স্বাধীনতা ঘরে নাই।

চড়াই-এ উঠে আরাম চটি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। তীর্থ-পথিকদের এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করা বিধি।

একটি দোকানের সামনে বসেছি। লালসিং পিঠের বোঝা নামিয়ে আরো দুজন মালবাহক কুলির সংগে গল্প করছে। রাঙাদি বসেনি। দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার দূর পাহাড়ের শীর্ষে। যেখানে অস্ত পথের সূর্যের আবীর স্পর্শ।

—রাঙাদি, তোমাকে নমস্কার করতে ইচ্ছে করছে। সীমার কথায় ফিরে তাকালো রাঙাদি।—কেন রে?

—এই চড়াই এতো শীগগির উঠলে কী করে? বলে সীমা বসে পড়লো পথের পাশে ধুলো-বালির ওপর।

শ্রীমতী রজনীর অবস্থা কাহিল। হাঁস-ফাঁস করছেন এই চড়াই পথে উঠে। দেখে মনে হয়, রজনীবাবুও রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু শান্তিলতার কোন কষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না।

সবশেষে এলেন মাষ্টারমশায়। সংগে বিচিত্র চেহারার এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক।

—শ্রীমন্ত, এই আর এক রত্ন যোগাড় করেছি। এসো পরিচয় করিয়ে দিই।

—জয় কেদার। বলে ভদ্রলোক আচমকা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পরিচয় শুনলাম। নাম প্রসাদ ভট্টাচার্য। চাকরি করেন কলকাতার এক ইংরেজী দৈনিকে। ব্যক্তিগত জীবনে পরম বৈষ্ণব। প্রভুপাদ বিজপদ গোস্বামীর শিষ্য।

শীর্ণ চেহারার মানুষ প্রসাদ ভট্টাচার্য। খর্বকায়। গায়ের রং কালো, মাথায় প্রশস্ত টাক। দাঁতগুলো বিশ্রী ধরনের উঁচু। গলায় একরাশ নানা ধাঁচের মালা। কোনটি তুলসী কাঠের, কোনোটি রুদ্রাক্ষের। সংগে কুলি থাকা সত্ত্বেও দু কাঁধে ভারী ঝোলা।

—ভালোই হলো প্রসাদবাবু, আপনাকে পেলাম.

—বাবু নয় ভাই, বলো প্রসাদদা। আপনি নয়, তুমি। একগাল হেসে প্রসাদদা বললে,—এখন থেকে আমরা তো সবাই আপন জন।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি প্রসাদদার মুখের দিকে। অচেনা-অজানা মানুষ, অথচ কতো সহজে দূরের মানুষকে কাছে টানতে পারে।

—কী দেখছো! আমাকে? দূর, আমাকে দেখবে কি। আমি কী দেখার মতো কিছু? প্রসাদদা আমার কাঁধে হাত রেখে বললে,—চলো, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। জয় কেদার।

—একটু বোসো পরিতোষ। রজনীবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন, —পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দিই।

—এইটুকু হেঁটেই কাহিল হয়ে পড়লে? পরিতোষবাবু বললেন,—কাল থেকে দিনে কতো মাইল হাঁটতে হবে জানো?

—তাই তো ভাবছি। বলে স্ত্রীর মুখের দিকে ফিরে চাইলেন রজনীবাবু। শ্রীমতী রজনী পায়ের গোড়ালি টিপতে টিপতে সুর টেনে বললেন,—আমিও তো তাই ভাবছি।

—তোমরা বসে বসে ভাবো—সীমা দূরে লক্ষ্য রেখে বললে,—ওই ছাখো, রাঙাদি একা কতদূর চলে গেছে।

—চলো। শান্তিলতা গায়ে আলোয়ান জড়াতে জড়াতে বললেন,—যতো বসবে, বসবার ইচ্ছে ততো পেয়ে বসবে।

গুপ্তকাশীতে পৌঁছে আজকের মত যাত্রা বিরতি।

কেদারনাথের পাণ্ডা পান্নালাল শুক্লের লোক অপেক্ষা করছিল, সে আমাদের নিয়ে গেল তার বাড়ীতে।

পাহাড়ের গায়ে রাস্তার ধারেই দোতলা বাড়ী। ওপরের ছোটো দুটি ঘর আমরা পেলাম। এখানেও লক্ষ্য করলাম, আমাকে নিয়ে শ্রীমতী রজনীর মনের খুঁতখুঁতুনি এখনো যায়নি। মুখে কিছু না বললেও চোখ মুখের ভাব দেখে তা অনুমান করা যায়।

লালসিং-এর বাড়ী এখান থেকে দু মাইল দূরে। চলে গেল সে। বলে গেল, ভোর পাঁচটার আগেই সে আসবে। আমাকেও বলেছিল, ওর বাড়ী যাওয়ার জন্যে। কিন্তু যাওয়া হলো না।

আজ পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। রাত নটা না বাজতে বাইরের হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে যে যার মতো শয্যা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দুটি ঘর। একটিতে আমি আর প্রসাদদা। অন্যটিতে আর সকলে। খানিক বাদে কম্বল বালিশ নিয়ে মাষ্টারমশায় এলেন এঘরে।

মাষ্টারমশায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি জেগে আছি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। ঘুম ঘুম তন্দ্রা। নেশার মতো? প্রসাদদা তখনো বসে কোলকুঁজো হয়ে। দুটি হাত বুকের কাছে। বোধ হয় জপ করছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে গেল কুকুরের ডাকে। আলো জ্বলছে ঘরে। লণ্ঠনের মিটমিটে আলো। দেখি, প্রসাদদা তখনো তেমনি ভাবে আছে। বরং আরো একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

—প্রসাদদা।

—কী ভাই।

—আপনি এখনো জেগে আছেন?

—আবার আপনি? বলেছি না তুমি বলতে।

—সে না হয় বলছি। কিন্তু এখনো জেগে আছো কেন?

—জেগে আছি কেন?—প্রসাদদা এরপর যা বললে, শুনে অবাক হই। ভাবি এও কী সম্ভব!

আঠারো বছর হলো, দিনে রাতে দুঘণ্টার বেশী ঘুমোয় না প্রসাদদা। সারারাত কেটে যায় বসে বসে। মাঝ রাতে দুঘণ্টার জন্তে ঘুম যদি আসে, ভালো নয়তো সারা রাত এমনি ভাবে বসে থাকে।

শুধু তাই নয়, জীবনকে সর্ব রকমে সহজ করেছে প্রসাদদা। আহার বলতে দিনের বেলা আতপ চালের ভাত আর একটু তরকারি, রাতে খানকয়েক লুচি,

তরকারি আর সামান্য দুধ। সাজ পোষাকেও কোন আড়ম্বর নেই। মোটা জামা কাপড় আর কেড্‌সের জুতো। ঘরে বাইরে সর্বত্র এক।

জিজ্ঞাসা করি প্রসাদদাকে, বিয়ে করেছে কিনা। না সে দিক থেকেও কোন বন্ধন নেই। তবে সংসার আছে। মা, ভাই, বোন, ভাইবৌ-এর সংসার।

প্রসাদদার কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। শেষ রাতে ঘুম ভাঙে প্রসাদদার ডাকে। মাষ্টার মশায়ও উঠেছেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে গোমুখী ধারা ও মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান করে শ্রীবিশেশ্বর ও অর্ধনারীশ্বর মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করা এখানকার বিধি। মাষ্টারমশায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যাবো কিনা।

—যাবো।

—চুপি চুপি এসো। মাষ্টারমশায় অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন,—পূরবী জানতে পারলে রক্ষে নেই। সে ঠিক আসবে।

চুপিসারে নীচে নেমেছি। শুনতে পাই পায়ের শব্দ। সিঁড়ির মুখে মেয়েকে দেখতে পেয়ে মাষ্টার মশায় বললেন—ওই ভাখো, ও ঠিক আসছে।

নীচে নেমেই পূরবী বলে,—আমাকে না ডেকেই চলে যাচ্ছিলে বাবা?

—না ডাকতেই তো এসেছিস মা। মাষ্টারমশায় সস্নেহে বললেন,—আয়। তোর মার ঘুম ভেঙেছে?

—না।

প্রথমে গোমুখী ধারা, পরে মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান করে বিশেশ্বর ও অর্ধনারীশ্বর দর্শন করে যখন বাসায় ফিরেছি তখনো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। লালসিং ইতিমধ্যে এসে গেছে। জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বসে আছে চলার অপেক্ষায়।

রজনীবাবু তৈরী হয়ে বসে আছেন বারান্দায়। সীমা একান্তে দাঁড়িয়ে দাঁতে ব্রাশ ঘষছে। কী জানি কেন, সাত সকালে মুখ ভার করে বসে আছেন শ্রীমতী রজনী। শান্তিলতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি পাহাড়ী কুকুরের বাচ্চাকে আদর করছেন।

'জয় কেদারনাথ কী জয়'। প্রসাদদা সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিল।

আমাদের চলার আয়োজন সম্পূর্ণ।

শুধু আমরা নই, আরো হাজার হাজার যাত্রী, কেদারনাথের নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। না জানি কী যাদু আছে ওই নামে, যে নামের আকর্ষণে হাজার নর-নারী চলেছে পথ হেঁটে।

বিচিত্র এই মিছিলের চরিত্র, কারো সঙ্গে মিল নেই, অথচ চলার পথে এরা এক সুতোয় গাঁথা। সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী, অবধূত, ভিখারী, বাউল—কতো রকমের মানুষ চলেছে। অন্ধ—যে জানে না আলোর ঠিকানা, সেও চলেছে অন্যের হাত ধরে। মুখে তার কেদারনাথের নাম। খঞ্জ চলেছে ক্র্যাচে ভর করে। পথ চলতে তার কষ্ট, তবুও যাচ্ছে।

নানা চটি পার হয়ে একজনকে দেখলাম। একটি পা নেই। পথের ধারে বসে বিশ্রাম করছে। পাশে পড়ে রয়েছে দুটি ক্র্যাচ। বিশ্রামের অবসরে ছেনি দিয়ে কেটে কেটে পাথরের মূর্তি তৈরী করছে। নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তি। এখনো অসম্পূর্ণ। লোকটিকে দেখছিলাম, কাছে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কি জানি কী খেয়ালে দুআনা পয়সা চাইলো। চা খাবে। পয়সা নিয়ে দুহাত তুলে বললে, 'জয় কেদার, জয় নারায়ণ'। এ পথে অভিবাদনের ভাষা এই, সম্বোধনের ভাষা এই। চেনা-অচেনা নেই, পরস্পরের দেখা হলেই শুধু ওই দুটি কথা 'জয় কেদার, জয় নারায়ণ'।

প্রসাদদা হাঁটছে। যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। কাঁধের ঝোলা দুটি ঠিকই আছে, হাতের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চলেছে। মুখে ভগবানের নাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে পথ। কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। কখনো বা সমান্তরাল রেখার মতো।

তীর্থ-পথিকের মিছিল চলেছে। বিচিত্র সে মিছিল। অধিকাংশ যাত্রী চলেছে পায়ে হেঁটে, যারা এ চড়াই উৎরাই পথ হাঁটতে অসমর্থ—ঘোড়া, ডাণ্ডি বা কাণ্ডি তাদেরই জন্যে।

এক স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলাম, যিনি রুদ্রপ্রয়াগে একটি দোকানের সামনে পথ হাঁটা ব্যাপারে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—তিনিও চলেছেন একটি শীর্ণকায় ঘোড়ার পিঠে বসে। ভয়ে ভয়ে অনবরত খাদের দিকে তাকাচ্ছেন। আমাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ভদ্রমহিলা একটু হেসে 'জয় কেদার' বলে প্রীতি সম্ভাষণ জানালেন।

প্রসাদদা বলে উঠল অস্ফুটকণ্ঠে—বেচারা ঘোড়া, ওই মালাই সমেত কী করে যে চড়াই উঠবে!

—মালাই মানে!

—ওইতো অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন বিপুলাঙ্গী—

প্রসাদার রসিকতায় না হেসে পারি না।

কথায় কথায় নারায়ণ চটিতে এসে পৌঁছেচি। এখানে ভদ্রেশ্বরের প্রাচীন মন্দির আছে। প্রসাদদার ইচ্ছে ছিল যাবার, কিন্তু আমার অনিচ্ছায় মন্দিরে যাওয়া হলো না।

নারায়ণ চটি পিছনে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। চলার পথে সকলের মনেই বিচিত্র এক উন্মাদনা। পিছনে ফিরে চাইবার অবকাশ নেই, শুধু সুমুখে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলা।

এক চড়াই শেষ না হতে নতুন চড়াই এগিয়ে আসে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায় যাত্রীদল। চড়াই পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তারপর কেদারনাথের নাম নিয়ে আবার আরম্ভ হয় পথ চলা।

ওপরে নীল আকাশ। দূরে পাহাড়ের ওপারে আরও কতো গিরিশৃঙ্গ। কোথাও পাহাড়ের কোলে সবুজ একটু উপত্যকা। যেখানে—কয়েকঘর বাসিন্দা নিয়ে ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম। কোথাও পথের দুধারে পাহাড়ের ঢালুতে ফসলের ক্ষেত। কাজ করছে গাড়োয়ালী মেয়েপুরুষ। কাজের ফাঁকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছে তীর্থযাত্রীদের দিকে।

আবার কোথাও-বা পথের দুধারে গভীর অরণ্য। সূর্যের আলোটুকুও পৌঁছয় না। গাছের শাখায় শাখায় অজস্র পাখীর কাকলি। কোথাও বা বিচিত্র বর্ণাঢ্য ফুলের সমারোহ। গাছের পল্লবে পল্লবে, লতায়, গুল্মে, ঝোপে ঝাড়ে ফুটে আছে কতো রকমের নাম না-জানা ফুল। ফুলের বাসরে মৌ-পানের নেশায় মাতাল ভ্রমরের গুঞ্জন।

কোথাও খাদের গভীরে অরণ্যের মধ্যে ঝর্ণার কুলকুল শব্দ। অরণ্যের আড়ালে কোন অন্ধকারের মধ্যে ঝর্ণা ধারা নেমেছে—দৃষ্টি সেখানে পৌঁছয় না, শুধু কানে আসে ঝর ঝর, ছল ছল শব্দ।

যতো দেখি মুগ্ধ হয়ে যাই। তবু না মেটে চোখের নেশা, মনের আশা। ভাবি, না জানি আরও কী দেখবো, আরও কতো সৌন্দর্য অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। যতো ভাবি মনটা ততো হালকা হয়ে যায়। মনে হয় এ সৌন্দর্যের স্বাদটুকু গ্রহণ করার মতো মন আমার কেন, কোন মানুষেরই নেই।

যখনই একথা ভাবি তখনই কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ি। পরক্ষণে মনকে বোঝাই—মানুষের মন, কতটুকু তার ব্যাপ্তি, কতটুকু তার শক্তি। সীমা যেখানে সীমার বাইরে, মানুষ সেখানে অভাজন।

পথ চলতে বসে পড়েছিলাম পথের ধারে একটি পাথর খণ্ডের ওপর। কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু সেই কয়েকটি মুহূর্তের চিন্তা-বৈচিত্র্যে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। মনে হয়, এ পথে চলবার ছাড়পত্র পাওয়ার অধিকার আমার এখনও আসেনি। এখনও আমাকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে হিমালয়ের অন্তহীন বৈচিত্র্যের সংগে নিজেকে মিশিয়ে দেবার জন্যে।

মনে হয়—যে পর্যন্ত এসেছি, এখানেই পথের ধুলোর ওপর দাগ এঁকে এবারের মতো পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিই। ফিরে যাই পুরোনো ঠিকানায়—জীবন যেখানে সীমার বন্ধনীর মধ্যে পূর্ণ।

—শ্রীমন্ত।

প্রসাদদার কণ্ঠস্বর শুনে সচকিত হয়ে উঠি। লাঠি ঠুকে ঠুকে কাছে এগিয়ে এলো প্রসাদদা।—খানিক এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলাম তোমার জন্যে। ওঠো।

—প্রসাদদা।

—কী ভাই।

—ভালো লাগছে না। হঠাৎ কী যে হলো, মনের সব আগ্রহ উবে গেল।

—ও কিছু না। এসো। বলে প্রসাদদা সোল্লাসে জয়ধ্বনি দেয়—'জয় কেদারনাথ কী জয়'।

আবার শুরু করি পথ চলা। কয়েক পা চলতেই আবার আমার অবসন্ন মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। শুনতে পাই আমার মনের মধ্যে থেকে কে যেন বলছে—চলো মুসাফির, আরও এগিয়ে চলো।

চড়াই পথে উঠছি লাঠি ঠুকে ঠুকে। প্রসাদদা চলেছে আগে আগে। পথ চলার জুড়ি নেই প্রসাদদার। ওই শীর্ণ দেহ, সরু লিকলিকে দুখানি পা—অথচ কেমন স্বচ্ছন্দ ভংগীতে উঠছে চড়াই পথে।

কিছু পথ এসেই প্রসাদদা আবার মনের আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে আরম্ভ করলো। তারপর গান ধরলো উদাত্ত কণ্ঠে—

'ও তুই যাবি পরপার,
এ ঘাটে নিতাই কর্ণধার।'

কতো যাত্রীকে দেখছি, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে পথের ধারে বসে। কারও কারও মুখে চিন্তার রেখা। এই পথ অতিক্রম করবে কেমন করে। যদিও মুখে বলছে অভয় বাণী—'জয় কেদার', তবু চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

পথ ছাড়া এখানে কেউ আপন নয়। পথই বন্ধু, আত্মীয়। নয়তো একই সংগে বেরিয়ে একজনকে পেছনে রেখে আর পাঁচজন এগিয়ে চলেছে। পেছনে যে পড়ে রইলো, তার দিকে একবার কেউ ফিরেও দেখছে না।

—ও নলি, একটু দাঁড়া মা, আমাকে ফেলে রেখে চলে যাসনে। পথের ধারে ধুলোর ওপর বসে এক বৃদ্ধা হাঁপাচ্ছেন। নলির দল শুধু একবার ফিরে দেখলো।

—তোরা চলে যাচ্ছিস? আর্তনাদের মতো শোনালো বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর।

—তুমি আস্তে আস্তে এসো মাসি। বোধহয় নলিই উত্তর দিলে।

—আমি যাবো কেমন করে? বৃদ্ধা আকুল নয়নে দেখছেন চলমান যাত্রীদের।

—ভগবানের নাম করে এগিয়ে চলুন। প্রসাদদা বললে,—ভয় পাচ্ছেন কেন, ঠিকই পৌঁছে যাবেন। আর না যদি হাঁটতে পারেন, তাহলে ডাণ্ডি বা কাণ্ডি চেপে যান।

—পয়সা কোথায় পাবো বাবা? বৃদ্ধার দুটি চোখ ছল ছল করে ওঠে,—কী করে যে যাচ্ছি, তা দয়াময়ই জানেন। ওরা ভরসা দিলে, তাই এলাম। নয়তো কী আর আসি। বাবা, তোমাদের ওই গলায় ঝোলানো পাত্তরে জল আছে? দাওনা—গলা শুকিয়ে উঠেছে। আমার কাছে ঘটি আছে।

জলপাত্র থেকে বৃদ্ধার ঘটিতে জল ঢালতে ঢালতে প্রসাদদা জিজ্ঞাসা করলে—সকালে কিছু খেয়েছেন তো?

—না। একবেলা দুটো ভাত, আর রাতে এক চুমুক দুধ—তাই ভাবছি পয়সায় কুলোবে কিনা। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বৃদ্ধা বললেন,—আমার কথা আর শুনো না বাবা।

মিছরী আর কিসমিস সংগে আছে। তাই থেকে বৃদ্ধার হাতে খানিক দেওয়া হলো। মিছরীর টুকরো আঁচলে বেঁধে রেখে শুধু কটি কিসমিস মুখে দিয়ে বৃদ্ধা একঘটি জল পান করলেন। তারপর লাঠি হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —বেঁচে থাকো বাবা, কেদারনাথ তোমাদের সুখে রাখুন।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চললেন বৃদ্ধা। এর মধ্যে কখন রাঙাদি এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্য করিনি। ওদিকে মাস্টারমশায় হাঁকছেন—শ্রীমন্ত দাঁড়াও, একসংগে যাবো।

—আপনাদের আর সকলে কই? রাঙাদিকে জিজ্ঞাসা করি।

—পেছনে আসছে। রাঙাদি মুখ টিপে হেসে উত্তর দেয়,—সকলের পা তো পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো নয়।

—আপনার পা-ও তো কম চলে না।

—চলে, তবে একটু ধীরে। রাঙাদি হঠাৎ সামনের চড়াই পথের দিকে আঙুল উচিয়ে বললে,—দেখছেন কতো ওপরে উঠেছে পথ। ওইখানে আমরা উঠবো। সত্যি, ভারী সুন্দর লাগছে, না?

—হাঁ সুন্দরই বটে। এর তুলনা নেই। বলে ফিরে চাই রাঙাদির মুখের দিকে।

রাঙাদির দৃষ্টি উদাস। ওর চোখের তারায় দূর পাহাড়ের প্রতিবিম্ব। জিজ্ঞাসা করি—কী দেখছেন?

—যা দেখতে পাচ্ছি। মুহূর্তে রাঙাদি সহজ হয়ে ওঠে,—এখনো আপনি বলা অভ্যেসটা ছাড়তে পারলেন না?

—সবে তো পরিচয় হয়েছে। অপরিচয়ের দেয়াল ভাঙতে সময় লাগে।

—তা হোক, আমাকে আর আপনি বলে বিব্রত করবেন না। বলে মাথা নীচু করলো রাঙাদি।—এটা আমার অনুরোধ।

—বেশ তাই হবে। আশা করি তুমিও আমাকে—

—হাঁ, তুমিই বলবো।

আমাদের কথার মধ্যে মাষ্টারমশায় এসে পৌছলেন। একটু পরেই শান্তিলতা। মাষ্টারমশায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু বিশ্রামের জন্যে পথের ধারে পাথরের ওপর বসে গা এলিয়ে দিলেন। স্বামীকে বসতে দেখে শান্তিলতা বললেন—বসলে কেন?

—একটু বোসোই না। রজনী আসুক—একসংগে যাবো।

—জ্যাঠামণি আসছেন ঘোড়ায়, পূরবী বলে, তাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা মিছে। চলো আমরা এগিয়ে যাই।

একই সংগে চলতে আরম্ভ করে কখন যেন মনের ভুলে আমি আর প্রসাদদা সকলকে পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছি। চড়াই পথ পার হয়ে নামছি উৎরাই পথে। দূরে একটি পাহাড়ের পাদদেশে বিউঙ্গ চটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, ও আর এমন কিছু বেশী দূরে নয়। কিন্তু একঘণ্টা পথ চলেও বিউঙ্গ চটিতে পৌছতে পারি নি।

ইচ্ছে ছিল বিউঙ্গ চটিতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করবো। কিন্তু প্রসাদদা থামতে নারাজ। বলে, বিশ্রাম নিলে চলতে আরও কষ্ট হবে। এখনও যে চড়াই পথ সামনে।

বিউঙ্গ থেকে মৈখণ্ডা। দূরত্ব এমন কিছু বেশী নয়। যদিও চড়াই অতিক্রম করতে হয়েছে, তবু এ-পথটুকু এসেছি অনায়াসে।

মৈখণ্ডায় পৌঁছেই দেখি একটি চায়ের দোকানের সামনে ভিড়। একজন প্রৌঢ়া পাঞ্জাবী মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে—অস্ফুট গোঙানি ছাড়া কোনও সাড়া শব্দ নেই। কোন পুরুষ নেই সঙ্গে। শুধু দুটি মেয়ে। এরা তিনজনেই ঘোড়ায় চেপে আসছিল। সারাটি পথ খাদের দিকে তাকাতে তাকাতে এসেছে ওই প্রৌঢ়া। ঘোড়ার সহিস বারবার নিষেধ করেছে। শোনেনি। এখানে পৌঁছেই প্রৌঢ়া বুকে হাত চেপে ঘোড়ার পিঠে ঢলে পড়ে। মাটিতে পড়ে যায়নি—তাই রক্ষে।

একটি মেয়ে প্রৌঢ়ার মাথায় জল দিচ্ছে, অন্য জন চামচ দিয়ে দাঁত ফাঁক করে কিসমিস দিচ্ছে মুখে।

ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় প্রসাদদা—আহা করছো কী, এখন কি জ্ঞান আছে যে চিবিয়ে খাবে ?

ওষুধের ব্যাগ সংগেই ছিল। তাড়াতাড়ি কয়েক ফোঁটা কোরামিন জল মিশিয়ে দিই প্রসাদদার হাতে। কোনমতে চামচ দিয়ে দাঁত ফাঁক করে ওষুধটুকু মুখের মধ্যে ঢেলে দেয় প্রসাদদা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চেতনা ফিরে এলো মহিলার। মেয়ে দুটি যেন হারানো চাঁদ হাতে পেয়েছে। দুজনেই মহিলার বুকে মাথা গুঁজে সমস্বরে বলে ওঠে, মেরে চাচী।

প্রসাদদা এবারে নির্দেশ দিলে গরম দুধের সংগে একটু গ্লুকোজ খাওয়ানোর জন্যে। কিন্তু কোথায় পাবে গ্লুকোজ ? অগত্যা প্রসাদদা নিজেই গেল তালমিছরি দিয়ে দুধ গরম করতে।

আরও কিছুক্ষণ বাদে মহিলা উঠে বসলো। কথা বললো স্বাভাবিক ভাবে। তারপর জানালে, যতো কষ্টই হোক, বাকী পথ সে হেঁটেই যাবে। ঘোড়ায় তো নয়ই, ডাণ্ডি-কাণ্ডিতেও চাপবে না।

ইতিমধ্যে মাষ্টার মশায় এলেন। পেছনে মা ও মেয়ে। রজনীবাবুকে নিয়ে

সেই আধমরা ঘোড়াটাও এলো। শ্রীমতী রজনীও আসছেন ডাণ্ডি চেপে। সব শেষে ক্লান্ত চরণে আসছে সীমা।

শ্রীমতী রজনীর মুখ থম থম করছে। ডাণ্ডি থেকে নেমে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। রজনীবাবুর মুখখানাও মেঘলা আকাশের মতো। কারও সংগে কথা না বলে শুধু একবার পেছন ফিরে সীমার মুখের দিকে তাকালেন। যে সীমা যখন তখন নিজের মনে হাসে, কথা বলে—সেও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। হয় স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি, না হয় আর কিছু।

ভালো মন্দ কোন কথা না বলে আবার চলতে শুরু করি প্রসাদদার সংগে।

মৈখণ্ডা থেকে ফাটা সামান্য পথ। কিন্তু এই পথটুকু পার হওয়া দায়। আকাশে জ্বলছে সূর্য। শীতের আমেজটুকুও আর নেই। পাহাড় তেতে উঠেছে। সর্বাংগে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিট্‌ চিট্‌ করছে। অথচ গরম পোষাকও খুলতে পারছি না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। সামনে পেছনে আরো কতো যাত্রী। সকলেই ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে। অফুরন্ত আনন্দের উৎস শুধু প্রসাদদা। একটানা বকে চলেছে। নানা রকমের কথা শুনে হাসি পায়। এমন রসিয়ে কথা বলতে প্রসাদদার জুড়ি দেখিনি।

প্রসাদদা ছিল বলেই এ পথটুকু এতো সহজে অতিক্রম করে এলাম। মৈখণ্ডা থেকে বেরিয়েছি সওয়া দশটায়। ফাটা পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা বাজলো।

লালসিং আগেই পৌঁছেচে। বিশ্রাম নিচ্ছে পথের ধারে একটি দোকানে। কিছু বলে দিই নি, তবু আগেভাগে এসে চটিতে একটি ঘর ঠিক করে রেখেছে।

আজ থেকে আমার সব ভার লালসিং-এর ওপর। ও তা জানে। রান্নাবাড়া সবই করবে ও। সেই মতো কথা হয়েছে।

যাত্রীর ভিড়ে গম গম করছে ফাটা। দুপুরে কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানে বিশ্রাম করবে যাত্রীদল। তারপর বেলা তিনটে না বাজতে আবার যে যার পথে চলে যাবে। এখন কোন চটিতে জায়গা নেই, তখন শূন্য চটিগুলো খাঁ খাঁ করবে। এখনো তীর্থ-পথিকের প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হয়নি। এখনো কেদারনাথের মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হয়নি। আগামী কাল দরজা উন্মুক্ত হবে।

যে ঘর ঠিক করেছে লালসিং, সে ঘরে উঠতে শ্রীমতী রজনীর আপত্তি। কিন্তু খোঁজাখুঁজি করেও কোন চটি খালি পেলেন না রজনীবাবু। নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। শ্রীমতী রজনী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গরম পকৌড়ি খাচ্ছিলেন, ঘর পাওয়া গেলনা শুনে বলে উঠলেন—তুমি পুরুষ মানুষ না-কী? সবাই ঘর খুঁজে পেলে আর তুমি পেলে না। কাল থেকে কুলিদের আগে পাঠিয়ে দিও।

—তুমিই তো বলেছো কুলিরা সংগে সংগে থাকবে। অতো জিনিষ-পত্তর দিয়ে তুমিই তো ওদের বিশ্বাস করতে পারো না। ওভারকোটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রজনী বাবু বললেন,—তোমার মন না মতি। কী ভুল যে করেছি, তোমায় সংগে এনে—

—ভুল করেছো? শ্রীমতী রজনী বলে উঠলেন,—বেশ আমি না হয় সীমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

—ছিঃ ছিঃ, কী আরম্ভ করলে রজনী। মাষ্টার মশায় মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন,—তোমরা তো ছেলেমানুষ নও। একটা ঘর যখন ঠিক হয়েছে, আবার ঘরের কী দরকার। বারোটা বাজতে চললো, আর তো দু তিন ঘণ্টার ব্যাপার।

অগত্যা একই ঘরে দুপুরটা কাটানো সাব্যস্ত হলো।

স্নানাহার চুকতে বেলা দুটো বাজে। দুদণ্ড নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবো, তার উপায় নেই। বিশ্রী রকমের মাছির উৎপাত। শুয়ে বসে স্বস্তি নেই।

মাষ্টারমশায় জিজ্ঞাসা করলেন,—এবেলা ক মাইল হাঁটতে হবে প্রসাদ?

নোটবুকে পথের সকল বিবরণ লিখে এনেছে প্রসাদদা। বললে,—পাঁচ মাইল। রামপুরে পৌঁছে রাত কাটাতে হবে।

—তবে আর দেরী করা কেন? মাষ্টার মশায় বললেন,—হাঁটতে আরম্ভ করা যাক।

—তাই চলুন। ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে প্রসাদদা উঠে দাঁড়ায়।—জয় কেদার।

শ্রীমতী রজনীর সব কিছুতেই বিরক্তি। বলেন—আমি বাপু এখন যেতে পারবো না।

তাড়াতাড়ি করেও চটি ছেড়ে বেরোতে তিনটে বাজলো। রজনীবাবু চললেন ঘোড়ায় চেপে, আর শ্রীমতী রজনী ডাণ্ডিতে। সীমা রইলো আমাদের সংগে।

কিছুদূর এগিয়ে ডাক শুনতে পাই—ও দাদা শুনছেন? ফিরে দেখি হন্ হন্ করে আসছে কমলা ঘোষ।

প্রসাদদা বললে,—এইরে, লাট্টু এসে গেছে।

—কাকে কি বলছো প্রসাদদা?

—কাকে আবার, ওই মেয়েটিকে। হরিদ্বার থেকে দেখছি ওকে। দেখা হলেই হচ্‌পচ্‌ বকতে আরম্ভ করবে। গুপ্তকাশীর পর আর দেখা হয়নি—ভেবেছিলাম হয় এগিয়ে গেছে, না হয় পিছিয়ে পড়েছে।

—ওকে আমিও চিনি। কিন্তু নাম তো লাট্টু নয় কমলা।

—আমি ছাই নামটাম জানিনে। লাট্টুর মতো ফর ফর করে, তাই নিজে থেকেই নাম রেখেছি লাট্টু।

আশ্চর্য মেয়ে কমলা। চলনে-বলনে এতটুকু জড়তা নেই। কাছে এসেই বললে—আপনাদের দুজনকে নমস্কার। তারপর আপনারা এক সংগে মিললেন কোথায়?

—পথে। গুপ্তকাশীর পথে। প্রসাদদা জিজ্ঞাসা করলে,—আপনার মা-পিসি কই?

—তাঁরা ঠিক আসছেন। আমি যাচ্ছি আমার মতো। প্রসাদদার পাশাপাশি চলতে চলতে কমলা বলে,—পথ তো একটি, হারিয়ে যাবার ভয় নেই। কী, কিছু বলুন শ্রীমন্তদা।

—কী আর বলবো?

—তার মানে, কিছু বলবার নেই?

—না। একটু ইতস্ততঃ করে বলি,—দেখুন কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলি।

—একটা কেন, দশটা কথা বলুন না।

—দেখুন, আমরা এক গোপন বিষয় আলোচনা করতে করতে যাচ্ছিলাম তাই—

—থাক আর বলতে হবে না। বাব্বাঃ এপথেও গোপন বিষয়—বলে দ্রুত এগিয়ে যায় কমলা।

—ভগবান খুব রক্ষে করেছেন প্রিয়ব্রত। প্রসাদদা দুহাত কপালে ঠেকালো। —এখন ও গরমে গরমে এগিয়ে যাক।

রাঙাদি হাসছিল। বোধ হয় ধরনধারণ দেখে। বললো,—এ আপনার ভারি অন্যায়। মেয়েটি কি ভাবলো বলুনতো!

—ওসব মেয়ে বেশী ভাবে না। বলে, প্রসাদদা মুখ টিপে হাসে।

—প্রসাদ আছে বেশ। মাষ্টারমশায় কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, কেউ তা লক্ষ্য করি নি।

—হাঁ, সব সময়ে মেতেই আছি। বর্ষাকালের আখের গুড়ের মতো। বলে প্রসাদদা দুহাত তুলে চীৎকার করে ওঠে—জয় কেদারনাথকী জয়।

শুধু আমরা নই, সামনে পিছনে যাত্রীর মিছিল। চেনা-অচেনা কতো মুখ দেখছি। যে দলটির সংগে হৃষীকেশ থেকে বাসে উঠেছিলাম, তাদের সংগেও দেখা হলো। আপন-আপন গাঁটরি-বোঁচকা মাথায় নিয়ে দল বেঁধে চলেছে কেদারনাথের নাম উচ্চারণ করতে করতে। পথিমধ্যে দেখা হলো সেই বৃদ্ধার সংগে, যিনি তৃষ্ণার জল চেয়েছিলেন আমাদের কাছে—লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চলেছেন। দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো তো বাবা?

—নিশ্চয়ই পারবেন।

—কী জানি, আমার তো মনে হয় না—পারবো। তারপর জুতো পায়ে দিয়ে ফোস্কা পড়েছে। বলে বৃদ্ধা পা দেখালেন। ফোস্কা গলে গেছে। বিষিয়ে না ওঠে। তবুও বললাম—না না ও কিছু না, সেরে যাবে।

বৃদ্ধাকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলি।

নিবিড় ছায়া জড়ানো মনোরম পথ। যেন চলে গেছে স্বপ্নলোকের পথে। জংগলাকীর্ণ এ পাহাড়। বড়ো বড়ো গাছের অবিন্যস্ত সমারোহ। এক-দিকে সুউচ্চ শিখর, অন্যদিকে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন খাদ। খাদের গভীরে বয়ে চলেছে মন্দাকিনীর জলধারা। দেখতে পাচ্ছিনা, শুধু কানে আসছে মন্দাকিনীর ছুটে চলার শব্দ। ছোট বড়ো কতো ঝর্ণা দেখছি পথের পাশে। পাহাড়ের কোন অন্ধকার রন্ধ্রপথে নেমে আসছে জলধারা।

জানিনা, কখন চলতে চলতে দল ছাড়া হয়ে পড়েছি। সামনের দিকে ফিরে চাই, দেখি অনেক দূরে এগিয়ে গেছে সবাই। শুধু রাঙাদিকে দেখছি না, হয়তো সে আরও এগিয়ে গেছে, না হয় পিছিয়ে পড়ছে।

আমাকে পিছনে রেখে কতোজন এগিয়ে যাচ্ছে কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে। যাক্। আমিও যাবো। তবে পথকে বিস্মৃত হয়ে পথ চলতে পারবো না। পথের দু ধারে সঞ্চিত রয়েছে যে সৌন্দর্য সুধা—আমি সে সুধা আকণ্ঠ পান করবো।

'জয় কেদার, জয় কেদার'—না জানি কী যাদু আছে ওই নামে, যে নাম উচ্চারণ করতে করতে কাতারে কাতারে নর-নারী চলেছে পথ হেঁটে। কতো আশা নিয়ে চলেছে এই সব নর-নারী। সে আশা কী শুধু কেদারনাথকে দর্শন করা, স্পর্শ করা—না আরো কিছু!

পথের পাশেই ছোট একটি ঝর্ণা। পাশেই পড়ে রয়েছ বিরাট এক খণ্ড পাথর। এখানে ক্ষণকাল বসবার বাসনা হলো। বসেছি। দেখছি চারদিকে চেয়ে। ভাবছি, পুণ্যের প্রত্যাশা নিয়ে এই সব নর-নারী চলেছে এই পথে, সে পুণ্য কী এতোই সুলভ? না, সে পুণ্য চির-দুর্লভ?

পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়—মানুষের অভিধানে তার যে অর্থ লেখা থাক না কেন, আমার কাছে তা অর্থহীন মনে হয়। তবুও মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা, এই যে দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে এসেছে অগণিত মানুষ, দুর্গম তীর্থপথে—সে কী শুধু পুণ্যের প্রয়োজনে? না, এর পিছনে আর কোন অব্যক্ত আকাঙ্খাও আছে?

—শ্রীমন্ত।

উন্মনা হয়ে পড়েছিলাম। চমক ভাঙে ডাক শুনে। রাঙাদি ডাকছে। এগিয়ে যায় নি রাঙাদি। পিছনে ছিল।

—কী করছো ওখানে বসে? রাঙাদি জিজ্ঞাসা করলে।

—কিছু না। হঠাৎ কী খেয়াল হলো, বসে পড়লাম। বলে পাথরের থেকে নেমে আসি।

—কিছু ভাবছিলে বোধ হয়? তোমার মুখের রেখা দেখে তাই তো মনে হচ্ছে।

—হয়তো ভাবছিলাম। জানো রাঙাদি, আমি যে কখন কী ভাবি—নিজেই জানি না।

—আমার নাম তো রাঙাদি নয়। কতো সহজে আমি তোমার নাম ধরে ডাকতে পারলাম, আর তুমি পারলে না?

—সীমা তোমাকে রাঙাদি বলে, তাই বললাম। তাছাড়া রাঙাদি কথাটিও

বেশ। মনে করো আমি তোমার নাম রাখলাম রাঙাদি কেমন খুশী তো? বলে রাঙাদির মুখের দিকে ফিরে চাই।

কদিন দেখছি—সব সময়ে কেমন যেন চিন্তাকাতর মনে হয় ওকে। কীসের চিন্তা!

সেদিন রাতের কথা মনে পড়ে। রুদ্রপ্রয়াগে সঙ্গমের ঘাটে ওদের কথা শুনেছিলাম। সীমা আর রাঙাদি, দুজনের মৃদু তর্কের কথাগুলো এখনো স্পষ্ট মনে আছে। থাকবে।

—কী দেখছো?

—তোমাকে।

—থাক, আমাকে দেখে সময় নষ্ট কোরোনা। চলো. সবাই এগিয়ে যাচ্ছে।

পাশাপাশি পথ চলি। আমি আর রাঙাদি।

রাঙাদি নীরব। আমার মুখেও কথা নেই। নীরবে নামছি।

এখন আর পথের দুধারে ঘন অরণ্য নয়। পাহাড়ী গ্রাম দেখছি, দেখছি ফসলের ক্ষেত। ফসলের ক্ষেতে কাজ করছে মেয়েরা। তাদের শিশুপুত্র পিঠে বাঁধা, অথবা কেউ বা শিশুদের ছেড়ে রেখেছে ক্ষেতের মধ্যে। কেমন অনায়াসে পাহাড়ের ঢালুতে খেলছে, ছুটোছুটি করছে তারা।

—এক পাই দে রাণীমা, একপাই দে শেঠজী। ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। কোনো দলের সঙ্গে তাদের মায়েরাও রয়েছে। যাত্রীর কাছে একটি কি দুটি পয়সা পাবে বলে দুহাত প্রসারিত করছে। সুন্দর ফুট ফুটে ছেলেমেয়ে। শতছিন্ন ময়লা জবরজঙ পোষাক পরনে, খালি পা, শনের মতো অবিন্যস্ত চুল, ঢল ঢলে মুখ। কাঁচা সোনার মতো রং, গালদুটি আপেলের মতো রাঙা।

যেমন ছেলেরা, তেমন মেয়েরা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবচেয়ে সুন্দর ওদের সরল চাউনি। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদেরও দেখছি। ফসলের ক্ষেতে কাজ করছে কেউ, কেউ মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে, কেউ গরু ভেড়া ছাগলের দঙ্গল নিয়ে চলেছে।

একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু কোলে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে মা। পূরবীর কাছে সুঁচসুতো ভিক্ষে চাইলো সে। সুঁচ আর সুতো সংগে এনেছে পূরবী। সে জানে এ পথের রেওয়াজ। সুঁচসুতো পেয়ে পাহাড়ী রমণীটির যেন আনন্দ

ধরে না। তার ভাষায় সে কতো কী বলে গেল, যে কথার মানে বুঝতে পারলাম না।

—সত্যি, এরা কতো সহজ সরল আর সুন্দর—বলে পূরবী মায়ের কোল থেকে শিশুটিকে বুকে তুলে নিলো। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে আদর করছে পূরবী। শিশুটিও তেমনি, পূরবীর গলা জড়িয়ে হাসছে। শিশুকে চুম্বন দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না সে।

মুগ্ধ কণ্ঠে বললাম,—মা হলে তোমাকে সুন্দর মানাবে পূরবী।

একটি মুহূর্ত মাত্র। তার মধ্যে সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়। মায়ের কোলে শিশুকে তুলে দিয়ে পূরবী দ্রুত চলতে আরম্ভ করে।

কী হলো পূরবীর! অমন করে চলে যাচ্ছে কেন! তবে কি আমার কথায় আঘাত পেয়েছে? কিন্তু আমি এমন কী বলেছি।

—পূরবী, পূরবী দাঁড়াও। আমার আরো কথা আছে, শুনে যাও। বার বার ডাকি ওর নাম ধরে। সাড়া দেওয়া দূরে থাক, একবার ফিরেও তাকালো না। ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে ওর পথরোধ করি। কিন্তু—না থাক।

অদূরে বদলপুর চটি। দেখতে পাচ্ছি কতকগুলো ঘর-বাড়ী। পূরবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একটু আগেও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এখন আর দেখছি না। পথের বাঁকে হারিয়ে গেছে সে।

ভুলে গিয়েছি পথের বার্তা। যন্ত্রচালিতের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি পূরবীর কথা ভাবতে ভাবতে। অবশেষে বদলপুর এলো। চা-পানের আশায় বসেছি একটি দোকানে। আরো কয়েকজন অপরিচিত যাত্রী সেখানে।

চা পান করছি। ভাবছি পূরবীর কথা। অন্য ভাবনা মুছে গেছে মন থেকে।

—বাবুজী। ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই খঞ্জ লোকটি।

—কিছু বলবে?

একটু চা খেতে চায় লোকটি। আর কিছু নয়। দোকানীকে চা দিতে বলে, লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি তার নাম।

নাম তুলসী দাস। বাড়ী ছিল বিহারের এক গ্রামে। শুধু নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তুলসী দাস বলে গেল ওর জীবনের সংক্ষিপ্ত কথা।

এক কালে বাড়ী-ঘর, সংসার সবই ছিল ওর। এখন আর কিছুই নেই। শুধু শূন্য ভিটে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে মন ব্যাকুল হলে তখন ও দেশে যায়।

নয় তো সারা বছর এমনি করে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অবসর সময়ে পাথরের টুকরো কুঁদে কুঁদে মূর্তি গড়ে।

আগে ও ছিল ড্রাইভার। লরি চালাতো। দুর্ঘটনায় ওর একটি পা নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে বেকার। ভিক্ষাই জীবিকা। বৌ ছিল, পালিয়ে গেছে পরপুরুষের সঙ্গে। পুরুষটি ওর চেনা জানা। আত্মীয়ের মতো। একটি ছেলেও ছিল, তাকে নিয়ে বাঁচতে পারতো তুলসী, কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, ছেলেটি দশ বছর বয়সে মারা গেল। এসব আজকের কথা নয়। সতের বছর আগেকার কথা। তখন তুলসী দাসের বয়স সাতাশ বছর। বৌ গেল, ছেলে গেল— তার ওপর নিজেও খোঁড়া মানুষ, ভিটে কামড়ে পড়ে না থেকে বেরিয়ে পড়লো উদ্দেশ্যহীন পথে। এই সতের বছর পথে পথে ঘুরছে ও।

পুরোনো কথা নতুন করে স্মরণ করতে তুলসীর দুটি চোখ জলে ভরে যায়, এমনি করে কাঁদতে হয় বলেই ও ফেলে আসা দিনের কথা মনে করে না। একদিন ও ছিল কর্মঠ যুবক। ঘরে ছিল সুন্দরী স্ত্রী সতী, আর পুত্র সুন্দরলাল। আজ ওর সে পরিচয় নেই—এখন ও একজন খঞ্জ ভিক্ষুক। দুটি ক্রাচে ভর দিয়ে অক্ষম দেহটা টেনে নিয়ে বেড়ায়, প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে।

তুলসী দাসের কথা শেষ হলো। আর নয়, আবার পথ চলা শুরু করতে হবে। বদলপুর থেকে রামপুর। সামান্য পথ—দেড় মাইল। সন্ধ্যের আগে নিশ্চিত পৌঁছনো যাবে।

কিন্তু সন্ধ্যে হলো রামপুর পৌঁছতে। লালসিং অপেক্ষা করছিল চটির সামনে। আমাকে দেখেই তার প্রথম প্রশ্ন—এতো দেরী হলো কেন? তারপর সামনের চটির দোতলার একটি ঘর দেখিয়ে দিলে। যেখানে রাত্তে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ঘর নয় তো, দরদালান। ইতিমধ্যে জনপঞ্চাশেক নরনারী আশ্রয় নিয়েছে। চালাও শতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়েছে চটিওয়ালা। মাথা পিছু ছ-আনা ভাড়া।

রজনীবাবুরা বোধহয় অন্য কোথাও উঠেছেন। তাঁদের কাউকে দেখতে পেলাম না। প্রসাদদার মালপত্তর রয়েছে, কিন্তু মানুষটি নেই। হয়তো বাইরে কোথাও গেছে।

রাঙাদির কথা মনে পড়লো। কী করছে রাঙাদি। এখনো কী তার অভিমান আছে আমার ওপর। হয়তো আছে। থাকবে। মেয়েদের মন শরৎকালের আকাশের মতো। এই মেঘ, এই রোদ্দুর।

—শ্রীমন্ত, শ্রীমন্ত কোথায়? ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকলেন মাষ্টারমশায়। চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

—কী হয়েছে মাষ্টার মশায়?

—মা-মণি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

পূরবী।—পূরবী জ্ঞান হারিয়েছে!

পাশের চটিতে এলাম। পূরবী শুয়ে আছে শতরঞ্জির ওপর। শান্তিলতা মাথার কাছে বসে। প্রসাদদা নাড়ী দেখছে। আর শ্রীমতী রজনী নির্বিকার, ছুরি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছেন। সীমা দাঁড়িয়ে আছে ছল ছল চোখে।

মাষ্টারমশায় বলতে লাগলেন, আগে মাঝে মাঝে এমন হতো মেয়ের, অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েও কিছু হয়নি। তারপর আপনা হতেই সেরে যায়। বছর তিনেক হলো ভালোই ছিল। আজ হঠাৎ কেন এমন হলো, বুঝতে পারছেন না। সুস্থ মেয়ে পথ হেঁটে এলো। এসেই জল খাবে বললে। শান্তিলতা বারণ করলেন, পথ হেঁটে এসেই জল খেতে নেই। তবুও জল চাইলে। বললে কষ্ট হচ্ছে। তারপর এই। লুটিয়ে পড়ল শতরঞ্জির ওপর।

—তোমার কাছে ওষুধ থাকে তো, দাও বাবা। শান্তিলতা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন,—কেদারনাথের কী ইচ্ছে জানি না। সুস্থ মেয়ে কেন যে এমন হলো।

কী ওষুধ দেব! আমি তো ডাক্তার নই যে রোগের চিকিৎসা করবো। শুধু সাধারণভাবে কিছু ওষুধ সংগে এনেছি মাত্র। হোমিওপ্যাথিকের বাক্স আছে, আর রয়েছে একখানি বই। সংগে আনি নি, ওষুধ পত্তর সবই ও ঘরে রয়েছে—আচ্ছা আমি ওষুধ নিয়ে আসছি—বলে আমাদের চটিতে এলাম। বই খুলে দেখি, মূর্ছা রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা-বিধি। সেই মতো ওষুধও নিলাম সংগে।

এখনো চোয়াল চেপে আছে পূরবীর। শান্তিলতা চামচ দিয়ে দাঁত ফাঁক করতে ওষুধ ঢেলে দিলাম মুখে।

কী আশ্চর্য! দশমিনিট সময়ও লাগলো না। জ্ঞান ফিরলো পূরবীর। সীমা মুখের কাছে ঝুঁকে পড়তে ক্ষীণকণ্ঠে বললে—আমার কী হয়েছে সীমা?

—কী আবার হবে। শান্তিলতা মেয়ের মাথায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,—কিছুই হয়নি।

পূরবী চোখ বন্ধ করলো। তারপর আবার চোখ মেলে চাইলো। ডাকলো—বাবা।

—কী? কিছু বলবি?

—দেহটা এত হালকা মনে হচ্ছে কেন?

—কিছু না, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছিস তাই এমন হচ্ছে।

—তোমরা ভাবছো আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পূরবীর মুখে ফুটে ওঠে হাসির রেখা,—আমি সব বুঝতে পারছি।

আরো কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো পূরবী। তারপর উঠে বসে সীমাকে কাছে ডাকলো। সীমার সঙ্গে কথা বলছে দেখে আমি বাইরে এলাম।

হাজার হাজার যাত্রীর কলরবে মুখর রামপুর চটি। মোট ষোলটি চটি এখানে, প্রতিটি চটি যাত্রীর ভীড়ে ঠাসা। অনেকে চটিতে জায়গা না পেয়ে দোকানের সামনে মালপত্তর নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাতে দোকানের বেচাকেনা শেষ হলে তখন এরা আশ্রয় নেবে ভিতরে। এমনও যাত্রী আছে যারা বাইরে কোনও আচ্ছাদনের নীচে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। দোকানে দোকানে জ্বলছে হ্যাজাক। খরিদ্দারের ভিড়ে চা-খাবারের দোকানগুলো গুলজার। কতো রকমের নরনারী—কারো সংগে কারো মিল নেই, সামঞ্জস্য নেই। তবু অমিল থেকে সবাই মিলেছে এখানে।

একটি দলকে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে লক্ষ্য করছি। বোধহয় তারা দক্ষিণ ভারত থেকে আসছে। পঁচিশ তিরিশ জন মেয়ে পুরুষের দল। ওই দলেরই একটি তরুণী, বিস্তঙ্গ চটি পেরিয়ে যাকে দেখেছিলাম পথে—বনফুল তুলে খোঁপায় গুঁজছে। মুহূর্তের দেখা। তবু ভুলে যাইনি।

তরুণীকে দেখেছি। উজ্জ্বল কালো গায়ের রং। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ওকে কৃষ্ণকলি বলবো না। এমন কথাও বলবো না যে, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তবু মুহূর্তের দেখায় তাকে চিনে নিয়েছি। তাকে দেখেছিলাম খাদের ধারে দাঁড়িয়ে ফুল তুলতে। শাদা শাদা এক এক গোছা ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজছিল। শুধু তাই নয়, সে চলেছিল আমার আগে আগে। ললিত লবঙ্গলতার মতো। পাখীর কাকলী শুনে কখনো থমকে দাঁড়াচ্ছিল সে, কখনো খাদের নীচে ফুল ফোটা কোনো গাছের দিকে চেয়ে কিছু দেখছিল।

তাকে আবার দেখলাম। জন-কোলাহলের বাইরে পথের ধারে একটি পাথর খণ্ডের ওপর বসে আছে, দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

এখনো রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়নি। চাঁদ উঠেছে। যদিও ফিকে কুয়াশা নেমেছে, তবু চাঁদের আলো বাধা পায়নি। দূরের পাহাড়গুলো কেমন যেন ছায়া-ছায়া দেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যানভ্যাসে আঁকা জলরং ছবির মতো। নীচে, অনেক নীচে খাদের গভীরে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। যদিও মন্দাকিনী চোখের আড়ালে, তবু কানে আসছে তার চলার ছন্দ। তার ছন্দে যে সুর জেগেছে—সংগীতের মতো।

এদিকে লোকালয় নেই। পথিকও বিরল। হয়তো রাত হয়েছে বলে। কিন্তু ওই তরুণী, একা নির্জনে বসে আছে কেন?

থাক। ও একা বসে থাকুক এখানে। নির্জনে ও উপলব্ধি করুক, এই রাতের প্রথম প্রহরে দেখা হিমালয়কে।

দাঁড়িয়ে না থেকে এগিয়ে চললাম। বনছায়া জড়ানো সংকীর্ণ পথ। কোথাও বা অসমতল। চলেছি সন্তর্পণে।

বেশ কিছু পথ চলে এসেছি। তারপর ক্ষণিকের জন্যে বসে থাকি পথের ধারে একটি মসৃণ পাথরের ওপর। পাশেই কয়েকটি ঝোপঝাড়। ফুল ফুটেছে তার পল্লবে পল্লবে। শাদা ফুল। মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। নাম জানি না ওই বনফুলের, জানিনা ওর প্রাণের খবর। শুধু এইটুকু জানি—ফুল ফুটেছে।

উঃ?—ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। কী যেন ফুটলো হাতে। কাঁটা। কাঁটার জ্বালাতেই উপভোগ করি ফুল তোলার আনন্দ।

যাদু জানে এই মায়াবী রাত। ভুলে গিয়েছি যে আমায় ফিরতে হবে চটিতে। রাত কাটাতে হবে সেখানে। এই মায়াবী রাত আমাকে সম্মোহিত করেছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি সম্মোহিতের মতো।

দূর পাহাড়ের কোলে জেগে আছে চাঁদ। আজ কোন তিথি মনে নেই, তবে চাঁদের চেহারা থেকে বুঝি ষোলকলায় পূর্ণ হতে এখনো কয়েকদিন দেরী আছে। এখনো প্রয়োজন আরো কয়েকটা রাত্রির তপস্যা।

জ্যোৎস্নার চন্দন মেখে রাত হয়েছে রূপসী। দিনের আলোর অংগনে যাবে বলে তার এতো সাজ, এতো ভাবন।

আত্মসম্মোহিত আমি। কী দেখছি, কী ভাবছি, তা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবো না। বলতে পারবো না মনের কথা। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, যেন কোন

স্বপ্নের পৃথিবীর পথে চলেছি। যেখানে দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। শুধু আকাশ আছে, চাঁদ আছে, আছে নক্ষত্রেরা। পাহাড় আছে, অরণ্য আছে, আছে অজস্র ফুল—আর তার মিষ্টি সুরভি।

চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে আরও কিছুপথ এসে শুনতে পেলাম ঝর্ণার ঝর ঝর শব্দ। ফিরে ফিরে দেখি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না।

পথের ধারে অমসৃণ শিলাখণ্ড। তারই ওপর বসে থাকি অলস ভংগীতে। কান পেতে শুনি অদেখা ঝর্ণা-ধারায় নূপুর ধ্বনি।

এখানে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন খোলা। সৌন্দর্যের দূতী দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। পথিকের অপেক্ষায়। আসবে সে দূরদেশী পথিক—তারই জন্যে তার ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

স্বপ্ন নয়—সত্যি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সৌন্দর্যের দূতী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মৌন ভাষায় সে বলছে, 'এই পথে এসো—এই পথে এসো—এই পথে এসো—আমাকে অনুসরণ কর'।

ওই পথ—জানি.ওপথে চলতে পাথরে পাথরে আহত হতে হবে আমায়, জানি কাঁটার আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হবে অংগ, তবু যেতে হবে আমায়। আমি যাবো।

চলেছি। পাথরে পাথরে পা রেখে, গাছের গুঁড়ি ধরে, লতার অবলম্বন আঁকড়ে—এগিয়ে চলেছি। আলো হারিয়ে গেছে—অন্ধকার বন পথ। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইশারায় বলছে, —এসো—এসো। ওইতো তার বুকের আংরাখা সরে গেল, ওই তো অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার বিলোল কটাক্ষ। ও আমাকে নিয়ে যাবে আমার অদেখা দয়িতার অংগনে।

দয়িতাকে শোনাবে বলে আমার বাউল মন একতারায় সুর বেঁধেছে। দয়িতাকে পরাবে বলে মালা গেঁথেছে বনফুলের। কিন্তু, কোথায় সেই অদেখা দয়িতার আলপনা আঁকা অংগন। আর কত দূরে?

আচমকা বেজে ওঠে একতারার তার। বাউল মন উল্লাসে নেচে ওঠে। ওইতো তার অদেখা দয়িতার অংগন। ওইতো—

'বলয় নূপুর মণি কিঙ্কনি কলনে
ঘুঙ্ঘুরু রুণুঝুণু বাজত চরণে॥'

—হুঁসিয়ার হো, হুঁসিয়ার। অপরিচিত কণ্ঠের চীৎকার আর টর্চের আলো এসে আমাকে মুহূর্তে সচকিত করে তোলে।

স্বপ্ন জাল ছিন্ন হয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্ধকার খাদ। পাহাড়ের রন্ধ্র পথে ঝর্ণার জলধারা ঝরে পড়ছে খাদের অসীমে। বনের আড়াল থেকে চাঁদের আবছা আলো চিক্ চিক্ করছে জলধারার ওপর। তাই বুঝি অমন দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল।

কিন্তু আমি এখানে এলাম কেন? কেন আমি এই বনের মধ্যে এসে পৌছলাম। নিশির ডাকের কথা শুনেছি, তবে কি সেই নিশির ডাক শুনে আমি—

আবার টর্চের আলো পড়ল মুখে। সেই সংগে এগিয়ে এলো মানুষী পায়ের শব্দ। দেখলাম দুজন লোক উঠে আসছে বনের মধ্যে দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছে এলো তারা। পোষাক দেখে অনুমান করি, এরা বনবিভাগের লোক। টহল দিতে বেরিয়েছে।

এসেই একজন আমাকে রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আমি এখানে কেন।

রাতের সৌন্দর্য দেখতে এসেছি শুনে ওরা কেমন তাজ্জব বনে গেল। তারপর আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিজেদের মধ্যে গাড়োয়ালী ভাষায় কি যেন বলাবলি করলে। শেষটা আমার হাত ধরে নামিয়ে আনলো নিচে। রামপুর চটির কাছে পৌছে দিয়ে ওরা চলে গেল। বলে গেল, রাতের সৌন্দর্য যদি দেখতে হয়, যেন ঘরে বসে দেখি। রাতে এখানে বাইরে বেরোনো মোটেই নিরাপদ নয়। এখানকার জঙ্গলে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অভাব নেই। বিপদ ঘটতে বেশী সময় লাগে না।

ওরা চলে গেল অন্যপথে। আমি ফিরে এলাম চটিতে। রাত সাড়ে নটা বেজেছে, এখনো রামপুর গুলজার হয়ে আছে তীর্থ-পথিকের কলরবে।

যে ঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, সে ঘরে এখন আর তিল ফেলার জায়গা নেই। সাকুল্যে প্রায় সত্তর আশী জন নর-নারী এই এক ঘরে। প্রসাদদা বেশ আসর জমিয়ে বসেছে। সুর করে পাঠ করছে চৈতন্য-চরিতামৃত। শুনছে পচিশ-তিরিশজন নারী-পুরুষ। দলের মধ্যে প্রসাদদার লাটুও আছে। মা-পিসির মাঝখানে বসে শুনছে চৈতন্য-চরিতামৃতের কথা।

এই একটি ঘরে সত্তর আশীজন মানুষ আর তাদের লটবহর। সেই সংগে তিরিশ চল্লিশটি উনুন জলছে ঘরে, না হয় পিছনের বারান্দায়—ধোঁয়ায় শ্বাস নিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাই ঘরে না বসে সামনের বারান্দায় এসে বসি কিছুক্ষণ। পরে প্রসাদদা এসে বসলো আমার পাশে।

রাত তখনো শেষ হয়নি। যাত্রীর কলরবে ঘুম ভেঙে গেল। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে পথ চলার তোড় জোড। দুএকটি দল ইতিমধ্যে কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করেছে।

মরশুমের সময়। দোকানীদের চোখেও ঘুম নেই, এরই মধ্যে চায়ের দোকানগুলো খুলেছে। জল ফুটছে বড়োবড়ো কেট্‌লি না হয় হাঁড়িতে। আঁচের পাশে বসে দোকানী দু হাতে চা করে চলেছে, আর মুখে বলছে—শেঠজী গরম চায় পিও।

এই দুর্গম পথে, শীতের মধ্যে চা যেন অমৃত। পথ চলার আগে আর কিছু না হোক, একটু গরম চা চাই।

দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটবার আগেই শুরু হলো আমাদের পথ চলা। আজকের পথ দারুণ চড়াই। তিন মাইল চড়াই পথে উঠে তবে এ পথের অন্যতম তীর্থ ত্রিযুগীনারায়ণ।

পথে সূর্য ওঠা দেখলাম। পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্য উঠলো।

যন্ত্রের মতো পায়ে পায়ে চলেছে তীর্থ-পথিকের দল। চলার পথ মুখর হয়ে উঠেছে 'জয় কেদারনাথ কী জয়' ধ্বনিতে।

আজ প্রসাদদা যেন ক্ষেপে গেছে। একনাগাড়ে গেয়ে চলেছে তাঁর প্রিয় গানের সেই দুই কলি—'ও তুই যাবি পর পার, এ ঘাটে নিতাই কর্ণধার'।

চড়াই পথ শুরু হলো। দারুণ চড়াই। তার ওপর সরাসরি রোদ এসে বিঁধছে গায়ে। অন্যদিনের চেয়ে আজ রোদের তেজ যেন বেশী মনে হচ্ছে। হয়তো এ পথে ছায়া নেই, তাই।

শেষ নেই এ পথের। যতো এগিয়ে চলেছি, পথ যেন ততো দীর্ঘ হচ্ছে। কতো যাত্রীর সংগে দেখা হলো, কাল যারা হেঁটে এসেছে, আজ তারা চলেছে ঘোড়ায়।

তুলসীদাসকে দেখলাম, পথের ধুলোর ওপর বসে পড়েছে। বেচারা রাত তিনটেয় বেরিয়েছিল। একটানা ক্রাচে ভর দিয়ে পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটি মাত্র পা নিয়ে চড়াই উঠতে যে কী কষ্ট, তা ওই জানে। জানতে চাইলো, ত্রিযুগীনারায়ণ এখনো কতো দূর। এখনো আড়াই মাইল। শুনে তুলসীদাস গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কেদারনাথের নাম উচ্চারণ করে।

'জয় কেদার'।—এ পথে কেউ কারো জন্যে দু দণ্ড অপেক্ষা করে না। শুধু

পরস্পরের দেখা হলে ওই একটি কথা 'জয় কেদার'। সুমুখ দিয়ে যতো যাত্রী চলেছে, সকলের উদ্দেশে তুলসীদাস হাত তুলে বলছে 'জয় কেদার'।

দাঁড়াবার সময় নেই। প্রসাদদার সংগে চলেছি লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে। সকাল থেকে আজ রজনীবাবুদের দলের কারো সংগে দেখা হয় নি। হয়তো তাঁরা এগিয়ে গেছেন, না হয় পিছনে আসছেন।

আরো কিছু পথ হেঁটে বসে পড়তে হলো। আর পারছি না। পা দুটো টন টন করছে। খানিক বিশ্রাম না নিলে নয়।

—কী হলো? বসে পড়লে কেন? প্রসাদদার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলি,—একটু বোসো দাদা। দশ মিনিট। পায়ের শিরাগুলো টেনে ধরেছে।

—তবে আমিও বসি। প্রসাদদা বসে পড়ে আমার পাশেই।—আমারো একটু বিশ্রাম দরকার শ্রীমন্ত।

নীচের দিকে ফিরে চাই। চড়াই পথে উঠছে তীর্থ-পথিক নর-নারী। দু পা চলছে আর থমকে দাঁড়াচ্ছে। আবার চলছে, আবার দু হাতে লাঠি চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে সামনের দিকে। সামনে চড়াই।

দক্ষিণ ভারতের সেই তরুণীটি আসছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দেহে মুখে ক্লান্তির ছাপ, চড়াই উঠতে কষ্ট পাচ্ছে, তবু উঠছে।

—জয় কেদার।

জয় কেদার, বলে তরুণী দাঁড়ালো আমার মুখের দিকে চেয়ে। তার পর বার কয়েক সজোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে—বসে পড়েছেন কেন, চলুন। ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেবেন না, পেয়ে বসবে। আমার পায়ে চোট লেগেছে, হাঁটুতে যন্ত্রণা হচ্ছে তবু বসিনি। কষ্ট হচ্ছে হোক, তাই বলে চলার আনন্দটা নষ্ট করবো কেন।

—এ পথ কেমন লাগছে বলুন? বলে উঠে দাঁড়াই।

—চমৎকার। অদ্ভুত চমৎকার। না জানি আরো কতো বৈচিত্র্য আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

—সত্যি, আমিও তাই মনে করছি। না জানি আরো কি দেখবো।—কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করি,—আপনার পায়ে চোট লাগলো কি করে?

—কাল রাতে চটির দোতলায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। তবে এমন কিছু লাগেনি, শীতের দেশে বলে একটু ব্যথাবোধ হচ্ছে।

তরুণীকে বেশ সপ্রতিভ বলে মনে হয়। চলা-বলায় ভংগীও স্বচ্ছন্দ।

হিমালয়ের তীর্থ প্রসংগে ওর কথা হলো, এমনটি আর ভূভারতে নেই। হিমালয় শুধু বিরাট নয়, মহৎ। যার মহত্ত্বের কাছে আর কিছু স্থান পায় না। ওর মনের বাসনা, এখানে কোথাও নির্জন পাহাড়ের কোলে জীবন কাটায়। আর কিছু না হোক, হয়তো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাতে পূর্ণ হবে।

—যা ভাবছেন তা কোনদিন আমার আপনার জীবনে সম্ভব হবে না। বলে তরুণীর মুখের দিকে ফিরে চাই।

—কেন হবে না। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে তরুণী বলে—তার জন্যে মনের পূর্ণ প্রস্তুতি চাই।

—কিন্তু কেন আপনি এখানে থাকবেন, কী প্রয়োজন ? বাড়ী-ঘর, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ—এসবের বাইরে এসে এখানে কী পাবেন, যা নিয়ে দিন কাটাবেন ?

—না হয় কিছু না-ই পাবো। তাতে পাওয়ার ইচ্ছেটা তো যাবে।

—ঠিক বলেছেন। প্রসাদদা এতোক্ষণে কথা বললে,—পাওয়ার ইচ্ছেটা যদি না থাকে, তবে তো নিজেকে নিয়ে আর কোন দুঃখই থাকে না। আপনি ঠিক বলেছেন। অনেক কিছু পেতে চাই বলেই তো আমাদের জীবনে এতো বিড়ম্বনা।

চলতি পথে নানা কথার মধ্যে এক সময় তরুণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। ও অসংকোচে বলে যায় ওর কথা। নাম শুভলক্ষ্মী পিল্লাই। কেরালার রাজধানী ত্রিবেন্দ্রামের কাছে বাড়ী। বাবা-মা আছেন। এ ছাড়া দুই বোন আর একভাই। কেরালায় বাড়ী হলেও ওর শৈশব কেটেছে বোম্বাই-এ। তারপর দিল্লীতে। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে ওর বাবা দেশে ফিরে যান। দিল্লীতে থাকতে এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী—অধ্যাপক মুখার্জির সংস্পর্শে আসে শুভলক্ষ্মী। অধ্যাপক মুখার্জির সংস্পর্শে এসেই ও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়ে পড়ে। তারপর ওর মনে জাগে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনে শিক্ষা লাভের বাসনা। ওর বাবাও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী। আপত্তি করেন নি মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তারপর শান্তিনিকেতনে এসে ভর্তি হয় শুভলক্ষ্মী। সেইখানেই বাঙলা ভাষা শেখে। রবীন্দ্রসংগীতেও ওর দখল আছে। ওর ধারণা রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় তাঁর গানে। একটি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলসুর যেমন সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, দশটি নাটক, কি দশটি গল্পে তেমন পাওয়া যায় না। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শেষ করে ও দেশে ফিরেছে। এখন ও ত্রিবেন্দ্রামের একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

সব কথা ও বলে গেল ইংরেজীতে। শেষে পরিষ্কার বাংলায় বললে,—এবারে আপনাদের কথা বলুন।

এতো সময় লক্ষ্য করিনি কখন এগিয়ে গেছে প্রসাদদা। উচ্চকণ্ঠে ডাকি প্রসাদদার নাম ধরে। শুনতে পাই প্রসাদদার কথা। চীৎকার করে বলছে—তোমরা এসো, আমি ততোক্ষণে এগোচ্ছি।

কখনো কথা বলতে বলতে, কখনো নীরবে পথ হেঁটে চলেছি। এরমধ্যে আমার কথাও ওকে বলেছি।

কিছু পথ এসেই শাকম্বরী দেবীর মন্দির। একটু ঘুরে ওপরে উঠলে তবে মন্দিরে পৌছনো যায়। শুভলক্ষ্মী একা গেল মন্দিরে, আমি পথের ধারে বসে রইলাম তার ফিরে আসার অপেক্ষায়।

—তুমি কেমন লোক হে শ্রীমন্ত? দেখি চড়াই ঠেলে উঠছেন মাষ্টার মশায়। পেছনে পূরবী আর সীমা। কাছে এসে বললেন,—আসবার সময় একবার ডাকবে তো। তারপর, কতোক্ষণ এলে? প্রসাদ কই?

—এই আসছি। প্রসাদদা এগিয়ে গেছে। বলে জিজ্ঞাসা করি,—শাকম্বরী দেবীর মন্দিরে যাবেন না?

—যাবো বৈকি। তুমি যাবে না?

—না। বলে পূরবীকে জিজ্ঞাসা করি,—রাঙাদি কেমন আছো?

—আপনিও কী রাঙাদি বলে ডাকবেন? বলে সীমা সশব্দে হেসে উঠলো—রাঙাদি।

—আমি তোমার রাঙাদি হতে যাবো কোন দুঃখে? না, ও নামে আমাকে ডেকো না। কৃত্রিম অভিমানে মুখ ফেরালো পূরবী।

মাষ্টার মশায় একাই গেলেন মন্দিরে। সীমা আর পূরবী দাঁড়িয়ে রইলো এখানে, পথের ধারে।

মিনিট পাঁচ সাত বাদেই শুভলক্ষ্মী ফিরে এলো। এসেই বললো—চলুন শ্রীমন্তজী।

—দাঁড়ান, এদের সংগে আলাপ করিয়ে দিই। সংক্ষেপে পরিচয়ের পালা শেষ করে বললাম,—একটু অপেক্ষা করুন, মাষ্টারমশায় গেছেন মন্দিরে। তিনি আসুন, দেখবেন কী সুন্দর মানুষ তিনি। আলাপ করে আনন্দ পাবেন। তারপর একসংগেই যাবো।

মাষ্টারমশায় এলেন দেবীর প্রসাদ হাতে। প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন প্রসাদ কণিকা।

আমাকে কিছু বলতে হলো না। উনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন শুভলক্ষ্মীর পরিচয়।

পরিষ্কার বাংলাতেই কথা বললো শুভলক্ষ্মী। আমি শুধু জানিয়ে দিলাম, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারে সে।

—তোমার গান কিন্তু আমাকে শোনাতে হবে মা। মাষ্টারমশায় বললেন।

—নিশ্চয়ই শোনবো। গান শুনিয়ে যদি আপনাকে আনন্দ দিতে পারি, সেতো আমার সৌভাগ্য।

মাষ্টারমশায় মৃদু হাসেন শুভলক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে, তারপর—চল, যেতে যেতে তোমার কথা শুনবো। বলে চলতে আরম্ভ করেন।

একটানা চড়াই পথ।

ত্রিযুগীনারায়ণ পর্যন্ত এমনই পথ। এই পথটুকু পার হওয়া দায়। প্রতিটি যাত্রী বারে বারে থমকে দাঁড়ায়, ফিরে চায় সামনে চড়াই পথের দিকে।

শুধু ফিরে চাওয়া আর গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করা—তারপর 'জয় কেদার' বলে আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতে হয়।

চলতি পথে পথ ছাড়া আর সব কিছুই যেন গৌণ হয়ে যায়। শাকম্বরী দেবীর মন্দিরের কাছ থেকে একই সঙ্গে চলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু চলতি পথে কখন যেন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

সামনে পেছনে পথ হারিয়ে গেছে বাঁকের আড়ালে। যে পথটুকু চোখের সামনে, সেখানে কোন পরিচিত মানুষকে দেখতে পাই না—তবু দাঁড়িয়ে থাকি অন্যের প্রতীক্ষায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সীমার দেখা পেলাম। মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে সীমা আসছে। একা।

কাছে এসে বসে পড়লো সীমা একটা পাথরখণ্ডের ওপর। বললে,—ত্রিযুগীনারায়ণ আর কত দূরে শ্রীমন্তজী।

—আর বেশী দূরে নয়। ওঠো, বসে থাকলে পা দুটো ভারি হয়ে যাবে। আর সবাই কোথায়?

—পেছনে আসছে।

—রাঙাদি ভালো আছে তো ?

—হাঁ, আপনার ওষুধে সত্যিই কাজ হয়েছে। আজ রাঙাদিকে দেখে কে বলবে কালরাতে সে মূর্ছা গিয়েছিল। আমি তো ভাবছি—আপনার কাছ থেকে একটু দাওয়াই চেয়ে নেব—

সীমা মুখ টিপে হাসলো আমার মুখের দিকে চেয়ে। তারপর লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো।

পাশাপাশি হেঁটে চলেছি দুজনে। সীমা আর আমি।

বাইরে থেকে সীমাকে যত চঞ্চল মনে হয়, আসলে তা নয়। ওর কয়েকটা কথাতেই তা বুঝতে পারি। এক সময় ও জিজ্ঞাসা করে,—আচ্ছা শ্রীমন্তজী, আপনি বলতে পারেন কেন মানুষ হিমালয়ের এই সব পথে এসে সব ভুলে যেতে চায় ?

—হঠাৎ একথা কেন সীমা ?

—মনে এলো, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। কদিন ধরে আমার মধ্যে এ-প্রশ্নটা বার বার এসেছে। রাঙাদিকে জিজ্ঞাসা করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু পারি নি।

—কেন ?

—রাঙাদিকে তো জানি, অনেক সময় সহজ কথার সহজ অর্থকেও সে দুর্বোধ্য করে তোলে।

রাঙাদির সম্পর্কে সীমা নিজে থেকে যা বলে, নয়তো কোন কৌতূহল করে ওকে বিব্রত করি না। তা ছাড়া প্রয়োজনই বা কী। এই তো দুদিনের পরিচয়, দুদিন পরে তো আর এ-পথের দিনগুলো থাকবে না—মিছে পরিচয়ের গোলকধাঁধায় জড়িয়ে লাভ কী ?

রাঙাদির প্রসংগ ছেড়ে সীমা অন্য কথা বলে। পথের কথা। কেমন লাগছে এই পথ—পথের মানুষ—সেই সব। কথার মধ্যেও সীমা মাঝে মাঝে দু হাতে লাঠি আঁকড়ে ধরে সামনের চড়াই পথের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বলে,—আর যে পারি না—কতক্ষণে শেষ হবে এ চড়াই।

—আর শেষ হয়ে এসেছে পথ।

—শেষের কথা কী বলছেন, আজই তো শেষ নয়। ত্রিযুগী-নারায়ণ পৌঁছে দু-দণ্ডের জন্যে নিশ্চিন্তি—তারপর আবার তো হাঁটতে হবে। সীমা আবার চলতে আরম্ভ করে বলে,—কষ্ট হচ্ছে সত্যি কথা—কিন্তু এ-পথ সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

—ঠিক বলেছো ? এ-পথ যে আনন্দের পথ। এ পথের সর্বত্রই জড়িয়ে আছে আনন্দ—যতো পারো লুটে নাও—

—সত্যি ! বলে সীমা দূর পাহাড়ের দিকে ফিরে চায়।—কী সুন্দর ! সুন্দরকে কাছে পেয়েছি—এই আনন্দ। কিন্তু কী জানেন, পথের যা কিছু আনন্দ সবই রেখে যেতে হবে পথে।

সীমার কথায় মুগ্ধ হয়ে যাই। এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারে ও। নতুন করে দেখবো বলে ফিরে চাই সীমার মুখের দিকে।

সীমার দৃষ্টি সামনে চড়াই পথের দিকে। সত্যি, সামনে অপেক্ষা করছে উত্তুঙ্গ চড়াই পথ। যে পথে লাঠি ভর করে কায়ক্লেশে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর মিছিল।

চড়াই পথের দিকে দৃষ্টি রেখে সীমা বলে,—দেখছেন—ওই পথ পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে।

—নিশ্চয় যাবো। এবারে আর কোন কথা নয় সীমা—চলো, কে কত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে, দেখি।

পাশাপাশি পথ চলি দুজনে ! কারো মুখে কোন কথা নেই—সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে শুধু পায়ে পায়ে চড়াই পথ অতিক্রম করা।

চড়াই পথ শেষ হলো। এতোক্ষণে দৃষ্টিগোচর হলো ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির চূড়া। একটি লাল নিশান পত্ পত্ করে উড়ছে মন্দির শীর্ষে।

কেদার ক্ষেত্রের অন্তর্গত এই তীর্থ—গৌরী শংকরের মিলন স্থান। তিন যুগ ধরে এখানে হোমানল প্রজ্বলিত রয়েছে। যে হোমানলে তীর্থ-পথিকের দল কাষ্ঠখণ্ড প্রদান করে অক্ষয় পুণ্যের প্রত্যাশায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রাচীন মন্দির এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। মন্দির প্রাংগণে রয়েছে পাঁচটি কুণ্ড। সরস্বতী কুণ্ডের ধারাটি ত্রিযুগীনারায়ণের নাভিকমল হতে নিঃসৃত। পাঁচটি কুণ্ডের মধ্যে তিনটি কুণ্ডে স্নানের বিধি আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের জল হরিদ্রাবর্ণ। এই কুণ্ডে নাকি মাঝে মাঝে ছোট ছোট সাপ দেখা যায়। পাপী মনে ভীতি সঞ্চারের জন্যে এই সব সাপ। কেদার নাথের পথে ত্রিযুগীনারায়ণকে দর্শন করে অগ্রসর হওয়া বিধি। যে পর্বতের ওপর ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির, সে পর্বত, যজ্ঞ পর্বত নামে অভিহিত। ত্রিবিক্রম নদীর পশ্চিমে এই পবিত্র তীর্থভূমি ত্রিযুগীনারায়ণ।

মন্দির প্রাংগণে পুণ্যার্থী নর-নারীর ভিড়। স্নান করছে কেউ; কেউ কুণ্ডের কিনারায় বসে নারায়ণ মন্ত্র জপ করছে। পাণ্ডা ও পুজারী ব্রাহ্মণের দল তীর্থ মাহাত্ম্য শোনাচ্ছে যাত্রীদের। ত্রিযুগধুনিতে কাষ্ঠখণ্ড প্রদান করে আগুনের তাপ গ্রহণ করছে যাত্রীদল। তারপর ললাটে ভস্মতিলক এঁকে ফিরে যাচ্ছে।

প্রসাদদা যথার্থ ভক্ত জন। স্নান-পূজা শেষ করে মন্দির চত্বরে বসে নারায়ণ মন্ত্র জপ করছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, এক মনে জপ করে চলেছে।

আরও কত নর-নারী, তাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের পাথরে মাথা কুটছে। ভিড়ের মধ্যে শুভলক্ষ্মীকে দেখলাম। সেও সাষ্টাংগে প্রণাম করছে লক্ষ্মী-নারায়ণকে।

সময় সংক্ষিপ্ত। বেলা বারোটার মধ্যে রওনা হতে হবে। নয়তো গৌরীকুণ্ডে পৌছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। এরই মধ্যে কয়েকটি দল ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে যাত্রা সুরু করেছে।

বারোটা দূরের কথা, তাড়াতাড়ি করেও ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে রওনা হতে বেলা একটা বেজে গেল।

এবারের পথ, উৎরাই। যতোখানি উঠেছিলাম, আবার ততোখানি নেমে এলাম পাক দণ্ডী পথে।

সন্তর্পণে নামছে যাত্রীদল। একটু অসতর্ক হলে রক্ষে নেই! পা যদি সরে যায়, গড়িয়ে পড়তে হবে অতলে।

বার বার বলছি পূরবীকে—সাবধানে চলো। তবু শুনছে না পূরবী। মনের আনন্দে নামছে উৎরাই পথে।

—উঃ! পাথরের নুড়িতে পা হড়কে পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পূরবী। এগিয়ে যাই, তুলে ধরি দু' হাতে। হালকা শরীর ওর, পেঁজা তুলোর মতো।

—লাগে নি তো?

—একটু লেগেছে বৈকি। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে পূরবী বললে,—হাঁটু জ্বালা করছে।

শাড়ীতে রক্তের দাগ। শাড়ী তুলে ধরে পূরবী। সত্যি, দু' পায়ের হাঁটু বেশ জখম হয়েছে। ডান পায়ের হাঁটুতে দস্তুর মতো রক্ত ঝরছে।

ওষুধপত্তর আমার সংগেই থাকে। যতো অসুবিধে হোক, ওষুধের ঝোলাটি কাছ ছাড়া করি না। আয়োডিন তুলো প্রভৃতি বার করে পূরবীর দু' হাঁটুতে

ব্যাণ্ডেজ করে দিই। পূরবী অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,—আমি চলতে পারবো তো শ্রীমন্ত?

—পারবে। আমি তো সংগে আছি, ভয় কী!

—সামান্ত দুর্ঘটনা, পূরবী কয়েক ধাপ এগিয়ে বলে,—ঘটলো বলেই আমরা দু'জন, দু'জনকে আরো কাছে পেলাম, না?

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বললাম, হয়তো তাই।

পূরবীকে নিয়ে সন্তর্পণে নামছি উৎরাই পথে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে পূরবী। কখনো বা আমার হাত ধরে নামছে!

আগে চলে গেছে আমাদের দল। যতদূর দৃষ্টি যায়, খুঁজে দেখি। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো আমাদের দল এতোক্ষণে শোন প্রয়াগে পৌঁছে বিশ্রাম নিচ্ছে।

নেমে এসেছি যক্ষ পর্বতের পাদদেশে। মন্দাকিনীকে দেখতে পাচ্ছি না, তার কলোচ্ছ্বাস শুনছি।

—ওই ছাখো, দেখেছো। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পূরবী আঙুলের নিশানায় দেখালো শোনপ্রয়াগ—বাসুকী-মন্দাকিনী সংগম।

সংগমের কাছে পৌঁছেচি। মন্দাকিনীর জলধারার সঙ্গে মিশেছে বাসুকী। মন্দাকিনীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাসুকীর উন্মাদ জলধারা চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে। পাহাড়ের কোন অন্ধ গহ্বর থেকে বাসুকীর ধারা নেমে আসছে, হয়তো কেউ জানে না তার ঠিকানা।

সংগমক্ষেত্রে ক্ষণিকের জন্তে বিশ্রামের বাসনা জাগে। চারিদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্য, আর এই মন্দাকিনী-বাসুকী সংগম—শুধু দু'টি চোখ নয়, মনও ভরে যায়।

সংগম ক্ষেত্রে মন্দাকিনীর ওপর ঝুলন্ত সেতু। নীচে কোনো সাধুর আশ্রম। আশ্রমের কোল ঘেঁষে মন্দাকিনীর প্রবহমান ধারা।

পূরবীকে নিয়ে নেমে আসি মন্দাকিনীর তটে, নিভৃত আশ্রমে। তৃতীয় কেউ নেই এখানে। শুধু আমরা দু'জন।

—কতোক্ষণ বসবে এখানে?—পূরবী জিজ্ঞাসা করে।

—যতোক্ষণ ভালো লাগে।

—ভালো লাগার কী শেষ আছে!

মন্দাকিনীর সেতু পার হয়ে তীর্থ-পথিকের দল চলেছে, নতুন চড়াই পথে।

চলমান মিছিলের দিকে লক্ষ্য রেখে পূরবী বলে,—চলো—এখানে নাই-বা বসলে আর। এ বেলা যে অনেকদূর যেতে হবে এখনও।

নতুন করে আবার চড়াই পথ আরম্ভ হলো।

এবারের পথ যেমন খাড়াই তেমনই সংকীর্ণ, অসমতল। তবে এ পাহাড় যারপরনাই মনোরম। পাহাড়ের গায়ে ঘন অরণ্য। ছায়া জড়ানো পথ। তীর্থ পথিকের দল চড়াই ঠেলে উঠছে, আর মুখে বলছে, জয় কেদার।

একটু আগেও আকাশ ছিল নীল। মেঘের রেখা মাত্র ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে ধেয়ে এলো ধূসর বর্ণের মেঘ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে মেঘ ছড়িয়ে পড়লো সারা আকাশে। পাহাড়ের পথে নামলো আবছা অন্ধকার।

কাছে কোথাও চটি নেই, নেই নিরাপদ আশ্রয়। যদি বৃষ্টি নামে, যদি ঝড় ওঠে—এই আশংকা সকলের মনে। হোক চড়াই, তবু পড়ি কি মরি, দ্রুত হেঁটে চলেছে যাত্রীদল। সব চেয়ে মুস্কিল পূরবীকে নিয়ে। জোরে হাঁটতে পারছে না, আহত পা নিয়ে। কিন্তু আকাশের যে রকম অবস্থা তাতে যে কোন মুহূর্তে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হতে পারে। কোন মতে মাইল খানেক পথ যেতে পারলে মুণ্ডকাটা গণেশে পৌঁছনো যাবে। সেখানে আর কিছু না হোক, হয়তো নিরাপদ আশ্রয় আছে, দু'দণ্ড অপেক্ষা করার মতো।

পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হচ্ছে। কোন মতে দুটি মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে।

একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে সুগভীর খাদ। এতো গভীর যে মন্দাকিনী স্পষ্ট দেখা যায় না। খাদের দিকে ফিরে তাকলে বুক ছাঁৎ করে উঠে, মাথা ঘুরে যায়।

পেছনে থেকে ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঘোড়া আসছে—পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হচ্ছে। খাদের দিকে দাঁড়ানো নিষেধ। কখনো মালবাহী ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদি চলেছে দল বেঁধে, তাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে।

—গৌরী কুণ্ডে পৌঁছতে পারবো তো শ্রীমন্ত? আমার কিন্তু ভয় করছে। পূরবী থমকে দাঁড়ায়। বলে,—হাঁটুর ব্যাণ্ডেজ খুলে যাচ্ছে। যাক গে।

—বেঁধে দিচ্ছি ঠিক করে।

—থাক, বার বার তুমি আমার পায়ে হাত দেবে কেন?

পূরবীর কথার উত্তর না দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পায়ের চিলে ব্যাণ্ডেজ আঁট করে বেঁধে দিই।

এ দিকে মেঘ জমাট বেঁধে এসেছে। এখন ভরা দুপুর, তবু কেমন যেন গা ছম ছম অন্ধকার নেমেছে বনভূমিতে।

শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। অস্পষ্ট গোঙানীর মতো। বুঝি ঝড় এলো। কাছে পিঠে কোন নিরাপদ আশ্রয় নেই যেখানো দাঁড়াবো। এবারে সত্যি ভয় পেয়েছে পূরবী, আহত হাঁটু নিয়ে দ্রুত হাঁটছে। শত অসুবিধে সত্বেও বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে। খাদের দিকে তাকাতে বারণ করছি, তবু মাঝে মাঝে খাদের দিকে ফিরে চাইছে ও।

সমনে পেছনে কোন যাত্রীকে দেখছি না। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। আমরা দুজন যেন পথ হারিয়ে নিরুদ্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌঁচেছি। যে দিকে তাকাই, শুধু পাহাড় আর পাহাড়, বন আর বন।

অকস্মাৎ বনভূমি আন্দোলিত হলো। ঝড় এলো। শুকনো পাতা ঝড়ে পড়লো ঝর ঝর করে, ধুলো উড়লো।

—হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। এক বৃদ্ধাকে নিয়ে চার জন ডাণ্ডিওয়ালা চড়াই পথে উঠে আসছে হন্ হন্ করে। খাদের দিকে দাঁড়াতে গেল পূরবী, টেনে ধরি তার শাড়ীর আঁচল।—করছো কী, এদিকে এসো। ঠিক এই সময় একদল ডাণ্ডিওয়ালা চলে গেল আমাদের পেছনে রেখে।

পথের পাশে প্রকাণ্ড এক পাথর। তার নীচে একটি গহ্বর। গুহার মতো। ভিতরে একরাশ আধপোড়া কাঠ, ছাই আর আবর্জনা। কোন সন্ন্যাসী হয়তো এখানে আগুন জ্বালিয়েছিল, না হয় পাহাড়ীরা গরু, ঘোড়া, ছাগলের পিঠে কেদারের পথে মাল নিয়ে যেতে এখানে রাত কাটিয়েছিল।

গুহায় বসেছি শুকনো পাতা বিছিয়ে। এই ঝড়ের মধ্যে পথ চলা দায়। পূরবীর চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। অথচ কিছু বলতে পারছে না। কী বলবে! যাকে বলার, তার মনেও তো চিন্তা।

দুরন্ত ঝড়ের সংগে নামলো বৃষ্টি। ঝড়োবাতাসে উড়ছে শুকনো লতা-পাতা। গুহার ভিতর থেকে দেখছি অদূরের পাহাড়টাকে। মেঘ জমেছে পাহাড়ের মাথায়। ধূসর রঙের মেঘ। পাহাড়ের গায়ে অরণ্য আন্দোলিত হচ্ছে দুরন্ত ঝড়ের বেগে।

বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। সেই সংগে বৃষ্টির ঝাপটা এসে ঢুকছে গুহায়

ভিতরে। জামাকাপড় বুঝি ভিজে যায়। পাহাড়ের রাজ্যে আবহাওয়ার মতিগতি ঠিক থাকে না একথা জানা সত্ত্বেও ছাতা বা বর্ষাতি সংগে রাখিনি, লালসিং এর কাছে রয়েছে। তবে পূরবীর কাছে আছে তার প্লাষ্টিকের ওয়াটারপ্রুফ।

'জয় কেদারনাথকী জয়'। একদল যাত্রী ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে। পূরবী বললে,—আমরাও যাবো ওই সংগে। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক—বসে থাকবো না। বলে প্লাষ্টিকের ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়ে, ব্যাগ থেকে তোয়ালে বার করে মাথায় বাঁধলো। জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি কি করবে?

—যা হোক হবে, চলো।

পথ চলি। কী আশ্চর্য—দুর্যোগের মধ্যে পথ চলতে এক অদ্ভুত উন্মাদনা এলো মনে। আলোয়ান সঙ্গে ছিল, ওভারকোটের ওপর সেটি জড়িয়ে দিয়েছি। ঝোলা থেকে গামছা বার করে মাথায় বেঁধেছি। পূরবীর হাঁটুর ব্যথাও যেন কমে গেছে। সমান তালে পা ফেলে সে পথ হেঁটে চলেছে।

শুধু একদল নয়, আরো যাত্রী আসছে জল ঝড়ের মধ্যে। সকলের কণ্ঠেই কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি। তবে কণ্ঠস্বর তেমন উচ্চগ্রামে বাঁধা নয়। কয়েকজন বৃদ্ধা, তাঁরাও ভীত নন এই দুর্যোগে। পথের দেবতা তাঁদের অভয় দিয়েছেন।

যেতে যেতে পূরবী বললে,—এও একরকম আনন্দ, না?

—হাঁ। এই আনন্দের স্বাদই তো অমৃতের নামান্তর। আর এই আনন্দের নেশা সুরার চেয়ে তীব্র। একবার পেয়ে বসলে আর রক্ষে নেই।

—জগতে এতো আনন্দ আছে, মানুষ তবু দুঃখ পায় কেন?

—তুমি কী বলতে চাও, মানুষ এই পৃথিবীর দুঃখের অংশীদার হবে না। দুঃখ পেতেই হবে। চরম দুঃখের মূল্যেই তো আনন্দকে পাওয়া যায়। এই ঝড়, এই বৃষ্টি আর এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলছি বলেই তো পথ চলতে এতো আনন্দ আসছে। আনন্দের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে কেউতো পথে পথে ফেরি করে বেড়ায় না যে সামান্য দাম দিয়ে সহজে তা পাবে। আনন্দ সুলভ নয়, দুর্লভ।

দূরে আশ্রয় দেখা যাচ্ছে। কতকগুলি চালাঘর পাহাড়ের বুকে। ওই হয়তো মুণ্ডকাটা গণেশ। শনির কোপ দৃষ্টিতে যেখানে গণেশের দেহ থেকে মস্তক বিচ্যুত হয়েছিল। তাই জায়গাটির নাম মুণ্ডকাটা গণেশ।

ঝড়বৃষ্টি যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে যাত্রীদের। 'জয় কেদার, জয় কেদার'—বলতে বলতে যাত্রীদল চলেছে সংকীর্ণ পথ ধরে। একে বৃষ্টিতে ভিজে পিছল হয়েছে পথ, তার ওপর মাঝে মাঝে গাছের ডালপালা ভেঙে পথ প্রায় অবরুদ্ধ। একপাশে অতলস্পর্শ খাদ। খাদের দিকে ফিরে চাইতেই বুক দুরু দুরু করে ওঠে।

অবশেষে মুণ্ডকাটা গণেশে এসে পৌছলাম।

অতি সাধারণ চটি। গণেশের মন্দিরের আশেপাশে কয়েকটি ছোটছোট দোকান ছাড়া আর কিছু নেই। তার-ই মধ্যে ভিড় করেছে অগণিত নর-নারী। আগে আগে যারা পৌছেচে তারাই যা জায়গা পেয়েছে দাঁড়াবার-বসবার, এখন যারা এসে পৌছচ্ছে, তাদের দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া উপায় নেই।

প্রথমেই দেখা হলো প্রসাদদা আর মাষ্টারমশায়ের সংগে। একটি দোকানের বাইরের ছাউনীর নীচে বেঞ্চির ওপর বসে আছেন।

আমাদের দেখতে পেয়ে মাষ্টারমশায় স্ত্রীকে ডেকে বললেন—ওইতো ওরা পৌছেচে।

—কই! শান্তিলতা দোকানের ভিতরে ভিড়ের মধ্যে বসেছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে দেখে বলে উঠলেন,—আমার যা ভয় করছিল। তারপর শুনলাম, আসতে আসতে কার মাথায় পাথর খসে পড়েছে।

—পাথর আমার মাথায় পড়েনি, তবে আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। বলে পূরবী পায়ের কাপড় তুলে আহত হাঁটু দুটি দেখালো।—খুব রক্ষে এই সন্ন্যাসী ঠাকুর সংগে ছিল, নয়তো—

—খুব বেশী লাগেনি তো। শান্তিলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—কই দেখি?

—ব্যাণ্ডেজ নাই-বা খুললাম মা। তবে লেগেছিল খুব, পাথর তো তুলোর মতো নরম নয়। বলে, পূরবী কোনমতে ভিড় ঠেলে দোকানের মধ্যে ঢুকে যায়। শুনতে পাই, মাকে সে বলছে,—রাগ করোনি তো, আমি আচমকা পড়ে গিয়েছিলাম।

—পাগলী মেয়ে, রাগ করবো কেন? শান্তিলতা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,—রাগ করিনি, তবে চিন্তা হচ্ছিল। এ পথে তো বিপদ আসতে দেরী হয় না।

—ইস্, আপনি যে একেবারে ভিজে গেছেন। কাছেই কোথাও ছিল

শুভলক্ষ্মী, কাছে এসে গায়ের আলোয়ান আর ওভার কোটে হাত দিয়ে বললে, —শিগগির এগুলো বদলে ফেলুন, দাঁড়িয়ে কাঁপছেন—অথচ হুঁশ নেই।

অন্য একটি দোকানে ছিল লালসিং। আমাকে দেখে সেও মালপত্তর নিয়ে এ-দোকানে এলো। বার করে দিলে শুকনো পোষাক। ভিজে পোষাক একটা আলাদা পুঁটলি করে রাখলো।

সুস্থ হয়ে বসেছি কোন মতে। শুভলক্ষ্মী আমার পাশেই। বলছে,—এধরনের গোঁয়ার্তুমি যেন না করি। এই ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে ভেজা মোটেই উচিত নয়। সর্দি লেগে বেয়াড়া কিছু হতে পারে।

—জয় কেদার, জয় কেদার। ক্র্যাচে ভর দিয়ে আসছে তুলসীদাস। সর্বাংগ ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। সংগে না আছে ছাতা, না আছে বর্ষাতি। কম্বল গায়ে জড়িয়ে এক অদ্ভুত কায়দায় কোমরের সংগে গামছা দিয়ে বেঁধেছে। ভিজে গেছে সে কম্বল। পিঠের সংগে বাঁধা একটি ঝোলা, সেটিও সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে তুলসীদাস। 'জয় কেদার, জয় কেদার' মুখে বলছে, আর করুন দৃষ্টিতে দেখছে এদিক-ওদিক। যদি দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যায় কোথাও।

তুলসীদাসের নাম ধরে ডাকি। ফিরে চায়। আমাকে দেখে ওর চোখে খুশীর চিহ্ন ফুটে ওঠে।

—ওকে এখানে ডাকছো কেন শ্রীমন্ত? শ্রীমতী রজনী রুক্ষ কণ্ঠে বলে ওঠেন,—ওকে কোথায় বসাবে এর মধ্যে?

উত্তর দিইনা শ্রীমতী রজনীর কথার। শুভলক্ষ্মী একটু চেপে বসলো, মাষ্টারমশায়ও আরো সংকুচিত হয়ে বসলেন। তুলসীদাস এসে দাঁড়াল দোকানের ছাউনীর নীচে। হাত-পা ওর চুপসে গেছে জলে ভিজে, গায়ের কম্বল, জামা খুলতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। গেঞ্জিটাও শুকনো নেই। পিঠের ঝোলা খুললো, একটি ছেঁড়া কম্বল আর এক চিলতে কাপড়—তাও ভিজে গেছে। এখন উপায়? কী পরবে ও। করুণ দৃষ্টিতে ফিরে চায় এর-ওর মুখের দিকে।

ওর অসহায় মনের কথা প্রসাদদা বুঝতে পেরেছে। কিছু না বলতেই কুলি শের বাহাদুরকে ডেকে বাক্স থেকে বার করে দিলে একটি তুলট কম্বল, আর একটি খদ্দরের লুংগি। সে দুটি হাতে নিয়ে তুলসীদাস শিশুর মতো কেঁদে ওঠে প্রসাদদার হাঁটু জড়িয়ে। প্রসাদদার চোখেও জল। চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়লো জলের ধারা।

—তুমি কাঁদলে কেন প্রসাদদা? জিজ্ঞাসা করি।

—ওর কান্না দেখে। বলে প্রসাদদা চোখের জল মোছে।

বৃষ্টির বেগ কমে এলো এতোক্ষণে। আকাশও অনেক পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু ঝড়ের বিরাম নেই। হয়তো আরো কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হবে।

কিন্তু সেটুকু অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য কারো নেই। বেলা চারটে বাজে। এখনি রওনা না হলে সন্ধ্যের মধ্যে গৌরীকুণ্ডে পৌছনো যাবে না।

দু একটি দল এর-ই মধ্যে 'জয় কেদার' বলে যাত্রা শুরু করেছে। রজনী বাবুর ইচ্ছে, আমরাও বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু মাষ্টারমশায় আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার পক্ষপাতী। আকাশ যে রকম পরিষ্কার হয়ে আসছে, হয়তো দশ-বিশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি একেবারে থেমে যাবে।

তবু অপেক্ষা করা হলো না। সামান্য বৃষ্টি পড়ছে, পড়ুক—তারই মধ্যে আরো যাত্রীর সংগে আমরাও পথ চলতে আরম্ভ করি।

পথে বেরিয়ে কেউ কারো নয়, যে যেমন পারে তেমন চলে। এ পথের রীতিই এই।

যে যেমন পারে তেমন চলছে। আমি ইচ্ছে করে সকলের পেছনে রয়েছি।

শুধু আমাদের দল নয়, আরো কতো দল আমাকে পেছনে রেখে চলে গেল। যাক।— আমিও যাবো। একটু আগে আর পিছে।

বৃষ্টি ঝরা যদিও বন্ধ হয়েছে, তবু আকাশে এখনো মেঘ। বাতাসের গতিবেগ কমেছে, তবে থামে নি। এখনো বাতাস বইছে। তবে সে তাণ্ডব আর নেই।

সূর্যের আলোয় দেখা পাহাড়, আর মেঘের অন্ধকারে দেখা পাহাড়—দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। যতদূর চোখ যায় তৃষিত নয়নে দেখি। যেন এক রূপকথার দেশ। যার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই।

দূরে—বহুদূরে তুষার মৌলী হিমালয়ের শিখর দেশ—কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হয়। অস্পষ্ট, তবু স্পষ্ট।

উৎরাই পথে নামছি। দূরের সে বরফাচ্ছাদিত শৃঙ্গ হারিয়ে গেছে সামনের পাহাড়ের আড়ালে, যে পাহাড়ের পথ ধরে আমাকে যেতে হবে।

এঁকেবেঁকে পথ নেমে গেছে পাহাড়ের গা-বেয়ে। সন্তর্পণে নামতে হচ্ছে লাঠি ঠুকে ঠুকে। একটু অসতর্ক হলে পা পিছলে পড়তে হবে। বৃষ্টিতে পথ হয়েছে পিছল।

কিছু পথ নেমে এসে দেখা হলো পূরবী আর শুভলক্ষ্মীর সংগে। পথের ধারে পাথরের ওপর বসে গল্প করছে দুজনে। আমাকে দেখে ওরা উঠে দাঁড়ালো।

—উঠলে যে? জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর দিলে পূরবী।—পা দুটোকে বিশ্রাম দিলাম। এবারে তুমি না হয় বোসো। আমরা চলি।

—যাও।

—আপনিও আসুন না আমাদের সংগে। শুভলক্ষ্মী বলে,—গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

—না, আমি খানিক বিশ্রাম নিই। আপনারা এগোন, পথে আবার দেখা হবে।

আবার ওদের সঙ্গে দেখা হলো পথে।

তখন সন্ধ্যে নেমেছে পাহাড়ের দেশে। থম্‌থমে অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়—পাহাড়তলী। জনবিরল পথ। সামনে পেছনে দ্বিতীয় কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করছে। ভয় পেয়েছি এমন নয়, তবু যেন অজানা শংকা আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

গৌরীকুণ্ড আর কতদূর? হয়তো কাছে, হয়তো এখনো অনেক দূরে। এইসব চিন্তা নিয়ে পথ চলছি, হঠাৎ চাপা হাসির শব্দে চমকে উঠি। পরক্ষণে চমক ভাঙে—একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছে শুভলক্ষ্মী আর পূরবী।

আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা উঠে দাঁড়ায়। কোন কথা বলার আগে শুভলক্ষ্মী বলে,—আর একটু আগে এলে এক বিচিত্র মানুষ দেখতে পেতেন। চলুন, যেতে যেতে সে মানুষের কথা বলছি।

জিজ্ঞাসা করি,—কে সে মানুষ?

—জানি না, চিনি না। কয়েক মিনিটের জন্যে তাঁকে দেখতে পেলাম, তারপর আচমকা কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

—কী দেখলেন?

—বলছি।

শুভলক্ষ্মী বলে যায় এক অলৌকিক কাহিনী।

একা আসছিল শুভলক্ষ্মী। সামনে পেছনে কাছাকাছি কেউ ছিল না। পূরবীও এসে পৌঁছয়নি তখন।

একটানা পথ হেঁটে তৃষ্ণা পেয়েছিল শুভলক্ষ্মীর। অন্যদিন জলপাত্র সঙ্গে থাকে। আজ ভুলে সে জলপাত্র কুলির কাছেই রেখেছে।

যাই হোক তৃষ্ণার্ত শুভলক্ষ্মী চলতিপথে ঝর্ণা দেখতে পায় একটা। এ-পথে তো ঝর্ণার অভাব নেই। এগিয়ে যায় ঝর্ণার দিকে। আঁজলা ভরে জল নিয়ে সবে পান করবে এমন সময় শুনতে পায় নিষেধ বাণী।—ও জল পান কোরো না।

সচকিত হয়ে ফিরে তাকায় শুভলক্ষ্মী। দেখতে পায় ছায়া-ছায়া দেহ নিয়ে একজন প্রৌঢ় মানুষ নেমে আসছে ঝর্ণার পাশ দিয়ে।

অপলক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে শুভলক্ষ্মী। মানুষটির পরনে সাধারণ শাদামাটা পোষাক। কিন্তু লক্ষ্য করেও তার স্পষ্ট অবয়ব দেখতে পায় না সে। যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। অথচ শুভলক্ষ্মী স্পষ্ট বুঝতে পারে এই মুহূর্তে যা সে প্রত্যক্ষ করছে, তা স্বপ্ন নয়। দিনের আলোর মত সত্য।

আশ্চর্য, লোকটি কাছে এলো অথচ তার অবয়ব তেমনি অস্পষ্ট হয়ে রইলো।

লোকটির হাতে লোটা, ইশারায় সে শুভলক্ষ্মীকে জলপান করতে বললে। মন্ত্রমুগ্ধের মত আঁজলা প্রসারিত করলো শুভলক্ষ্মী। লোকটি তাঁর লোটা থেকে জল ঢেলে দিল শুভলক্ষ্মীর হাতে। জলপান করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে যেই মাত্র মুখ তুলে তাকালো, দেখলো—কেউ নেই। আশপাশে জনপ্রাণীর কোন চিহ্নমাত্র নেই।

কী জানি কেন, সেই মুহূর্তে কেমন যেন রোমাঞ্চ জাগলো শুভলক্ষ্মীর দেহে-মনে। ফিরে তাকালো চারদিকে। সে মানুষের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। কিন্তু তার নিজের হাত দুটি তখনো ভিজে। পায়ের কাছে মাটিতে জলের চিহ্ন।

হঠাৎ সে সচকিত হয়ে উঠলো এক গাছের ডাল নড়ে ওঠার শব্দে। দেখতে পেল ঝর্ণার ওপরে একটা গাছের ডাল নড়ে উঠছে চোখের সামনে।

তারপর আর কিছু নয়। কিছু যাত্রী 'জয় কেদার' ধ্বনি তুলে চলে গেল পাশ কাটিয়ে। তার মধ্যে পূরবীও ছিল। পূরবী গেল না, শুভলক্ষ্মীকে দেখে সেও দাঁড়ালো।

এই ঘটনা ঘটেছে প্রায় আধ ঘণ্টা আগে। সেই থেকে শুভলক্ষ্মী আর পূরবী বসে আছে এখানে।

শুভলক্ষ্মী কথা শেষ করে জিজ্ঞাসা করে,—আপনি এ-ঘটনাকে কী বলবেন শ্রীমন্তজী?

বললাম,—কিছুই বলতে চাই না আমি। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না

এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে আমাদের পৃথিবীতে। তবে আপনি যে ঘটনার কথা বললেন, এমন ঘটনা আমিও প্রত্যক্ষ করেছি শুভলক্ষ্মী দেবী। যাক্, ওসব কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। এখন চলুন পথের দিকে নজর রেখে।

বাকী পথটুকু একসংগেই এলাম। বোধহয় আমরা তিনজনেই আজ সব শেষের পথিক। আমাদের পেছনে হয়তো আর কোনও যাত্রী নেই।

গৌরীকুণ্ডে পৌছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। লালসিং আগেভাগে পৌছে চটি ঠিক করে রেখেছে। আমার অপেক্ষায় ও দাঁড়িয়ে ছিল চটির দোতলার বারান্দায়। দেখতে পেয়ে নেমে এলো। এই চটির দোতলার ঘরে আমার আর প্রসাদদার রাতের আশ্রয়। আর বাবুরা, অর্থাৎ রজনী বাবুরা অন্য চটিতে উঠেছেন।

পূরবীকে দেখিয়ে বললাম,—তুমি এই দিদিমণিকে ওঁদের চটিতে পৌছে দিয়ে এসো লালসিং।

—তুমি যাবে না? পূরবী জিজ্ঞাসা করলো।

—না। তুমি যাও লালসিং-এর সঙ্গে। হয়তো তোমার জন্যে সবাই ভাবছেন।

পূরবী চলে গেল। যাওয়ার সময় নিষ্প্রভ দৃষ্টির ভাষায় ওর না-বলা কথা বলে গেল। সে-কথা নাই-বা বললাম। কিন্তু মুস্কিল হলো শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে। ওর দলের লোক কোন চটিতে উঠেছে, কে জানে! নিশ্চয়ই এখানে কোন-না-কোন চটিতে দেখা মিলবে। শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে গৌরীকুণ্ডের সব কটি চটি, দোকান, ডাকবাংলা খুঁজে এলাম। কোথাও পাওয়া গেল না ওদের দলের কোন একজনকেও।

এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করছি শুভলক্ষ্মীকে সংগে নিয়ে। হঠাৎ ডাক শুনতে পাই। শুভলক্ষ্মীর নাম ধরে একটি মেয়ে ডাকছে আমাদের চটি থেকে। নিজের মনে হেসে উঠি, আমাদের চটি না দেখেই এতো সময় মিছে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম।

চটির দোতলায় উঠেছি। একদিকে শুভলক্ষ্মীদের দল, অন্য দিকে আমি আর প্রসাদদা, এছাড়া আরো পাঁচ-ছজন মেয়ে পুরুষের আর একটি দল। এ ঘরে বাঙালী বলতে শুধু আমরা দু'জন। প্রসাদদা আর আমি।

প্রসাদদা জপে বসবার উদ্যোগ করছে। লালসিং ব্যস্ত উনুন জ্বালাতে। পাথরের টুকরো দিয়ে উনুন তৈরী করেছে। কিন্তু আধশুকনো কাঠ কিছুতেই

জ্বালাতে পারছে না! শুভলক্ষ্মীদের দলে চার পাঁচটি উনুন জ্বলছে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর। চোখ জ্বালা করছে, শ্বাস নিতেও অস্বস্তি।

—যাও, গরম জলে স্নান করে এসো। দেখবে কী আরাম। জপের আসনে বসে প্রসাদদা বললে,—একেবারে প্রেমসে স্নান করো। আমি তো আধঘণ্টা ধরে জলে পড়েছিলাম।

—যাবেন আপনি, আসুন না। শুভলক্ষ্মীকে বলি,—চলুন স্নান করে আসি।

—চলুন।

গৌরীকুণ্ডের আর একনাম গৌরীতীর্থ। এখানে গৌরী দেবীর প্রাচীন মন্দির আছে। দেবী পার্বতী এখানে ঋতুস্নান করেছিলেন। ধ্যানমগ্ন শিবের দেহ থেকে যে স্বেদ নির্গত হয়েছিল, সেই স্বেদবিন্দু থেকে এখানকার তপ্তকুণ্ডের উদ্ভব। শুধু তপ্তকুণ্ড নয়, এখানে একটি শীতল জলের কুণ্ডও আছে। উভয়কুণ্ডে সংকল্প করে স্নান করা গৌরীতীর্থের বিধি। গণেশের জন্মস্থান রূপেও এই তীর্থের প্রসিদ্ধি। শিব-গৌরী ও গণেশ ভক্তগণের কাছে গৌরীতীর্থ অতি প্রিয়।

গহ্বরের দুটি মুখ থেকে তপ্ত জলধারা অবিরাম ধারায় কুণ্ডের মধ্যে পড়ছে। অন্ত পথে এই তপ্তকুণ্ডের জলধারা মন্দাকিনীর জলধারার সংগে মিশছে। গৌরীতীর্থের কাছ দিয়েই মন্দাকিনী প্রবাহিত।

চারদিকে পাহাড় ঘেরা মন্দাকিনীর তটে মনোরম এই গৌরীতীর্থ। এখান থেকেই প্রচণ্ড শীতের আরম্ভ। মুণ্ডকাটা গণেশ পার হলেই শীতের প্রকোপ অনুভব করা যায়। তারপর আজ বৃষ্টি হয়েছে, শীতের কামড়টা তাই আরো বেশী বোধ হচ্ছে।

তপ্তকুণ্ডের কাছে এলাম। শুভলক্ষ্মী সংগেই আছে। একদল মেয়ে পুরুষ স্নান করছে কুণ্ডের জলে। কুণ্ডের ওপরে কিছু যাত্রী অপেক্ষা করছে। গৌরীতীর্থের পূজারী ব্রাহ্মণ একান্তে বসে, এক নাগাড়ে বলে চলেছে তীর্থ-মাহাত্ম্য। যাত্রীদের কাছে তার কিছু দক্ষিণা প্রাপ্তির আশা। লোভ নেই, যে যেমন দিচ্ছে, খুশী মনে গ্রহণ করছে।

শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে জলে নামি। প্রথমটা মনে হলো, পা বুঝি পুড়ে গেল। পরক্ষণে জলে ডুব দিয়ে উঠতে মনে হয় সর্বাংগের যন্ত্রণা, অবসাদ যেন ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

দুটি পিতলের সিংহ মুখে জলধারা অবিরাম ধারায় তীব্র বেগে নিঃসৃত হচ্ছে।

বিরাম নেই। কুণ্ডে সব সময়ের জন্তে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। গন্ধকের মৃদু গন্ধ তাতে।

একদল পাঞ্জাবী মেয়ে পুরুষ জলে নেমেছে, প্রায় নগ্ন দেহে। পরনে শুধু একটি করে জাঙিয়া। মেয়েদের কারো কারো বক্ষবাস পর্যন্ত নেই। অসংকোচে তারা স্নানের আনন্দ উপভোগ করছে।

—ভগবানের কী বিচিত্তির লীলা। কোন এক গ্রাম্য বাঙালী মহিলার কথা কানে এলো—ও চন্দনা তুই জলে নামবি নে?

—না মাসি, আমার ভয় করছে।

—মরণ, ভয় কী। এতো মানুষে জলে নেমেছে, তাদের গায় কি ফোস্কা পড়ছে। আয়, ডুবদে ত্থাখ, স্বস্তি পাবি।

—না বিন্তি মাসি, আমি চান করবো না।

—ওই ত্থাখ। পাঞ্জাবী মেয়েদের দিকে নজর রেখে বিন্তি মাসি বললে,—ওদের এতো আরাম বুকের বাস অব্দি খুলে ফেলেছে। আর তুই ছুঁড়ি—

—থাক মাসি, তুমি তাড়াতাড়ি উঠে এসো দিকি।

—উঠছি। আর গোটা কতক ডুব দেই। বলে বিন্তি টপ্‌টপ্‌ করে বেশ কয়েকটা ডুব দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর কোথাও কিছু নয়, আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলো,—তুমি তো সেই ছোকরা বাঙালী সাধু, পথে দেখিচি—তুমি এই মেয়ে মানুষের মধ্যে জলে নেমেছো কেন বাছা?

আচমকা এ ধরনের কথা শুনে একটু বিব্রত বোধ করি। তারপর ভাবলাম, হয়তো বিন্তি মাসি ভুল করেছে।

কিন্তু ভুল করে নি বিন্তি মাসি। পথেও লক্ষ্য করেছে আমার গেরুয়া বসনের দিকে। চিনে রেখেছে ও। আবার বললে,—এই বয়সে সাধু হয়েছো কেন? বে কারেছো—নাকি বেবাগী হয়ে বেরিয়েছো?

তবুও উত্তর দিলাম না বিন্তিমাসির কথার। কী উত্তর দেবো! কথায় কথা বাড়বে বৈ তো নয়। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে উঠে পড়াই ভালো।

স্নানান্তে চটিতে ফিরেছি। ফিরবার সময় পথে দেখা হয়েছে পুরবীর সংগে। ও দাঁড়িয়েছিল পথের ধারে। একটু আগে ও চটিতে গিয়েছিল, আমার দেখা পায়নি। প্রসাদদার কাছে শুনেছে আমি তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে

এসেছি শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে। কুণ্ডে না এসে ও পথের ধারে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। দেখা হতে বললে, ওর মা অর্থাৎ শান্তিলতা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন খাওয়ার জন্যে। 'তীর্থে এসে কারো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে নেই পূরবী,' শুধু এই কথা বলে চলে এসেছি। সেই থেকে মনটা খচ্ খচ্ করছে। হয়তো শান্তিলতা মনে মনে অপ্রসন্ন হবেন। মাষ্টারমশায়ও হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন।

—কী ভাবছেন? শুভলক্ষ্মী এলো কাপড়চোপড় বদলে। বললে,—চলুন, বেড়িয়ে আসি।

—আজ আর বেড়াতে ভালো লাগছে না। তাছাড়া এই রাতে কোথায়-বা যাবো।

—ঘরে না বসে বাইরে কোথাও গিয়ে দুদণ্ড বসা। আসুন।

—বলছেন যখন, চলুন। তবে দূরে যাবো না।

তপ্তকুণ্ডের কাছে কয়েকটি চা খাবারের দোকান। তারই মধ্যে একটি দোকানে বসি চা আর গরম পকৌড়ির ফরমাস দিয়ে।

দোকানের উজ্জ্বল আলো পড়েছে শুভলক্ষ্মীর মুখে। নতুন করে দেখি ওকে। সেদিন দেখেছিলাম, ছিল অচেনা। আজ ও আমার চেনা-জানা কাছের মানুষ।

চা-পানের পাট চুকলো। দাম দিলে শুভলক্ষ্মী। নিষেধ শুনলে না।

দোকানে বসে থাকতে তুলসীদাসকে দেখলাম। এই মাত্র পৌঁছেচে ও। রাতের আশ্রয় খুঁজছে।

তপ্তকুণ্ডের পাশেপাশে কিছু ঘরবাড়ী, চটি, দোকান-পসার। তারপর নির্জন এলাকা। শুভলক্ষ্মী টর্চ এনেছে। আলোয় পথ দেখে দেখে এসে বসি নির্জনে মন্দাকিনীর তীরে একটি শিলাখণ্ডের ওপর।

মেঘলা আকাশ। চাঁদ দেখা যায় না, তবু মেঘের বাধা পেরিয়ে তার আলোর আভা এসেছে পৃথিবীতে।

কাছেই মন্দাকিনী। দুপা নীচে নেমে হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যায়। অজস্র ছোটবড়ো পাথরের বাধা পেরিয়ে মন্দাকিনী ছুটেছে।

ওপারে পাহাড়, জংগলাকীর্ণ পাহাড়। দাঁড়িয়ে আছে ছায়া মূর্তি মতো!

আলোয়ান ঝেঁপে ঝুপে বসে আছি। শুভলক্ষ্মী বসেছে আমার পাশেই।

দুজনে শুধু নীরবে বসে থেকে মন্দাকিনীর কলগান শুনছি।

এক সময় শুভলক্ষ্মীর মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো রবীন্দ্রনাথের গান।—

"এলেম নতুন দেশে—

তলিয়ে গেল ভগ্নতরী, কূলে এলেম ভেসে।"

গান যদিও শেষ হলো, তবু সুরের রেশটুকু ফুরোলো না। মুগ্ধ কণ্ঠে বলি,—আজ তোমার কাছে নতুন কিছু পেলাম শুভলক্ষ্মী।

শুভলক্ষ্মী কথা না বলে মৃদু হাসে। বললাম,—হঠাৎ তুমি বলে সম্বোধন করেছি, কিছু মনে করোনি তো?

—না। বরং তুমি সম্বোধনটাই ভালো লাগলো শ্রীমন্ত। শুধু ওই সম্বোধনের ভাষা দিয়ে আমরা পরস্পরের অনেক কাছে এলাম। একটু থেমে শুভলক্ষ্মী বলে,—তুমি বললে, আমার কাছে আজ নতুন কিছু পেলে। কিন্তু নতুন কিছু তো দিতে পারিনি তোমাকে। যে গান অনেকবার গেয়েছি, অনেককে শুনিয়েছি সেই গানই তোমাকে শুনিয়েছি। তবে এমন করে, এমন পরিবেশে এ গান হয়তো কোনদিন গাইনি।

এককথা শেষ হয়, আর এককথা আসে। কথায় কথায় এক সময় জিজ্ঞাসা করি,—হঠাৎ তীর্থ করতে এসেছো কেন?

—ওটা একটা প্রশ্নই নয় শ্রীমন্ত। দুজনেই যখন একই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি, তখন ও প্রশ্ন অবান্তর।

—তবুও তো একটা উত্তর আছে। একই পথে দুজনে চলেছি, পথ পরিবেশ ভিন্ন নয়, তবু দুজনের দৃষ্টির তো পার্থক্য থাকতে পারে।

—সে পার্থক্য সর্বত্র। এই পৃথিবীতে মিলের চেয়ে অমিল বেশী। মিল খুঁজে পাবে না দুজন মানুষের মধ্যে। আবার একের মধ্যেও দ্বন্দ্ব। সুতরাং পার্থক্য থাকাটাই তো স্বাভাবিক। শুভলক্ষ্মী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—থাক্ ও সব তর্কের কথা।

কথা নেই কারো মুখে। দুজনে নীরবে বসে আছি শিলাখণ্ডের ওপর।

এতোক্ষণে আকাশের মেঘের জাল ছিঁড়ে গেছে। চাঁদ উঁকি দিয়েছে।

মন্দাকিনীর ওপারে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ। বৃষ্টি ভেজা অরণ্যে পড়েছে চাঁদের আলো। মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে অরণ্যের পত্র-পল্লব। মনে হয় যেন মুক্তাবিন্দুর জালে জড়িয়ে রয়েছে ওই পাহাড়।

—চলো আর নয়। শুভলক্ষ্মী বললে,—বোধহয় অনেক রাত হয়েছে।

—আর একটু বোসো।

—না। ভুলে যেও না, রাত ভোর হবার আগেই আবার পথ হাঁটতে হবে।

—তবে চলো।

রাত দশটা।

চটিতে ফিরে দেখা হলো আরও একটি নতুন দলের সংগে। তারা এইমাত্র এসে পৌঁছেচে। অন্য কোথাও জায়গা না পেয়ে কজন এই চটিতে উঠেছে, বাকী কিছু লোক একটি দোকানে আশ্রয় নিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন নর-নারী এই এক ঘরে। কোনমতে রাতটুকু কাটিয়ে দিনের আলো ফুটবার আগেই তো আবার যাত্রা শুরু হবে।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। শয্যাগ্রহণ করেছি ঘরের একান্তে। ঘুমিয়ে পড়েছি আজ সারাদিনের কথা ভাবতে ভাবতে।

শেষরাতে ঘুম ভাঙালো লালসিং-এর ডাকে। উঠে দেখি প্রসাদদা নেই। শুনলাম, স্নান করতে গেছে।

বাইরে এলাম। কনকনে ঠাণ্ডা। হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে।

চায়ের দোকান থেকে গরমজল নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে চা-পানের আশায় বসেছি দোকানের সামনে।

এখানেই দেখা হলো পুরবীর সঙ্গে। সে-ও চা পান করতে এসেছে। ডেকে জিজ্ঞাসা করি, পায়ের ব্যথা কমেছে কিনা। অথচ যখন হেঁটে চলে গেল, তখন সে রীতিমতো খুঁড়িয়ে চলেছে।

যাবার সময় হলো। কোন কোন দল ইতিমধ্যে যাত্রা শুরু করেছে। আমরাও তৈরী, শুধু চলার অপেক্ষা। লালসিং আর শের বাহাদুর আগেই রওনা হয়ে গেছে। ওরা অপেক্ষা করবে রামওয়াড়ায়।

সবে ভোর হচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। এখনো কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। তীর্থ-পথিকের দিন আরম্ভ কেদারনাথের নামে। 'জয় কেদার' ধ্বনিতে গৌরীতীর্থ মুখরিত। এক রাত্রির আশ্রয় ত্যাগ করে যাত্রীরা নেমেছে পথে। শূন্য চটি পড়ে রইলো, নতুন যাত্রীর অপেক্ষায়।

আজ যাত্রীদের মনে নতুন এক উদ্দীপনা। আজই দর্শন পাবে তাঁর—কেদারনাথের।

কতো আশা এই সব তীর্থ-পথিকের মনে। ঘরের বাইরে এসেছে এরা, চলেছে দুর্গম চড়াই উৎরাই পথ ধরে কেদারনাথকে দর্শন করে ধন্য হবে বলে।

এ পথে কতো কষ্ট, কতো বিপদ—তবু পরোয়া নেই। তীর্থ-পথিক পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছেই। অন্ধ, খঞ্জ, ভিখারী, বাউল, সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী বাউণ্ডুলে—সবাই চলেছে স্থির লক্ষ্যে। অলক্ষ্যে কোন্ এক যাদুকর যেন তাদের টেনে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু কেন এই চলার নেশা। কিসের আয়োজনে, কোন প্রয়োজনে? পুণ্যের লোভ, না স্বর্গের পাথেয় সংগ্রহের আশা। না আর কোন কামনার তাড়না রয়েছে।

পথ চলছি। পায়ে পায়ে যন্ত্রের মতো চলা। সামান্য পথ পেরিয়েই বরফ দেখলাম। পথের ওপর খানিকটা জায়গায় জমাট বাঁধা বরফ। তারই ওপর দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলেছে যাত্রীদল।

উত্তুঙ্গ চড়াই পথ। গতকালের বৃষ্টিভেজা পথে জায়গায় জায়গায় প্যাচপেচে কাদা। যে কোন মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে। তারপর পথ এখানে দারুণ সংকীর্ণ এবং অসমতল। কোথাও বা ঝর্ণার জল ঝরছে পথের ওপর। স্থানে স্থানে ধ্বস নেমে সংকীর্ণ পথ আরো সংকীর্ণ হয়েছে। সন্তর্পণে পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে পার হতে হয়। একটু অসতর্ক হলে রক্ষা নেই। গড়িয়ে পড়তে হবে গভীর খাদের মধ্যে।

কতো নর-নারী বিশ্রাম করছে পথের ধারে। কতো জন ক্লান্ত চরণ টেনে টেনে চলেছে লাঠিতে ভর দিয়ে।

আজকের পথ কোনমতে পার হওয়া দায়। এক বৃদ্ধ অবাঙালী দম্পতি পথের ধারে ধুলোর ওপর শুয়ে পড়েছে। যাকে দেখছে, জিজ্ঞাসা করছে, কেদারনাথে পৌঁছতে পারবে কিনা।

সামনেই চটি। চীরবাসা ভৈরব। অরণ্যময় তপোভূমি। চারদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানে ভৈরবকে বস্ত্রদান করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।

চীরবাসা ভৈরবে অগণিত যাত্রীর ভিড়। গৌরীকুণ্ড থেকে ভোরে রওনা হয়ে চড়াই উঠে এখানে সবাই বিশ্রাম করছে। এখানে দুতিনটি ছোটো খাটো চটি, কয়েকটি দোকান আর কিছু লোকজন। দোকানী হাঁকছে—শেঠজী গরম চায় পিও, গরম জিলাবী খাও, গরম দুধ পিও।

কদিন পর ঘিয়ে ভাজা গরম জিলিপির ঘোষণা শুনে দোকানে না বসে পারলাম না। সত্যি, জিলিপি নয়, যেন অমৃত।

যে যার বিশ্রামাদি শেষ করে চীরবাসা ভৈরব থেকে রওনা হচ্ছে রামওয়াড়ার পথে। রামওয়াড়া এখান থেকে আড়াই মাইল। পথে কোন চটি নেই। বেলা সাড়ে সাতটা বাজে। রামওয়াড়া পৌছতে অন্ততঃ নটা বাজবে। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার সেই পথ চলা।

চীরবাসা ভৈরবে নতুন এক বাঙালী দলের সংগে দেখা হলো। ভাটপাড়া আর রাজপুরের মিলিত দল। সাকুল্যে প্রায় পঞ্চাশজন মেয়ে-পুরুষ। অধ্যাপক বটুক ভট্টাচার্যকেও দেখলাম, স্ত্রী কন্যা নিয়ে চলেছেন কেদার-বদ্রী পরিক্রমায়।

চেনা-অচেনা অনেক মুখের দেখা পাই! শুধু দেখা হলো না মাষ্টারমশায় বা রজনীবাবুদের সংগে। হয়তো তাঁরা আরও এগিয়ে গেছেন।

—দাদা।

—কে! ফিরে চাই। পাশেই একটি দোকানে বসে কমলা ঘোষ ডাকছে।

—কিছু বলবেন?

—বলবো আর কী। আসুন, জিলিপি খান।

—না। এইমাত্র খেয়েছি।

—ও! জিলিপি খেতে খেতে কমলা বললে,—আপনি একেবারে একা পড়ে গেছেন দেখছি।

—আমি তো একাই এসেছি।

—এসেছেন, কিন্তু···। কথা শেষ না করে জিলিপি মুখে দিয়ে বিচিত্র ভংগীতে হাসলো কমলা।

কী জানি কেন, ভালো লাগলো না কমলার এই হাসি। একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,—একটা কথা জেনে রাখুন, আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের মুখই দেখা যায়।

—এই দেখুন, আপনি রাগ করছেন কেন? আমি তেমন কিছু বলতে চাইনি, যাতে আপনি রাগ করতে পারেন। আমি বলছি—আপনি একা এসেছেন, কিন্তু এখানে তো আপনি একা নন। তাছাড়া এতো একার পথ নয়। জিলিপির শেষ টুকরো মুখে দিয়ে কমলা বললে,—দেখুন দাদা, আপনি যেমন বললেন, তেমনি আমিও একটা কথা বলি। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের মুখ দেখা যায় সত্যি, কিন্তু আয়নার কাঁচ যদি খারাপ হয়—সুন্দর মুখও কুৎসিত দেখায়।

একদল আসছে কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে, একদল যাত্রা শুরু করছে এই নামের মন্ত্র উচ্চারণ করে। চটিগুলি এই জমজম করছে যাত্রীর ভিড়ে, পরক্ষণে শূন্য চটি খাঁ খাঁ করছে। চলার পথে একের সংগে অন্যের হয়তো দেখা হচ্ছে মুহূর্তের জন্যে। চেনা হোক, অচেনা হোক—'জয় কেদার' বলে পরস্পর প্রীতি বিনিময় করে আবার যে যার মতো পথ চলেছে।

এ পথে সব কিছু ঘটছে ক্ষণিকের জন্যে। তবু সেই ক্ষণিকের মুহূর্তগুলো অনাস্বাদিত। এই যাকে দেখছি, পরক্ষণে তাকে আর দেখছি না। এইমাত্র যে মুখ পরিচিত হয়ে উঠলো, পরমুহূর্তে সে মুখ হারিয়ে গেল অপরিচিতের ভীড়ে। যে ঝর্ণা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে এইমাত্র ভাবি—কী সুন্দর ঝর্ণা দেখলাম—আবার পর মুহূর্তে মন্দাকিনীর জলোচ্ছ্বাস দেখে ঝর্ণার কথা ভুলে যাই। হোক ক্ষণিকের, তবু এই মুহূর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে এক অখণ্ড সমন্বয়।

পিছনে পড়ে রইলো চীরবাসা ভৈরব। এগিয়ে চলেছি রামওয়াড়ার পথে। আজ যাত্রীদের কণ্ঠে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি। আনন্দের সীমা নেই। যাঁকে লক্ষ্য করে এই দুর্গম পথে আসা, আজ সবাই তাঁর কাছেই পৌঁছবো।

এবারে পথের ওপর মাঝে মাঝে বরফ জমে রয়েছে। সেই বরফের ওপর দিয়ে চলে গেছে পথরেখা। তারই ওপর দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর মিছিল।

কোথাও-বা ঝর্ণা জমাট বেঁধে আছে বরফে। মন্দাকিনীর বুকেও বরফ। ওপরে পুরু বরফের আস্তরণ, নীচে দিয়ে ছুটছে জলধারা। পাহাড় গুলোও এখানে কেমন যেন রুক্ষ। গাছপালা নেই বললেই চলে। শীতে বরফ গলে গেছে। এখন নতুন করে ওই গাছপালাগুলো প্রাণের তপস্যা করছে। মরা ঘাস রয়েছে পাহাড়ের অংগ জুড়ে। এখনো পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বরফ জমে আছে। কিছু লোককে দেখলাম, মাঝপথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘটনা এই, একজন বৃদ্ধের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে মন্দাকিনীর বুকে বরফের ওপর। দেখে মনে হয়, যেন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সত্যি ঘুমোচ্ছে। তবে ও ঘুম আর ভাঙবে না।

যেই হোক, ওই মৃত ব্যক্তি যে কেদার দর্শনে এসেছিল একথা নিশ্চিত। কে জানে, ওর দেব দর্শন হয়েছে কিনা! সে যাই হোক, ওর আত্মা শান্তি-লাভ করবে। হিমালয়ের কোলে, মন্দাকিনীর বুকে সে স্থান পেয়েছে। সেই-তো তার স্বর্গ।

রামওয়াড়া পৌঁছুতে বেলা দশটা বাজলো।

চটিতে জায়গা না পেয়ে লালসিং বাইরে মরা ঘাসের ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে জায়গা দখল করে রেখেছে। পাশেই তিনটুকরো পাথরে উনুন করে রান্না চাপিয়েছে। প্রসাদদার জিনিষপত্তরও এখানে। কিন্তু প্রসাদদাকে দেখলাম না। শুনলাম, স্নান করতে গেছে মন্দাকিনীতে।

রামওয়াড়ায় অনেকগুলি চটি। স্থানাভাব ঘটার কারণ, প্রত্যাবর্তন পথের প্রথম যাত্রীদল আজ সকালে কেদারনাথ থেকে এখানে এসে পৌঁছেচে। ইচ্ছে হয় যারা কেদার দর্শনান্তে ফিরে এলো, তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করি, কী দেখলেন? কেমন লাগলো? কিন্তু না—আজই তো পৌঁছবো লক্ষ্যে, নিজের চোখেই দেখবো।

—শ্রীমন্ত, শ্রীমন্ত। মাষ্টারমশায়ের ডাক শুনতে পেলাম। কাছেই একটি চটির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন মাষ্টার মশায়।

—যাই মাষ্টার মশায়।

—এসো।

পূরবী ছাড়া সকলকে দেখলাম। শ্রীমতী রজনী শুয়ে আছেন, সীমা থমথমে মুখে মায়ের পায়ের কাছে বসে। রান্না করছেন শান্তিলতা। রজনীবাবু ছুরি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছেন।

—কী ব্যাপার, কাল রাত থেকে যে দেখাই নেই তোমার। কোথায় লুকিয়েছিলে? মাষ্টারমশায় জিজ্ঞাসা করলেন।

—লুকিয়ে থাকতে চাইনি মাষ্টারমশায়।

—যাক্, চলো একটু চা-টা খাওয়া যাক্। বলে রজনীবাবুকে ডাকলেন মাষ্টারমশায়। কিন্তু রজনীবাবু এলেন না আলু কোটা বন্ধ রেখে।

চায়ের দোকানের সামনে কাঠের পাটাতনের ওপর মুখোমুখি বসে শুভলক্ষ্মী আর পূরবী গল্প করেছে, হাসছে। আমাকে দেখেও দেখলো না পূরবী। শুভলক্ষ্মীর সংগে কথায় মন দিল।

—পূরবী। ডেকেও সাড়া পেলাম না। গল্পে ওর এতো মন।

—মা-মণি, তোকে শ্রীমন্ত ডাকছে যে, শুনতে পাস্‌নি? মাষ্টারমশায় বললেন মেয়েকে।

—এতোক্ষণে ফিরে তাকালো পূরবী। বললে,—ডাকছো কেন, কিছু বলবে?

—না, এমনি ডাকছি। বলে জিজ্ঞাসা করি,—শুভলক্ষ্মীর সংগে এমন কী গল্প হচ্ছে, যে ডাকে সাড়া দিতেও ভুলে গেলে?

—ওরা গল্প করছে করুক, এসো আমরা চা খাই। মাষ্টারমশায় বললেন, —আর কিছু খাবে শ্রীমন্ত?

প্রসাদদা বরফগলা জলে স্নান করে কাঁপতে কাঁপতে এলো। গরম জামা কাপড় গায়ে দিয়ে, রোদে দাঁড়িয়েও কাঁপুনি গেল না।

মাষ্টারমশায় বললেন, এই ঠাণ্ডায় স্নান না করাই উচিত ছিল প্রসাদের। তার ওপর বরফ গলা জল। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ বিসুখ করতে পারে। প্রসাদদার সেই এক কথা, আমার কিছুই হবে না।

লালসিং তাড়া দিয়ে গেল, আমরা যেন দেরী না করি। এ-বেলা যে পথ হাঁটতে হবে, সে পথ সহজ পথ নয়।

রামওয়াড়া থেকে কেদারের দূরত্ব চার মাইল। এই চার মাইল পথ অতিক্রম করা যে কী কষ্ট, তা কেদারনাথই জানেন। তারপর আরো বললে লালসিং, এখানকার আবহাওয়াও অনিশ্চিত। যদি তুষার পাত, কিংবা তুষার ঝঞ্ঝা শুরু হয়, তাহলে প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। এ পথের অভিজ্ঞতা তার আছে। এই বয়সে ও পঁচিশ তিরিশ বার যাতায়াত করেছে এইপথে, তাতে বেশ কয়েকবার বিরূপ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে ওকে। একবার রামওয়াড়া থেকে যাত্রা শুরু করে আধাআধি পথ গিয়ে আবার রামওয়াড়ায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

শুধু লালসিং নয়, আরো কয়েকজন সেই কথাই বললে। এখানে যেন অনর্থক সময় নষ্ট না করি। অধিকাংশ দলই যাত্রার আয়োজন করছে। কোন কোন দল এখানে সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়ে, দোকান থেকে পুরি তরকারী খেয়ে ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে। ভাটপাড়ার অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দলটি আমাদের পরে এসেও রামওয়াড়া ছেড়ে চলে গেছেন।

তাড়াতাড়ি করেও রামওয়াড়া থেকে বেরোতে সাড়ে বারটা বেজে গেল। এবারে সবাই একসংগে চলেছি। প্রসাদদা সকলের আগে। লাঠি ঠুকে ঠুকে চড়াই উঠছে। আর এক মনে গেয়ে চলেছে বাউল গানের কলি,

'এ মায়া সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে,
আমি পড়েছি এই মায়াচক্রে চক্রব্যূহতে॥'

সামনে পেছনে যেদিকে চাই, চলেছে নর-নারীর মিছিল। সারাটি পথ

মুখর 'জয় কেদারনাথ কী জয়' ধ্বনিতে। একক কণ্ঠে নয়, বহু দলে বহু কণ্ঠে উঠছে জয়ধ্বনি। ওই নামের মধ্যে না জানি কী শক্তি আছে, যে নাম সম্বল করে হাজার হাজার মানুষ চলেছে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে।

পিছন দিকে ফিরে চাই। রামওয়াড়া দেখা যাচ্ছে। কতটুকু পথই বা এসেছি, বড়ো জোর দু ফার্লং হবে। এর মধ্যে কতো বদলে গেছে পথের চেহারা। পাহাড়গুলো যেমন রুক্ষ, তেমন খাড়াই। গাছপালা দূরে থাক, সবুজ ঘাসেরও চিহ্ন নেই বললেই চলে। পথও তেমন সংকীর্ণ। আগাগোড়া নুড়ি পাথরে ঢাকা। তারপর অনবরত বরফ পার হতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝর্ণা। বরফগলা জল চুঁইয়ে পড়ছে পথের ওপর। একে নুড়ি পাথরে পা হড়কে যাবার ভয়, তার ওপর বরফগলা জল পড়ে আরো পিছল হয়েছে পথ।

সবাই এক রকম যাচ্ছে, কিন্তু সীমার জন্যে হয়েছে মুস্কিল। দশ পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। বলে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, গা বমি বমি করেছে। দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে আবার খানিক চলছে। বলছে, তার ভয় করছে। এতো ভয়, তবু খাদের দিকে ফিরে চাইছে বারবার।

খাদের দিকে তাকালে সুস্থ মানুষের মাথা ঘুরে যায়, আর সীমাকে তো আপাততঃ অসুস্থ বলা যায়। ওকে পিছনে ফেলে রাখা ঠিক নয়। ও আসুক, আমি বরং ওর পাশে থাকি।

এক জায়গায় ধ্বস নেমে পথ ভেঙে গেছে। দেখে মনে হয়, সদ্য ভাঙা। হয়তো আজই ভেঙেছে। একে ধ্বস নেমেছে, তার ওপর পাথরের ভাঁজে ভাঁজে জল চুঁইয়ে পড়ছে। এক এক করে পাহাড় ধরে ধরে কোন মতে বিপদজনক পথটুকু পার হচ্ছে যাত্রীরা। কয়েকজন কুলিও সাহায্য করছে যাত্রীদের। পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে তারা হাত ধরে ধরে পার করে দিচ্ছে যাত্রীদের।

এখানে পৌঁছেই দেখা হলো আর সকলের সংগে। ঘোড়া থেকে নেমেছেন রজনীবাবু। ঘোড়ায় চেপে এই ঝর্ণা পার হওয়ায় বিপদের ঝুঁকি বেশী। শ্রীমতী রজনী ডাণ্ডি থেকে নামতে নারাজ। যা হয় হোক, তবু ডাণ্ডি চেপে পার হবেন। হলেনও তাই। ডাণ্ডিওয়ালারা কতো অনুনয় করলে, কিন্তু কানে নিলেন না। শের বাহাদুরের হাত ধরে শান্তিলতা এপারে এলেন। মাষ্টারমশায় আর লালসিংকে সামনে পেছনে রেখে পূরবীও কোন মতে পার হয়ে গেল। কিন্তু বিধি বাদ সাধলো সীমার বেলায়। শাড়ী পায়ে জড়িয়ে পড়ে গেল জল কাদায়

মধ্যে। রক্ষে পেছনে ছিল এক অবাঙালী জোয়ান, ঝাপটে ধরে ফেললো সীমার হাত—নয়তো কী বিপদ যে ঘটতো তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

সীমার হাতের কনুই-এ পাথর কুচি ফুটে গেছে। জুতো, মোজা, কাপড়ে জল কাদা মাখামাখি হয়ে গেছে। চোখের গগল্‌সটা পড়ে গেছে নীচে ঝর্ণার জলে। আহত কনুই চেপে ধরে কাঁদছে সীমা। কেদারনাথের নাম করে ডাণ্ডিতে কপাল ঠুকছেন শ্রীমতী রজনী। মেয়েকে পড়ে যেতে দেখে রজনীবাবু আচম্বিতে ঘোড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছেন খাদের দিকে। কী সর্বনাশ—প্রসাদদা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে রজনীবাবুকে।

সীমার কনুই-এ পাথরের কুচি ফুটে ছিল, টেনে বার করি। দরদর করে গড়িয়ে পড়ে রক্ত।. রক্তের ছিটে লাগে আমার আলোয়ানে। লাগুক। ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্তর বার করি। প্রাথমিক ভাবে যেটুকু করণীয়, সেইমতো ব্যবস্থা করি। সীমার কান্না কিছুতেই থামতে চায় না। ছেলে মানুষের মতো হাউ হাউ করে কাঁদছে, আর বলছে—কেদার দর্শনে সে যাবে না। ফিরে যাবে এখান থেকে।

সবচেয়ে মুস্কিল হলো সীমার জলকাদা মাখা জামা কাপড় নিয়ে। ওদের কুলিরা চলে গেছে এগিয়ে, জামা কাপড় সবই সেই সংগে।

মুস্কিল আসান হলো শুভলক্ষ্মী আসতে। ওদের কুলি সংগেই ছিল। স্যুটকেশ থেকে বার করে দিলে শুকনো সায়া, শাড়ী, ব্লাউজ। বাড়তি সোয়েটার ছিল একটা তাও দিলে। কিন্তু জুতো মোজার উপায় কী! এই পথ কী ভিজে জুতো মোজা পরে যাওয়া সম্ভব?

শ্রীমতী রজনী তখনো জুতো মোজা পরে শুধু ডাণ্ডির হাতলে কপাল কুটছেন, মেয়েকে যে জুতো মোজা খুলে দেবেন সে খেয়াল নেই। সে কথা আমাকেই বলতে হলো।

—সত্যি, তুমি কী রকম গো। রজনীবাবু তিরস্কার করলেন,—মেয়ের ওই অবস্থা, তবু চতুর্দোলায় বসে আছো মহারাণীর মতো। আশ্চর্য!

স্বামীর কথায় লজ্জিত হলেন শ্রীমতী রজনী। ডাণ্ডি থেকে নেমে জুতো মোজা খুলে দিয়ে মেয়ের কাছে এলেন। সস্নেহে মেয়েকে অনেক কিছু বুঝিয়ে আবার ডাণ্ডিতে চেপে বসলেন। তবু একবারও একথা জিজ্ঞাসা করলেন না মেয়েকে, সে হেঁটে যেতে পারবে কিনা।

'জয় কেদারনাথ কী জয়'। সীমাকে সাহস দিতে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠি, 'জয় কেদারনাথ কী জয়'। আশপাশে যারা ছিল সকলের কণ্ঠে জাগলো প্রতিধ্বনি। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হলো পথ চলা।

যতো এগিয়ে চলেছি, ততো দুর্গম মনে হচ্ছে পথ। সর্পিল গতিতে একটানা চড়াই পথ চলেছে পাহাড়ের গা-বেয়ে। পথের প্রচ্ছদপটও বদলে গেছে। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। গভীর খাদের নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। তুষারের আস্তরণের নীচে বয়ে যাচ্ছে মন্দাকিনীর জলধারা। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছুটে চলেছে সে—তার অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসছে।

ক্রমে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে যাত্রীদল। আগের মতো সে উচ্ছ্বাস আর কারো মনে নেই। কেউ আর উচ্চকণ্ঠে কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে না। শুধু পা ফেলছে, আর চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অস্ফুট কণ্ঠে বলছে, 'জয় কেদার, জয় কেদার'। কেউ বা চলতে না পেরে বসে পড়ছে পথের ধারে। কেদারের নাম নিয়ে আবার উঠে চলতে আরম্ভ করছে।

আর কতো দূর !

সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে ক্লান্ত-অবসন্ন যাত্রীদল কোন মতে এগিয়ে চলেছে। আর থেকে থেকে রুদ্ধ-বিস্ময়ে ফিরে চাইছে সামনের দিকে।

পথ যেন আর শেষ হয় না। তবু কলের পুতুলের মত যাত্রীদল এগিয়ে চলে এ-পথের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবে বলে।

কেদারনাথ আর কতদূর ? সকলের মনে একই জিজ্ঞাসা। কেউ মুখ ফুটে বলছে, কেউ বলছে না।

এই যেন শেষ পরীক্ষা। ক্লান্ত অবসন্ন যাত্রীদল, এক পা চলতেও তারা অসমর্থ, তবু পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই হবে। ভগবানের লীলা নিকেতনের ধূলি মাথায় তুলে নিতে হবে। নইলে যে সবই বৃথা।

'জয় কেদার, জয় কেদার'—এই নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে অভয় মন্ত্র। শুধু এই নামের শক্তিতেই এগিয়ে চলা। অস্ফুট কণ্ঠে ওই নামের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে কোন মতে অবসন্ন দেহটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নয়তো মন—সে তো আগেই ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কেদারনাথের পাদপদ্মে।

'জয় কেদার নাথ কী জয়, জয় কেদারনাথ কী জয়',—অকস্মাৎ তীর্থ-

পথিকের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো জয়ধ্বনি। দূরে কেদারনাথের শিখরদেশ দেখা গেছে তাই এ উল্লাস। গিরিগাত্রে প্রতিহত হল যাত্রীদের জয়ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো আবার যাত্রীদের কানে।

ওই তো কেদারনাথের তুষারাচ্ছাদিত শিখরদেশ। ওই তো নীলকণ্ঠ। দেবাদিদেবের লীলাভূমি। ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে তীর্থ-পথিকের চোখের সামনে প্রতিভাত! এক অলৌকিক মহিমায় ভাস্বর। মনে হয় যেন এক স্বপ্নলোক—যার ঠিকানা খুঁজতে দুর্গম পথ পার হয়ে এসেছে এই নর-নারীর মিছিল।

চলতে চলতে কখন থেমে পড়েছি জানি না, দুচোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে দেখছি হিমালয়কে। আমার দুচোখের তারায় বন্দী হয়েছে ওই বিরাট হিমালয়ের প্রচ্ছদপট।

—শ্রীমন্ত! চমক ভাঙে শান্তিলতার কাতর কণ্ঠস্বরে।

পিছন ফিরে দেখি শান্তিলতা বসে পড়েছেন পথের ধারে। বমির বেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন, শ্বাস নিতে কষ্টবোধ হচ্ছে তাঁর।

যে মানুষ দুর্বল হওয়া দূরের কথা, একদিনের জন্যে যাকে ক্লান্ত হতে দেখিনি, —'আর পারছি না' বলে সেই প্রসাদদাও বসে পড়েছে পথের ধারে। বার কয়েক বুকভরা শ্বাস নিয়ে প্রসাদদা যেন একটু স্বস্তি পেল। জানাল. শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। তা ছাড় বুকটাও যেন কেমন হালকা হয়ে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে। বারবার একই আকুল প্রশ্ন তার মুখে—বাকি পথটুকু অতিক্রম করতে পারবো তো?

—'জয় কেদার, জয় কেদার'—দুটি ক্র্যাচে ভর দিয়ে আসছে তুলসীদাস। অবাক হয়ে দেখি, একটি মাত্র পা আর দুটি ক্র্যাচে দেহের ভার বয়েও দুটি চোখে কেমন আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি।

তুলসীদাস চলে গেল। প্রসাদদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চলো শ্রীমন্ত। বসে থাকলে তো চলবে না।

শান্তিলতাও লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়ালেন। 'জয় কেদার' বলে প্রসাদদাকে অনুসরণ করলেন তিনি।

সত্যি, এ পথে আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা যায় না। একটু আগেও ছিল পরিষ্কার আকাশ, হঠাৎ কোথা থেকে ধোঁয়াটে কুয়াশা এসে জুটলো। দেখতে দেখতে সূর্য হারিয়ে গেল কুয়াশার আড়ালে। দূরে কেদারনাথের শিখরদেশ ও নীলকণ্ঠ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কে একজন কুলি পাশ কাটিয়ে যেতে

যেতে বলে গেল, হুঁশিয়ার, বরফ পড়বে এবারে। প্রতিটি যাত্রীর চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। না জানি, কেদারনাথের কী নতুন পরীক্ষা শুরু হলো।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? পূরবীর জিজ্ঞাসা শুনতে পেলাম,—সবাই যে এগিয়ে গেল।

—তুমি কোথায় ছিলে পূরবী, সীমা কই? সে যে আমার সঙ্গেই ছিল। বলে, সীমার নাম ধরে ডাকি উচ্চকণ্ঠে।

—আমি এগিয়ে এসেছি শ্রীমন্তদা। রাঙাদি কোথায়? দূর থেকে সীমার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—তোমার রাঙাদি আমার সঙ্গে আছে। চীৎকার করে বলি,—সাবধানে যেও। না হয়, একটু দাঁড়াও, আমরা আসছি।

ঝড় নয়, বৃষ্টি নয়—গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত আরম্ভ হলো। সারা আকাশ বেয়ে ঝরছে তুষার কণা।

দুচোখে বিস্ময় নিয়ে থমকে দাঁড়াই। অবাক হয়ে দেখি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

—যাবে না? পূরবী জিজ্ঞাসা করলে।

—যাবো। বলেও দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতো যাত্রী চলে গেল আমাদের পাশ কাটিয়ে, আমরা তবু দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি তুষারপাতের দৃশ্য।

মালবাহী ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে কজন গাড়োয়ালী পুরুষ। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা ভাঙা হিন্দীতে বলে গেল, এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট না করতে। এই তুষার পড়ছে, তারপর যদি ঝড় ওঠে রক্ষে নেই। বিপদ আসতে পারে যখন তখন।

বিপদ আসে আসুক। বিপদে কী ভয়!

—চলো শ্রীমন্ত, দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার ভয় করছে। বলে পূরবী আমার হাত ধরলে।

—ভয় কী পূরবী। বলে উচ্চকণ্ঠে কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে দ্রুত চলতে আরম্ভ করি।

তুষার পড়ছে পড়ুক, ঝড় ওঠে উঠুক—এগিয়ে চলবোই। দুঃখ, কষ্ট, বিপদ আছে জেনেই তো এ পথে এসেছি।

এগিয়ে চলেছি তো চলেছি। পাহাড়, পর্বত, পথ, প্রান্তর—সব শাদা হয়ে গেছে তুষারের আস্তরণে।

সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, যে দিকে তাকাই, শুধু দেখি তুষার ধবল রূপ।

এদিকে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অসাড়। লাঠি ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে। সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে যাবার উপক্রম। জ্বালা করছে পায়ের আঙুলগুলো। তার ওপর নতুন উপসর্গ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট।

কতো যাত্রীকে দেখছি, চলতে না-পেরে বসে পড়েছে উবু হয়ে। কতোজন দাঁড়িয়ে থেকে ভগবানের নাম করছে। কতো নর-নারী মাতালের মতো টলতে টলতে চলেছে।

এতো সময় পথে যা-ও-বা মাটি কিংবা পাথরের স্পর্শ ছিল, এখন বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। আগাগোড়া বরফে ঢাকা।

—পূরবী, ওই দ্যাখো। দূরে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলি,—দেখেছো—ওই বোধ হয় কেদারনাথের মন্দির।

—ও তোমার চোখের ভুল। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অপলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল দূরের দিকে লক্ষ্য রেখে পূরবী বলে উঠলো,—দেখেছি—খুব অস্পষ্ট। এখনো অনেক দূর।

আরো একবার জয়ধ্বনি দিই কেদারনাথের নামে। আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পূরবীও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে—'জয় কেদারনাথ কী জয়'।

অবিরাম তুষার পাতের মধ্যে তীর্থ-পথিকের মিছিল চলেছে বরফে ঢাকা প্রান্তরের পায়ে চলা পথরেখা ধরে। সকলের মুখে অস্ফুট বাণী—'জয় কেদার, জয় কেদার।' কতো কণ্ঠে প্রশ্ন আসছে,—কেদার আর কতো দূর?

দূরে নয়। কাছে। আর সামান্য পথ। এই সামান্য পথ পার হওয়া যে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে বরফ গলে গেছে, পা ফেলাই দায়। পূরবীর পা বরফের মধ্যে বসে গেছে দুবার। শেষটা হাত ধরে টেনে তুলতে হয়।

—শ্রীমন্ত, আমি যে চলতে পারছি না। পূরবী হতাশার সুরে বলে,—হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

—ভেঙে পড়ো না পূরবী। সাহস দিয়ে বলি—দেখবে, যতো কষ্ট হোক, ঠিকই পৌঁছেচি লক্ষ্যে।

—আমার যে বড্ড ভয় করছে। মৃদু আর্তনাদের স্বরে পূরবী বলে,—নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। বুকের মধ্যে কেমন যেন যন্ত্রণা হচ্ছে।

মনে পড়লো সে রাতের কথা। পূরবী মূর্ছা গিয়েছিল। আজ এই পথের মধ্যে যদি তেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে পূরবী। কেদারনাথের নামে অনুচ্চ কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে বলি,—তাঁর কথা স্মরণ করো—সব বিপদ, সব বাধা পার হয়ে যাবো।

তবু পূরবী দাঁড়িয়ে রইলো পথের মাঝখানে। ওর চোখে মুখে শঙ্কার সুস্পষ্ট চিহ্ন। একবার আমার মুখের দিকে, আরবার সামনের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে শঙ্কাকুল নয়নে।

ঠিক এই সময় ভেসে এল সুমধুর মন্ত্র ধ্বনি—

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।'

মধুর কণ্ঠস্বর। এমন করে কে এই সুমধুর স্তোত্র আবৃত্তি করছে!

মুহূর্তের মধ্যে এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন আমাদের দুজনের মাঝখানে। স্মিত হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। কোন কথা নয়, ইংগিতে পূরবীকে চলার নির্দেশ দিয়ে নিজেও চলতে আরম্ভ করলেন। সমুন্নত গৌরবর্ণ দেহ, মাথায় একরাশ জটা, চন্দন চর্চিত ললাট, পরনে গেরুয়া বসন, গায়ে একটি কম্বল, হাতে কমণ্ডলু আর লাঠি, পিঠে ঝোলানো ছোট একটি গেরুয়া কাপড়ের পুঁটুলি—পূরবীর হাত ধরে বরফের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে চললেন। একবার পিছন ফিরেও দেখলেন না, আমি আসছি কিনা।

এতোসময় গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছিল, এবারে নতুন উপসর্গ এলো—ঝড়। গতিবেগ তীব্র না হলেও তীব্র হতে পারে।

তুষার ঝড়ের মধ্যে এগিয়ে চলছি—হঠাৎ কানে এল আকুল কণ্ঠের কান্না। কয়েক পা এগিয়ে যাই—এক বৃদ্ধার পা বসে গেছে বরফের মধ্যে।

পা টেনে তুলতে পারছেন না বৃদ্ধা। বরফের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পা টেনে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, আর আকুলকণ্ঠে কাঁদছেন কেদারনাথের নাম করে।

দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বৃদ্ধাকে তুলে দিই। দাঁড়াতেও পারছেন না বৃদ্ধা। আড়ষ্ট হয়ে গেছে হাত-পা, নীলবর্ণ হয়ে গেছে মুখ, চোখ মেলে চাইতে পারছেন না।

কী এক শক্তি আমাকে পেয়ে বসেছে। উন্মাদ হয়ে গিয়েছি সে শক্তির উত্তেজনায়। বৃদ্ধাকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছি। তারপর কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তুষার ঝড় মাথায় নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি।

যে নামে মূক ভাষা পায়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আমি কী সেই নাম সম্বল করে এই বৃদ্ধাকে নিয়ে কেদারের কোলে পৌঁছতে পারবো না ?

ওই তো কেদার মন্দির, ওই তো—দূরে নয়, কাছে। অগণিত নর-নারীর কণ্ঠে মিলিত জয়ধ্বনি শুনছি, 'জয় কেদারনাথ কী জয়'।

এতোক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পাই। আচ্ছন্নের মতো এসেছি এই পথটুকু। কাঁধের ওপর বৃদ্ধার প্রায় অচেতন দেহ। দূর থেকে শুনতে পাই প্রসাদদার ডাক—ওদিকে নয়, এদিকে এসো শ্রীমন্ত। মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আর তাঁকে দর্শন করা হলো না বোধ হয়।

টলে পড়ে যেতাম, যদি না সেই সন্ন্যাসী আমাকে ধরে ফেলতেন। আমার কাছ থেকে বৃদ্ধার দেহ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

আগুন জ্বলছে ঘরের মধ্যে। বৃদ্ধাকে নিয়ে আগুনের কাছে গেলেন সন্ন্যাসী। পূরবী শুয়ে আছে কম্বলের ওপর। মাষ্টারমশায় তার হাতে পায়ে তাপ দিচ্ছেন। সীমা আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে বসে আছে অগ্নিকুণ্ডের পাশে। শান্তিলতা একপাশে সরে আমাকে জায়গা করে দিলেন। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে হাত পায়ে তাপ নিই। এতোক্ষণে দেহে যেন প্রাণশক্তি ফিরে আসছে।

পূরবী উঠে বসেছে। বৃদ্ধাও আগুনের তাপে চেতনা ফিরে পেয়েছেন। সন্ন্যাসী এতোসময় বসে বৃদ্ধার শুশ্রূষা করছিলেন। এবার উঠে দাঁড়িয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।—রসো বৈ সঃ, রসো বৈ সঃ—শুধু এই একটি কথা বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

বৃদ্ধা উঠে বসেছেন। কিন্তু তাঁর কথা আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। শুধু কথাবার্তায় এইটুকুই বোঝা গেল, উনি আসছেন অন্ধ্র থেকে। সঙ্গে ছেলে আছে। আরো লোকজন নিয়ে সে এগিয়ে গিয়েছিল !

কেদারনাথের পাণ্ডা পান্নালাল শুক্লকে বৃদ্ধার কথা বলতে, সে জানালো এখুনি বাইরে গিয়ে বৃদ্ধার পুত্রের খোঁজ করবে।

ঘণ্টাখানেক বাদে একজন প্রৌঢ় এলেন পান্নালাল শুক্লের সঙ্গে। এসেই তিনি বৃদ্ধাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এই বৃদ্ধা তাঁর মা। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের

নাম সদাশিব মেনন। ইংরেজীতে কথাবার্তা বলছিলেন। বললেন, মাকে সারাক্ষণ তিনি সঙ্গে রেখেছিলেন। কিন্তু রামওয়াড়া পেরিয়ে পরিচিত আর একটি দলের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছিলেন মা। তারা যে মাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাবে, এ ধারণা করেন নি। তিনি আগেই পৌছেচেন, এসে অব্দি মাকে খোঁজাখুঁজি করেছেন।

সদাশিব মেনন চলে গেলেন মাকে নিয়ে। মা যাওয়ার আগে সস্নেহে আমার চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন দিলেন।

বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। নামুক। ঘরের জানালা দরজা বন্ধ। বাইরের সঙ্গে কটি ছিদ্র ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। এখনো তুষারপাত বন্ধ হয়নি। দুর্যোগের দরুণ আজ চারটের আগেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পাণ্ডা পান্নালাল শুক্ল জানিয়ে গেছে আজ যেন ঘরের বাইরে না যাই। বিপদ যে কোন সময়ে আসতে পারে। রাতের খাবার লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

ঘণ্টাখানেক বাদে এলো পাণ্ডার ছড়িদার ও আরও তিন চারজন লোক। খাবার, চা, গরম জল, লেপ সব একসঙ্গেই এনেছে। ঘরের কোণে কাঠ ছিল, সেগুলি দিয়ে নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

বিছানায় বসেই আহারাদি সারা হলো। হাত মুখ ধোয়াও যেমন তেমন। লেপ কম্বল জড়িয়ে যে যেমন পারে শুয়ে পড়লেন। এতো যে কথা বলে প্রসাদদা, সেও চুপচাপ। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে মুখে চাপা আওয়াজ করছে প্রসাদদা। শ্রীমতী রজনী কিছুই খেলেন না, শুধু এক গ্লাস চা ছাড়া। রজনীবাবু বারবার বললেন খাওয়ার কথা। কিন্তু আর কিছুই তিনি নিলেন না। চা খেয়ে পাণ্ডার দেওয়া লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সীমা শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। আহত কনুই-এ যন্ত্রণা হচ্ছে তার। একে এই শীত, তারপর কনুই-এর মতো জায়গায় চোট লাগা, যন্ত্রণা না-হওয়াটাই আশ্চর্য।

ঘরের কোণে জায়গা করে নিয়ে আমিও শুয়ে পড়েছি। লেপ কম্বল চাপিয়েও শীত যায় না। আমার পাশেই মাষ্টারমশায়, শুয়ে থেকে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করছেন।

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥"

উদাত্ত কণ্ঠে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করছেন মাষ্টারমশায়। জানি না কখন গীতার শ্লোকের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

—মা, মা। ঘুম ভেঙে গেল 'মা' ডাক শুনে। কাতর কণ্ঠে সীমা ডাকছে মাকে। মায়ের কানে পৌঁছচ্ছে না মেয়ের কাতর কণ্ঠের ডাক।

মাথার কাছে ঘড়ি ছিল। টর্চ জ্বেলে দেখি, রাত আড়াইটে। সীমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি, অমন করে সে মাকে ডাকছে কেন। যন্ত্রণা হচ্ছে তার কনুই-এর ক্ষতস্থানে। ঘুমোতে পারছে না, অথচ দারুণ ঘুম পাচ্ছে তার। আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে। জিজ্ঞাসা করি, খাবে কিনা।

—কি ওষুধ আছে আমায় দিন শ্রীমন্ত দা। সীমা কাতর কণ্ঠে বললে; —তখন থেকে জেগে আছি। ঘুম আসছে অথচ ঘুমোতে পারছি না।

মাথার কাছেই ছিল ওষুধের ব্যাগ। খুঁজে খুঁজে বার করি ঘুমের ওষুধ। সীমাকে খাইয়ে দিই নিজের হাতে। তারপর দেখি ওর ক্ষতস্থান। না, ব্যাণ্ডেজ খুলে যায় নি। যতদূর মনে হয় রক্তও পড়ছে না। রক্ত পড়লে ব্যাণ্ডেজ ভিজে যেত।

—এবারে ঘুমোবার চেষ্টা করো সীমা। বলে নিজের জায়গায় ফিরে আসি।

কিন্তু আর ঘুম এলো না চোখে। ঘুম ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে নানা শিথিল চিন্তায় কেটে গেল বাকি রাত।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

ওঁ গুরুর্ব্রহ্মাগুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

রাত শেষ হয়ে আসছে। করজোড়ে গুরু প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করছে প্রসাদদা। জানালার রন্ধ্র পথে আলোর এক একটি নিষ্প্রভ রেখা প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে।

—প্রসাদদা।

—কী ভাই।

—কখন উঠেছো ?

—অনেকক্ষণ। তুমি সীমাকে ওষুধ দিলে, তাও জানি।

—তবে সাড়া দাওনি যে !

—দিই নি। বলে প্রসাদদা মৃদু শব্দ করে হাসলো।

একে একে সকলেরই ঘুম ভাঙে। শুধু সীমা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। শ্রীমতী রজনী মেয়েকে ডাকতে গেলে বারণ করলাম।—ডাকবেন না ওকে। রাত আড়াইটের পর ও ওষুধ খেয়ে তবে ঘুমিয়েছে।

—কেন, কী হয়েছিল ওর। হাইতুলে আড়ামোড়া ভাঙলেন শ্রীমতী রজনী। তারপর রাতের বৃত্তান্ত শুনে বললেন,—তা তুমিও তো আমাকে ডাকতে পারতে বাছা।

কথায় কথা বাড়বে ছাড়া আর কিছু নয়। মিছে কথা বাড়িয়ে এই দূর দেশের প্রথম সকালটিকে বিস্বাদ করে কী লাভ ! সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে বাইরে এলাম। সত্যি, সুন্দর একটি ভোর। নির্মেঘ আকাশে যদিও এখনো ঘন কুয়াশার জাল জড়ানো—তবু ওটুকু কুয়াশা যে উবে যাবে, এ বিশ্বাস আজ সকলের মনে। আজ নিশ্চয়ই সূর্য উঠবে।

একটি সুন্দর সকাল। দূরের বরফাচ্ছাদিত হিমালয়ের শিখরের ওপার থেকে সূর্য উঠছে। প্রভাত সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে পশ্চিমের গিরি-শৃঙ্গে। যেদিকে তাকাই, সে দিকেই দেখি স্বর্গ-সৌন্দর্যের মহিমময় প্রকাশ।

বরফে ঢাকা মন্দিরের পথ। শুচিবস্ত্র পরে তীর্থ পথিকেরা চলেছে মন্দিরে। সকাল আটটায় মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হবে—আটটা বাজতে আর কতো-ই বা দেরী।

দেবভূমি এই কেদারক্ষেত্র। ভাবি, এই দেবলোকের পথে যুগ-যুগান্ত ধরে এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। মহাপুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভবঘুরে, গৃহী—কত লোকই না এসেছে এখানে, দর্শন করেছে দেবাদিদেবকে, প্রণাম করেছে—তারপর চলে গেছে আপন ঠিকানায় অক্ষয় পুণ্যের সঞ্চয় নিয়ে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহাভারতের অন্যতম নায়ক যুধিষ্ঠির সহ পঞ্চপাণ্ডব এই পথে স্বর্গলোকে যাত্রা করেছিলেন। এই পথ, এইতো স্বর্গের পথ। এই কেদারনাথকে পুজো করে পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জ্ঞাতিহত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছি। কেদারনাথ শৃঙ্গ, আর নীলকণ্ঠের মহিমময় প্রচ্ছদের নীচে কেদারনাথের মন্দির। মন্দিরের অঙ্গনে, প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে অগণিত নরনারী। কখন দর্শন লাভ হবে, এই প্রতীক্ষায়।

মন্দিরে প্রবেশ করতে এখানে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। আগে নাম লেখাতে হবে গদীতে, গদীতেই জমা দিতে হবে পূজো, ভোগ ইত্যাদির জন্যে দেয় অর্থ, তারপর সেই মতো দর্শন ও প্রসাদ পাবার বিধি। ব্যবস্থা সত্যিই সুন্দর। আমাদের নাম গতকাল রাত্রেই পান্নালাল শুক্ল নিজে লিখে নিয়ে গিয়েছিল, তারই কাছে শুনলাম, নটার মধ্যেই দর্শন হয়ে যাবে।

মন্দির চত্বরে বসে আছি অজস্রের ভিড়ে। মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। পরের পর যেমন নাম লেখানো সেই মতো এক এক দল দর্শন করে আসছে। মুখে 'জয় কেদার' ধ্বনি। ভিড়ের মধ্যে তুলসীদাসকে দেখলাম। আরো কতো পরিচিত মুখ দেখতে পাচ্ছি। কমলা ঘোষ একান্তে বসে মা-পিসিকে তীর্থ মাহাত্ম্য শোনাচ্ছে একটি পুস্তিকা থেকে। সবাইকে তো দেখছি; কিন্তু শুভলক্ষ্মী কই! সে কি এখনো আসেনি!

প্রতীক্ষার অবসান হলো। ডাক পড়েছে আমাদের। প্রসাদদা সোল্লাসে বলে উঠলো—জয় কেদারনাথ কী জয়, জয় কেদারনাথ কী জয়। মন্দিরের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে সমবেত নরনারীর মিলিত কণ্ঠে জাগলো প্রতিধ্বনি—জয় কেদারনাথ কী জয়।

মন্দিরে কোন মূর্তি নেই, বৃষের পৃষ্ঠদেশের মতো অমসৃণ এক পাথর—এই কেদারনাথ। যুগ-যুগান্তর ধরে এই পাথরের মধ্যে মানুষ ঈশ্বর অন্বেষণ করেছে। এই পাথরকে মানুষ পূজো করেছে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞানে। কথিত আছে, পুরাকালে মধ্যম পাণ্ডব ভীম এক সময় বৃষরূপী শিবকে হনন করতে চেয়েছিলেন। এইখানে পৌঁছে বৃষরূপী শিব, ধরিত্রীর মধ্যে আত্মগোপন করেন। কিন্তু শরীরের সমস্ত অংশ ভূগর্ভে প্রবেশ করে নি। ভীম এই দৃশ্য দেখে যার পর নাই বিস্মিত হন, তাঁর ভুল ভেঙে যায়। তারপর ভীম নিজের পাপবুদ্ধির কথা চিন্তা করে অনুতপ্ত হয়ে দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হন। এবং পাপ থেকে মুক্তি কামনা করে এইখানে ভগবান শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও অনেক বলেন, কেদারনাথের এই মন্দির আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত।

কেদারনাথের অঙ্গে ঘৃত প্রলেপ করে, ফুল বেলপাতা দিয়ে নীরবে পূজো সমাধা করে একে একে সকলেই মন্দিরের বাইরে এসেছি। বাইরে এসে দেখি

শুভলক্ষ্মীকে। বসে আছে মন্দিরের বাইরের চত্বরে। আমাকে দেখে ও জিজ্ঞাসা করে, আজই ফিরছি কিনা। উত্তর দেই—হাঁ, আজই ফিরবো।

'ন কেদারাৎ পরং স্থানং ন কেদারাৎ পরং তপঃ।
ন কেদারাৎ পরো মোক্ষ স্বয়ং দেবেন ভাষিতম্।

স্বয়ং দেবাদিদেব বলেছেন, কেদার হতে বিশিষ্ট অন্য স্থান নেই, এই কেদার ক্ষেত্রেই পরম মোক্ষ লাভ করা যায়।

কেদার ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অনন্ত। এই পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ সংসারে থেকে নানা দুঃখ ভোগ করে। কেদার ক্ষেত্রে আগমনে সংসারের সকল দুঃখের অবসান হয়। এখানে দান-ধ্যানে, জপে, পূজায় মানুষ অনন্ত শান্তি লাভ করে। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ দিব্যধাম প্রাপ্ত হয়।

কেদারক্ষেত্রে স্বয়ং কেদারনাথ সতত বিরাজমান। এখানে একরাত্রি বাস, অনন্তকাল শিবালয়ে বাসের তুল্য। স্বর্গনিঃসৃত মন্দাকিনীতে স্নান করে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলে পিতৃপুরুষ মোক্ষলাভ করেন। কেদার মন্দির প্রদক্ষিণ করলে খণ্ডদ্বীপ সহ পৃথিবী প্রদক্ষিণের তুল্য ফললাভ হয়।

দেবীর মধ্যে যেমন পার্বতী, ভক্তগণের মধ্যে নারদ, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে কৈলাস, ধামের মধ্যে বদ্রীনাথ, তেমন ক্ষেত্রের মধ্যে এই কেদারক্ষেত্র। পাপী-তাপী সকলের জন্যই এই কেদারনাথ।

এই কেদারক্ষেত্র সম্পর্কে সুন্দর একটি কাহিনী শোনা যায়। একসময় এই কেদারক্ষেত্রের এক গ্রামে কোন এক ব্যাধ বাস করতো। ব্যাধ গ্রামের বাইরে জংগলে শিকার করে বেড়াতো। একদিন ঐ ব্যাধ একটি মৃগকে অনুসরণ করে জংগলের পথে চলতে চলতে কেদারনাথ এসে পৌছয়। ঐ স্থানে পৌছেই ব্যাধ দূর থেকে ঋষিগণের সহিত বীণাবাদনে রত নারদ মুনিকে দর্শন করে। ঠিক সেই সময় ব্যাধের দৃষ্টি এক স্বর্ণমৃগের ওপর পড়ে। ব্যাধের মনে তখনি ঐ স্বর্ণমৃগ শিকারের বাসনা হয়। ব্যাধ মনে করে যে ঐ স্বর্ণমৃগ শিকার করতে পারলে তার গৃহ স্বর্ণে পূর্ণ হবে। লোভের বশবর্তী হয়ে ব্যাধ যে মুহূর্তে ধনুকে তীর যোজনা করে, সেই মুহূর্তে মুনিঋষিগণ সহ স্বর্ণমৃগ অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনায় ব্যাধ বিস্মিত হয়ে আরো দূর গমন করে। সেই সময় ব্যাধ আবার

এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো। এক বিষধর সাপ একটি ভেককে গ্রাস করছে। পরক্ষণেই দৃশ্য পরিবর্তন হলো। সেই বিষধর দেবাদিদেবের নয়ন বিমোহন মূর্তি ধারণ করলেন। এই সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনায় ব্যাধ দারুণ ভীত হলো। ভাবলো, নিশ্চয়ই এ অঞ্চল ভূতপ্রেতের লীলাভূমি। ব্যাধ তখন ভীত হয়ে আত্মগোপন করবার জন্যে অরণ্যের পথে ছুটে চলতে লাগলো। সেখানেও নিষ্কৃতি নেই। দেখে, এক ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র একটি মৃগকে বধ করছে। মৃত মৃগটির পাঁচটি মুখ, তিনটি চোখ এবং কয়েকটি সর্প মৃগের শরীরে শোভা পাচ্ছে। ঠিক এই সময় দেবর্ষি নারদ ব্যাধের সামনে উপস্থিত হলেন। ব্যাধ এতোক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে দেবর্ষিকে প্রণাম করলো। এবং আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা দেবর্ষির কাছে ব্যক্ত করলো। সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে দেবর্ষি বললেন,—ব্যাধ, তুমি ধন্য। তুমি আজ যে দৃশ্য দেখেছো এ সবই প্রভুর লীলা। তুমি ভাগ্যবান, তাই আজ শিকারের নেশায় এখানে এসে পৌঁছেচো। এই স্থান হলো স্বয়ং কেদারনাথের লীলাভূমি। এখানে তিনি শত সহস্র রূপে বিরাজমান। এখানে এলে পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু, কীট-পতঙ্গ, সকলেই মুক্তিলাভ করে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তোমারই চোখের সামনে তা ঘটতে দেখেছো। মৃত মৃগকে দেখেছো শিবে রূপান্তরিত হতে, সর্পকে দেখেছো নীলকণ্ঠরূপে—তুমি অসাধু ব্যাধ—যেখানে এসেছো, এখানে তুমিও মুক্তি পাবে।

ইতিবৃত্ত শুনে ব্যাধ দেবর্ষির পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। বলে,—কেমন করে আমি মুক্তি পাবো ঠাকুর?

নারদ বলেন,—তুমি এই পবিত্র কেদারনাথে নিবাস করো। কালে তোমার চিত্তশুদ্ধি হলে, মুক্তি পাবে।

এইবলে নারদ অন্তর্হিত হলেন। ব্যাধও তীর-ধনুক দূরে নিক্ষেপ করে নারদের বাণী চিন্তা করতে করতে সমাধিস্থ হলো।

মন্দির প্রাঙ্গণে বসে পাণ্ডা পান্নালাল শুক্লের কাছে তীর্থ মাহাত্ম্য শুনি। কেদার ক্ষেত্রে সম্পর্কে নানা ধরনের অলৌকিক উপাখ্যান শুনি। 'কেদারনাথকে আমরা দর্শন করেছি—স্পর্শ করে ঘৃত, চন্দন ও বিল্বপত্রে পুজো করেছি—আমরাও এই পৃথিবীর জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে শিবলোকে স্থান পাবো'—বলে পান্নালাল শুক্ল সকলকে করজোড়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন,

হরো শম্ভো মহাদেব, বিশ্বেশাং হরবল্লভম্।
শিবশঙ্কর সর্ব্বাত্মাম্, নীলকণ্ঠ নমোস্তুতে॥

কর্পূর গৌরং করুণাবতারম্, সংসার সারং ভুজগেন্দ্রহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দম্, ভবং ভবানী সহিতং নমামী॥

এই কেদারনাথে পঞ্চগঙ্গা প্রবাহিত। মন্দাকিনী, সরস্বতী, ক্ষীরগঙ্গা, মহোদধি আর স্বর্গদ্বারী গঙ্গা! আদি শঙ্করাচার্য এই কেদারনাথেই মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। তাঁর সমাধিভূমি এখানেই। রেতকুণ্ড, উদককুণ্ডের কথাও তীর্থপথিকের কাছে সুবিদিত।

কেদারনাথ থেকে ছমাইল দূরে স্বর্গারোহিণী এবং ব্রহ্মগুহা। যেখানে পাণ্ডবগণ যজ্ঞ করে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। শোনা যায় যজ্ঞস্থলে মাটি-বরফ-পাথরের নীচে এখনো পাণ্ডবগণের যজ্ঞের কয়লা ও ভস্ম পাওয়া যায়।

এখান থেকে চড়াই পথে এক মাইল গেলে সত্যপন্থ ও চোরাবাড়ী নামে সুন্দর হ্রদ আছে। কিন্তু সে পথ অতি দুর্গম। সাধারণ তীর্থযাত্রীর পক্ষে সেখানে যাওয়া একরকম অসম্ভব।

মন্দিরের প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে সবাই চলে গেছে চটিতে। বেলা বারোটার মধ্যে আমাদের আবার যাত্রা করতে হবে সেই পথে, যে পথ ধরে এসেছিলাম কেদারনাথে।

আবার যাই মন্দিরের কাছে। দাঁড়িয়ে থাকি অচঞ্চল। দেখি, ভগবান কেদারনাথের মন্দির। মন্দির দ্বারে নাদেশ্বর নামক মহাদেবের ষাঁড়, প্রবেশ দ্বারে গণেশ মূর্তি। প্রথম দালানে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি, দ্বিতীয় দালানের দক্ষিণে দেবী পার্বতী, বামে নানা অলংকারে ভূষিতা লক্ষ্মীদেবী। অন্যত্র রয়েছেন নর-নারায়ণ বা ভোগ মূর্তি।

দেখার শেষ নেই, অবধি নেই। মন্দিরের বাইরে এসে চারদিকে ফিরে ফিরে দেখি। অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত শিখর মালা। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখি হিমালয়ের মহিমময় প্রকাশ।

—যাবে না? মিহি কণ্ঠের জিজ্ঞাসা কানে বাজলো। পূরবী ডাকছে। সবাই গেছে সাধকপুরুষ ফলাহারী বাবাকে দর্শন করতে। আমাকে ডাকতে এসেছে ও।

মন্দিরের কাছেই ফলাহারী বাবার আশ্রম। দাক্ষিণাত্যের এই মহাপুরুষ, ফলাহারী বাবা নামেই পরিচিত। শৈব সাধক। বারো মাসই এখানে থাকেন। শীতের প্রারম্ভে কেদারনাথ জনশূন্য হয়ে যায়, কেউ-ই থাকে না এখানে।

আশ্চর্য, এই সাধকপুরুষ নিজ আশ্রমেই থাকেন। শীতের দিনে কেদারের কথা কল্পনাও করা যায় না। বাড়ী, ঘর, মন্দির—সবকিছু বরফের নীচে চাপা পড়ে যায়। বন্ধ মন্দিরে থাকেন দেবাদিদেব কেদারনাথ। আর থাকে জলন্ত প্রদীপ। সেই সঙ্গে নিজ আশ্রমে দিনাতিপাত করেন ফলাহারী বাবা। তাঁর আশ্রমও বরফে ঢাকা পড়ে যায়। তারই মধ্যে এই কেদারনাথের ভক্ত সাধক শীতঋতু অতিবাহিত করেন। শীতান্তে বসন্ত আসে। গ্রীষ্মের আবির্ভাবে বরফ গলতে শুরু করে। তখন গুপ্তকাশী থেকে কেদারনাথের পূজারী আসেন মন্দির দ্বার উন্মোচন করতে। বরফের চাঁই কেটে মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত করতে হয়। ফলাহারী বাবাকেও বরফে ঢাকা আশ্রম থেকে বার করে ভক্তজনেরা। আরও শোনা যায়, এই মহাপুরুষের কতো বয়েস তার সঠিক হদিশ কেউ দিতে পারে না। কেউ বলেন এক শ, কেউ বলেন দেড় শ কি তারও বেশী। দেখে মনে হয়, এই মহাপুরুষ শতবর্ষ পার হয়ে এসেছেন নিশ্চিত।

দর্শনার্থীর ভিড়ে একটি আসন পাতা চৌকির ওপরে বসে আছেন ফলাহারী বাবা। মুখে স্মিত হাসি। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলছেন, হাসছেন। কথনো দু'এক কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ও।

দর্শনার্থী প্রত্যেক যাত্রীকেই জিজ্ঞাসা করছেন কেদার দর্শন হয়েছে কিনা। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বলছেন,—দর্শন যদি হয়ে থাকে তবে চলে যাও। আজও দুপুরের আগে থেকে তুষারপাত শুরু হবে।

কে একজন বললে,—আজ আকাশ তো বেশ পরিষ্কার। শুনে ফলাহারী বাবা মৃদু হাসলেন।—এখানকার আকাশ ছোট ছেলের মতো। কখন হাসে, কখন কাঁদে বোঝা যায় না। তারপর আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন ক্ষণেকের জন্য। পরে তার মুখে আবার একই কথা শোনা যায়—তুম লোগোঁকো ক্যায়া দরশন মিলে? তুমলোগ পাহাড়সে উতার যাও। আঁধি, তুফান আউর হিমপাত হোগা।

তবু আরো একবার ফিরে চাই মন্দিরের দিকে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কেদারনাথের উচ্চতা এগারো হাজার সাতশ পঞ্চাশ ফুট। চির তুষারের দেশ। যুগ-যুগান্তর ধরে হিমালয়ের বুকে দাঁড়িয়ে আছে কেদারনাথের মন্দির।

পথের গড়া মন্দিরে পাথরের দেবতা—সহজ বিশ্বাসের প্রতীক। সহজ বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ এখানেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে। যেখানে সহজ বিশ্বাস,

যুক্তি তর্ক সেখানে অচল। মনে যদি অবিশ্বাস থাকে, যদি সংশয় থাকে, যদি থাকে যুক্তিবাদী মনে সব কিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করার প্রবৃত্তি—তবে এখানে এসে সে মনের অবলুপ্তি ঘটবে। এখানে মানুষ একান্তভাবে বিশ্বাসী।

—বাবু। তুলসীদাস ডাকে।

—কিছু বলবে তুলসীদাস?

—না। ফিরে যাবে না?

—যাবো।

—তবে চলো। বলে আকাশের দিকে ফিরে চায় তুলসীদাস।

ধোঁয়াটে মেঘ জমেছে আকাশে। আজও গতকালের মতো তুষার পাত হবে হয়তো।

চটিতে ফিরেছি। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। পাণ্ডাঠাকুর এসেছে তীর্থের সুফল করাতে। সংকল্প করে প্রত্যেকের নামে নামে সুফল করাচ্ছে পাণ্ডা ঠাকুর।

আবহাওয়ার কথা স্মরণ করে সবকিছুই সংক্ষেপে সমাধা করলে পাণ্ডা ঠাকুর। যে যেমন পারে দক্ষিণা দিয়ে মনে মনে সুফল প্রার্থনা করে। তারপর পাণ্ডাঠাকুরের দেওয়া প্রসাদ গ্রহণ করে কেদারনাথ ত্যাগের উদ্যোগ শুরু হয়।

যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরছি। একজন নয়, দুজন নয়—অগণিত যাত্রী কেদার দর্শনান্তে ফিরে চলেছে।

এবারের পথ তুঙ্গনাথ, বদ্রীনারায়ণের পথ। প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রীদের কণ্ঠে 'জয় নারায়ণ' ধ্বনি। কেদার দর্শনান্তে এবারে নারায়ণের পাদপদ্ম দর্শন করতে চলেছে তীর্থ-পথিকের দল। আসার সময়ে যে পথ ছিল চড়াই, যাওয়ার পথে নামছি উৎরাই-এ। উৎরাই পথে নামতে কষ্ট অনেক কম। শুধু লাঠি হাতে দেহের ভারসাম্য ঠিক রেখে পায়ে পায়ে নেমে চলা।

আজ প্রসাদদার উল্লাসের অন্ত নেই। খুশীর জোয়ার বইছে মনে। কখনো গান গাইছে, কখনো স্তোত্র আবৃত্তি করছে, কখনো 'জয় বদ্রী বিশাল, কী জয়' ধ্বনিতে যাত্রীদলকে উৎসাহিত করছে।

সীমা আজ আমার সঙ্গেই আসছে প্রথম থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সঙ্গ ছাড়া হয়নি। ওর কনুই-এর ব্যাথা এখনো কমেনি, ঠিক মতো লাঠি ধরতে পারছে না। যেখানে অসুবিধে বুঝছে, আমার হাত ধরে নামছে। সকলেই

এগিয়ে গেছে আজ, পেছিয়ে পড়েছি আমি আর সীমা। সীমাকে নিয়ে সাবধানেই চলতে হচ্ছে।

বেলা বারোটায় কেদারনাথ থেকে রওনা হয়েছিলাম। রামওয়াড়ায় পৌঁছেচি দুঘণ্টার মধ্যে। পথে কেদার যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে; 'জয়-নারায়ণ, জয় কেদার' বলে পরস্পরের মধ্যে সম্বোধন বিনিময় করেছি।

রামওয়াড়ায় পৌঁছে আরো যাত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। যারা এইমাত্র গৌরীকুণ্ড থেকে এখানে এসে পৌঁছেচে।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। গাঢ় কুয়াশার মতো মেঘ জমেছে আকাশের সর্বাঙ্গে। দূরের গিরিশিখর আর দেখা যাচ্ছে না, মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। রামওয়াড়া থেকে যতো শিগগির রওনা হওয়া যায়, ততোই মঙ্গল। গৌরীকুণ্ডে পৌছুলে আজকের মতো নিশ্চিন্ত।

কেদারে তেমন কিছু খাওয়া-দাওয়া জোটেনি। শুধু সামান্য পুরি তরকারী খেয়ে রওনা হয়েছিলাম। রামওয়াড়াতেও তেমন কিছু সংগ্রহ করা গেল না। এতো বেলায় তো আর রান্নার হাঙ্গামা করা যায় না। সুতরাং পকৌড়ি লাড্ডু আর চা খেয়েই আবার 'জয় নারায়ণ' বলে পথে নামলুম।

এ কদিনে যে কষ্ট না হয়েছে একদিনেই তাই। সীমা আর পূরবীর মুখ শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে। মাষ্টারমশায় আর শান্তিলতার চেহারা আধখানা হয়ে গেছে।

শুধু আমরা নই, প্রতিটি যাত্রীই পথশ্রমে ক্লান্ত। তারপর কেদারের পথে যে আবহাওয়ার ধকল সহ্য করতে হয়েছে, তাতে আরো কাহিল করে দিয়েছে।

রামওয়াড়া থেকে রওনা হয়ে মাইল খানেক পথ এসেছি, এমন সময় শুরু হলো বৃষ্টি। মুষলধারে বর্ষণ নয়, বিন্দু বিন্দু বারিপাত। মৃদু বর্ষণের মধ্যেই বদ্রীনারায়ণের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে গৌরীকুণ্ডের পথে চলেছে যাত্রীদল।

—শ্রীমন্তদা, আপনাকে দেখে প্রথম দিন আমার কি মনে হয়েছিল জানেন? আমার হাত ধরে একটি ঝর্ণা পার হতে হতে সীমা বললে।

—কী?

—শুনলে আপনি রাগ করবেন।

—তুমি বলো সীমা, আমি বলছি রাগ করবো না।

—মনে হয়েছিল আপনি যাদুকর।

—যাদুকর! সশব্দে হেসে উঠি—এ ধারণা তোমার কি করে হলো সীমা?

ছোট বেলায় সীমা তাদের স্কুলে একজন যাদুকরকে দেখেছিল। নাম মনে নেই, মনে আছে একদিন স্কুলের টিফিনের পর একজন কালো ঢ্যাঙা গোছের লোক অদ্ভুত আলখাল্লা পরে স্কুলের বাইরে খোলা মাঠে ম্যাজিক দেখিয়েছিল। সেই লোকটির কথা কোনদিন ভুলবে না সে। সেই এক আনার যাদুকরকে দেখতে ঠিক আমারি মতো। প্রথম দিন আমাকে দেখেই ওর ধারণা হয়েছিল, আমি সেই যাদুকর। যাকে ও নবছর আগে স্কুলের মাঠে দেখেছিল।

সীমার কথা শুনে আবার সশব্দে হেসে উঠি। বলি,—তোমাকে দেখে আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়—না, বলবো না। বললে সত্যিই তুমি রেগে যাবে।

—বলুন, সত্যি বলছি রাগ করবো না।

—মনে হয়, সীমার মুখের দিকে চেয়ে হালকা সুরে বলি,—এই পাহাড়ের দেশের নদীর মতো তুমি চঞ্চল। মতিগতি একটুও স্থির নয়।

—ও এই কথা। সীমা কৃত্রিম ভাবে চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে,—আমি ভাবলাম, না জানি কি কথা বলবেন।

আবার নীরবে দুজনে খানিক পথ অতিক্রম করি। এক সময় সীমা জানতে চায় তার রাঙাদিকে আমার কেমন লাগে।—ভালো। শুধু এই কথা বলে কথার উত্তর দিতে পারতাম। কিন্তু ওই এক কথায় উত্তর না দিয়ে বললাম,—তোমার রাঙাদিকে আমি আজও বুঝতে পারিনি সীমা।

—আপনি তো এই কদিন দেখছেন, আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি, মিশছি, কিন্তু আজও বুঝতে পারলাম না আমার রাঙাদিকে।

—কেন বলো তো?

—বলতে পারবো না।

—তোমার রাঙাদি কি…কথা শেষ করতে পারলাম না।

—যদি কিছু জানবার থাকে রাঙাদিকেই জিজ্ঞেস করবেন। আমি বলতে পারবো না কোন কথা।

আপাততঃ এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে রইলো।

আমাদের দুজনকে পেছনে রেখে সবাই এগিয়ে গেছে। উৎরাই পথে নামছি। দূরে প্রসাদদাকে দেখতে পাচ্ছি। আরো দূরে মাষ্টারমশায়কে।

কিছু পথ এসে সীমা বসে পড়লো পথের ধারে। একটু বিশ্রাম না নিয়ে আর চলতে পারবে না। পা টনটন্ করছে ওর, পেশীতে মৃদু যন্ত্রণা হচ্ছে।

বললে,—এই রকম মাইলের পর মাইল হাঁটবো, এ কোনদিন ভাবতেও পারিনি শ্রীমন্তদা।

মৃদু হেসে বলি,—এ পথে সব কিছুই অভাবনীয়। এসো—বিশ্রাম নেবার সময় এখন নয়। সন্ধ্যের আগেই আমাদের গৌরীকুণ্ডে পৌঁছতে হবে।

তখনো পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যায়নি দিনের সূর্য। তখনো দূর পাহাড়ের শীর্ষে শেষ সূর্যের রক্তিম প্রকাশ। এমনই দিনের শেষে সীমার সঙ্গে পথ হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ডে। ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন মন—শুধু ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই দুটি চোখের তারায়। সে শুধু খুঁজে বেড়ায় সুন্দরের কণামাত্র যদি কোথাও পড়ে থাকে।

আসার পথে যে চটিতে রাত কাটিয়েছিলাম, এবারেও সেই চটিতে। আজ আর আলাদা নয়, সবাই একসঙ্গে। সীমাকে নিয়ে চটিতে ঢুকতেই শ্রীমতী রজনা জানালেন, আজ আর লালসিং যেন রান্নাবাড়া না করে। উনিই সবকিছু করবেন। মনে কেমন খটকা লাগলো, শ্রীমতী রজনীর হঠাৎ এরকম মতিবুদ্ধি হলো কেন?

আজও গৌরীতীর্থে পৌছে প্রথমেই এলাম তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে। স্নানান্তে অবসাদ ঘুচলো। স্বস্তিও পেলাম। ঘরে চুপচাপ বসে না থেকে প্রসাদদার সঙ্গে আবার এলাম তপ্তকুণ্ডের কাছে। একটি দোকানের সামনে বসে রইলাম দুজনে।

আজ গৌরীতীর্থে অজস্র নর-নারীর ভিড়। কেদার দর্শনার্থী যাত্রীও আছে, আবার যারা আমাদের মতো দর্শন করে ফিরছে তারাও আছে। সবে গত কাল থেকে যাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হয়েছে।

যে দোকানটিতে বসেছি, সেখানেও একদল অবাঙালী যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে। বোধহয় চটি, কিংবা ধর্মশালায় জায়গা পায়নি। দোকানেরই একটি উনুনে খিচুড়ি রান্না করছেন দলেরই একজন বৃদ্ধা। পাশেই একজন সুন্দরী তরুণী, আগুনের তাপ গ্রহণ করছে। তরুণীটি বোধহয় সম্পর্কে বৃদ্ধার নাতনী হবে। দু'জনে নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলে হাসি-তামাসায় মেতেছেন। দাঁত নেই বৃদ্ধার। নাতনীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাড়ি বার করে হাসছেন।

দোকানীর কাছ থেকে গরম পকৌড়ী আর চা নিয়ে আমি আর প্রসাদদা বসে আছি। এক সময় বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কেদারনাথ দর্শন

হয়েছে কিনা। দর্শন হয়েছে শুনে বৃদ্ধা কেদারপুরী সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। ভাঙা হিন্দীতে বৃদ্ধাকে কেদারপুরীর কথা শোনাচ্ছি। শুনতে শুনতে বৃদ্ধা এক একবার অদেখা কেদারনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করছেন।

খানিক সময়ের মধ্যে বৃদ্ধার সঙ্গে রীতিমতো আলাপ জমে ওঠে। বৃদ্ধা সপরিবারে তীর্থে চলেছেন। পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাত্‌নী নিয়ে। দুই জা'ও সংগে এসেছেন। তবে তাঁদের ছেলে মেয়েরা আসেনি। ছেলেরা নাতিকে নিয়ে বেরিয়েছে। এখনি ফিরবে। ওঁদের বাড়ী বিকানীরে। সেখান থেকেই আসছেন। বাংলা মুলুকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে, ছোটছেলের ব্যবসা আছে কলকাতায়। ছেলে-বৌ নিয়ে সে কলকাতাতেই থাকে। শুধু সেই ছেলেই সংগে আসেনি। তাই বৃদ্ধার একটু আক্ষেপ আছে মনে।

সবশেষে নাতনীকে দেখিয়ে বৃদ্ধা বললেন, ওটি তাঁর আদরের নাতনী। বড়ো ছেলের মেয়ে। নাম ললিতা।

—ললিতা, বাঃ বেশ মিষ্টি নাম তো। বলে ললিতার মুখের দিকে ফিরে চাই। চোখাচোখি হতে ললিতা সলজ্জ ভঙ্গীতে মুখ নীচু করলো।

যা আশা করিনি তাও পেলাম। এক রেকাবী গরম খিচুড়ি আর আলু ভাজা। ললিতা নয়, বৃদ্ধাই হাতে করে দিলেন। না—বলে নিষ্কৃতি পেলাম না।

প্রসাদদা তখনো বসে আছে। আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললে, —ছাখো শ্রীমন্ত, ঠাকুরমা খিচুড়ি দিলেন, কিন্তু আরো দুটি কচি হাতের স্পর্শ আছে ওতে। খেয়ে নাও। আমার মুখের দিকে দেখতে হবে না। এই তো তীর্থের সুফল।

—কী যে বলো প্রসাদদা। বলে হাত বাড়িয়ে নিয়েছি খিচুড়ির পাত্র।

—ঠিকই বলছি ভাই। যে জীবন রসে রসিক, সে এই কথাই বলবে। প্রসাদদা মৃদু হেসে বললে,—এইসব ঘটনাকে তুচ্ছ মনে কোরো না।

ললিতাকে দেখছি। বিকানীরের মেয়ে ললিতা। মিষ্টি মুখ, মিষ্টি হাসি। কতোই-বা বয়েস হবে ওর। সবে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছে। কিন্তু ওই বয়সে এই দুর্গম পথে চলেছে কেন? শখ করে কেউতো এ পথে আসে না।

বিকানীরে হয়তো কোন উষর মরুপ্রান্তে, কোন পাহাড়ের কোলে ওদের

ঘর। আকাশ যেখানে দিগন্ত জোড়া, প্রান্তর যেখানে সুদূর প্রসারী। সূর্য যেদেশে আগুন ছড়ায়, চন্দ্র যেখানে সুধা ঢালে—সেই বিকানীরের মেয়ে ললিতা।

এসব কী ভাবছি আমি। শূন্য রেকাবী হাতে নিয়ে কাঙাল নয়নে কী দেখছি ললিতার মুখের রেখায়!

দুর্গম তীর্থের পথে দেখা হয়েছে মাত্র। যে পথে সকলের একমাত্র পরিচয়—পথিক। একরাত্রির পান্থশালায় অপেক্ষার অবসরে ক্ষণেকের পরিচয়। রাত শেষ হয়ে যাবে, ওরা যাবে ওদের পথে কেদার পুরীতে, আমি চলে যাবো আমার পথে—বদ্রীনারায়ণে। আর হয়তো কেউ কারো দেখা পাবো না, এই গৌরী তীর্থে পড়ে থাকবে একটি সন্ধ্যারাতের সংলাপবিহীন ছোট নাটিকার পাণ্ডুলিপি।

চটিতে ফিরবার মুখে দেখা হলো শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে। এইমাত্র পৌঁছেচে ও। কেদারনাথ থেকে ওদের বেরোতে দেরী হয়েছিল। তারপর মাঝপথে যখন, তখন শুরু হয় তুষারবর্ষণ। সেই সংগে চলে তীব্র ঝড়ের প্রবাহ। প্রায় দেড়ঘণ্টা পথের মাঝেই কোনরকমে আত্মরক্ষা করে বসে থাকতে হয়। রামওয়াড়ায় পৌঁচেছিল বেলা পৌণে পাঁচটায়। উনতিরিশ জনের মধ্যে ছজন গৌরীকুণ্ডে এসেছে। বাকী সবাই রামওয়াড়াতেই আছে।

—তোমরা কজন চলে এলে দল ছাড়া হয়ে, এটা কি ভালো হলো?

—আমি কারো দলে নই। আসলে একাই আসছিলাম, আসবার সময় হৃষীকেশে ওই দলটির সংগে দেখা হয়। দলের মধ্যে পরিচিত কেউ নেই, দেশের লোক বলে এক সংগে হওয়া। আর যে পাঁচজন চলে এসেছে আমার সংগে, পথে তাদের সাথেই আত্মীয় সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। তাই তারা আমার সংগে চলে এলো। এরপরেই শুভলক্ষ্মী বললে,—চলো মন্দাকিনীর ধারে বসি গে।

—আজ আমি বড়ো ক্লান্ত শুভলক্ষ্মী। বিশ্রাম চাই।

ক্ষণমাত্র নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে শুভলক্ষ্মী বললে,—বেশ—তবে যাও। তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না।

—কাল আবার দেখা হবে শুভলক্ষ্মী।

—যদি দেখা হয়, হবে। এ-পথে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না—আচ্ছা, শুভরাত্রি।

—শুভরাত্রি।

কিন্তু অশুভলক্ষণে সূচনা হলো শুভরাত্রির। চটিতে ফিরে এসেই দেখি পূরবী মূর্ছা গেছে। মাথায় বাতাস দিচ্ছে প্রসাদদা। শান্তিলতা মাথার কাছে আড়ষ্ট হয়ে বসে। শ্রীমতী রজনী দুধ গরম করছেন। নির্বিকার মাষ্টারমশায়, গীতার পাতায় চোখ রেখে বসে আছেন ঘরের এককোণে।

সেদিন তোমার দেওয়া ওষুধে পূরবীর মূর্ছা ভেঙেছিল। শান্তিলতার কথামতো আজও ওষুধ দিলাম। অপেক্ষা করছি, কতোক্ষণে মূর্ছা ভাঙবে পূরবীর।

সেদিনের মতো আজো ওষুধ খাওয়ানোর দশ পনেরো মিনিট বাদেই চোখ মেলে চাইলো পূরবী। উঠে বসলো। কিন্তু একটি কথাও বলতে শুনলাম না।

গৌরীতীর্থে রাত নেমেছে। সারাদিন পথ হেঁটে ক্লান্ত সবাই। রাত নটা না বাজতেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে যে যার শয্যা গ্রহণ করেছে। থমথমে রাত। শুধু মন্দাকিনীর কলোচ্ছ্বাস ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই।

আজকের নিশ্চিন্ত রাত বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। ভোর হয়েছে। লালশিং ডাকছে। ঘুম চোখে বাইরে এলাম সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে। এখনো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি ভোরের আলো। কনকনে ঠাণ্ডা। হাত-পা জ্বালা করছে। নখের গোড়ায় চামড়া আলগা হয়ে গেছে কেদারের শীতে। ঠোঁট ফেটেছে। হাতে মুখে জল দিতে ইচ্ছে করছে না। কদিনের মধ্যে আরশীতে মুখ দেখিনি। আজই তপ্তকুণ্ডের ধারে চায়ের দোকানের ভাঙা আরশীতে মুখ দেখলাম। দাঁড়ি গোঁফে ছেয়ে গেছে মুখ। মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা। মুখের রং কালো হয়েছে, তার ওপর পোড়া পোড়া দাগ। শীতের দাপটে চামড়া অমসৃণ, খসখসে : নিজের মুখ নিজেরই অচেনা মনে হয়।

ভাঙা আরশীর ওপর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমার চোখের তারায় অন্য এক চেনা মুখের প্রতিবিম্ব। ললিতা। এই ভোরে তপ্তকুণ্ডে স্নান করে এলো। সন্ধ্যায় দেখেছিলাম, আবার প্রত্যুষেও দেখলাম।

ওরা চলে যাবে এখনি। গোছগাছ হয়ে গেছে। শুধু রওনা হতে যতটুকু সময় বাকী। আমারি চোখের সামনে ওরা যাত্রা শুরু করলো। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকালো সে। হাত তুলে শুভেচ্ছা জানালাম—'জয় নারায়ণ'। 'জয় কেদার'—বলে শুভেচ্ছা ফিরিয়ে দিলে।

দোকানের সামনে চায়ের গেলাস হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। চড়াই পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল ললিতা।

চটিতে ফিরে দেখলাম যাত্রার অয়োজন সম্পূর্ণ। কেবল আমার জন্তে যেটুকু অপেক্ষা।

চলার শুরুতেই প্রসাদদার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—জয় বদ্রী বিশাল কী জয়। কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনি জাগলো। ওদিকে দলে দলে আরো যাত্রী চলেছে কেদারনাথের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে। এ-পথে একদল, ওপথে আর এক দল—গৌরীতীর্থ ছেড়ে যে যার পথ ধরে চলেছে।

কিছুদূর এগিয়ে পিছন ফিরে তাকাই। শূন্য চটি খাঁ খাঁ করছে। আবার দিন শেষে ক্লান্ত যাত্রীদল এসে পৌছবে গৌরীতীর্থে। রাত্রির মতো যাত্রীর ভিড়ে জমজম করবে এই পাহাড়ী জনপদ। রাত শেষে আবার যাত্রীদল তাদের একরাত্রির আশ্রয় ত্যাগ করে রওনা হবে চড়াই-উৎরাই পথে।

একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করে পথে সবাই যেন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মুণ্ডকাটা গণেশ পর্যন্ত একই সঙ্গে ছিলাম সকলে। তারপর শোন প্রয়াগের কাছাকাছি পৌছে লক্ষ্য করি, আমরা যে যার মতো পথ চলেছি। যদিও শোন প্রয়াগে পৌছে আবার আমরা একসঙ্গে মিলেছি।

মন্দাকিনীর সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে জটলা করছি। হাসি-ঠাট্টায় মেতেছি সবাই। আশ্চর্য রসিক মানুষ এই প্রসাদদা। মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা ছাড়েন যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

এক সময় পাহাড়ের উঁচুতে পথের দিকে তাকিয়ে প্রসাদদা চুপিস্বরে বলে, —শ্রীমন্ত, ওই ছাখো—শ্রীমতী লাট্টু আসছেন।

—বেশ তো আসুন না। চাপা গলায় বলি—ওতো আপনারই লাট্টু।

—দূর। ও বড়ো দুরন্ত রাধা। বলে প্রসাদদা পথের দিকে তাকায়।

ক্ষণমাত্র পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে—এইরে লাট্টু এসে গেছে। আমি চললাম, বলে প্রসাদদা হন্‌হন্ করে হাঁটতে আরম্ভ করে।

কমলা ওরফে লাট্টু কাছে আসতেই বললাম,—আপনি অনেককাল বাঁচবেন, প্রসাদদা এইমাত্র আপনার নাম করছিল। আপনার সংগে দেখা হলে ভালো হতো।

—কিন্তু কেন বলুন তো?

—বলতে পারবো না। তবে কী এক কথা প্রসঙ্গে উনি আপনার নাম করে বলছিলেন, দেখা হলে ভালো হতো।

—প্রসাদদা—প্রসাদদা, বলে কমলা উচ্চকণ্ঠে ডাকতে আরম্ভ করলো।

প্রসাদদা ফিরে এলো। এসেই বললে,—কী ব্যাপার অমন করে ডাকছেন কেন?

—শ্রীমন্তদা বললেন, আপনি নাকি আমার খোঁজ করছিলেন।—বলে তালমিছরীর টুকরো মুখে পুরলো কমলা।

—হাঁ। প্রসাদদা অনর্গল বলে গেল বানানো কথা।—শ্রীমন্তের খুকখুকে কাশি হয়েছে। তাই বলছিল আদার রস দিয়ে চা খাবে। আমাদের কাছে ওসব আদাটাদা নেই। তখনি আপনার কথা মনে হলো। জানি তো, আপনি হিসেবী মেয়েছেলে—আপনার কাছে আদা থাকা সম্ভব। আছে?

—আদা! একটু ভেবে কমলা বললে,—আছে বোধহয়। সঙ্গে এনেছিলাম মনে হচ্ছে। তবে আদা যে থলিতে রয়েছে, সে তো কুলির কাছে। সে বোধহয় এগিয়ে গেছে। ঠিক আছে, রামপুরে পৌঁছে আদা দেওয়া চা খাওয়াবো।

আমাদের কথার মধ্যে প্রসাদদা কখন যে মাষ্টারমশায়কে নিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে, লক্ষ্য করিনি। আমিও যাবো বলে পা বাড়িয়েছি, কিন্তু বাধা দিল কমলা—একটু বসুন, এক সঙ্গে যাবো।

—ওরা যে চলে যাচ্ছে।

—বেশ তো, আমি আপনি গল্প করতে করতে যাবো।

বোকার মতো বসে রইলাম। সীমা-পূরবীও চলে গেল হাসতে হাসতে। শান্তিলতাও চললেন। সস্ত্রীক রজনীবাবুতো সবার আগেই গেছেন। তাঁরা তো আর নিজের পায়ে চলছেন না। একজন চলেছেন ডাণ্ডিতে, অন্যজন ঘোড়ায়।

দোকানে চা আর লাড্ডুর ফরমাস দিয়ে জমিয়ে বসলো কমলা। চা-টা খাওয়া হয়ে গেল, তবু গল্প শেষ হয় না। আবোল তাবোল গল্প, না-হয় তার অর্থ, না হয় কোন কিছু। কথা বলার ভঙ্গীও বিচিত্র। যেন খৈ ফুটছে মুখে।

শোনপ্রয়াগে নয়, কমলার কথার, গল্পের পূর্ণচ্ছেদ পড়লো রামপুরে পৌঁছে। সারাটি পথ ও এক নাগাড়ে হেঁটেছে, আর কথা বলেছে।

রামপুর পৌঁছে দেখি প্রসাদদা একটি চটির বাইরে বসে হাঁটু চাপড়ে গান ধরেছে,

'যাদু জানো কতো রঙ্গ,
ধান ভানো, গান গাও, বাজাও মৃদঙ্গ।'

আমাকে দেখেই প্রসাদদার এই গানের বহর। বললাম,—প্রসাদদা আমাকে রেখে তুমি চলে এলে কেন?

আসল কথা ভোলেনি কমলা। বললে,—আসুন, আদার রস দেওয়া চা খাবেন না?

—এখন থাক, এতো বেলায় আর চা খাবো না।

—ঠিক আছে, সন্ধ্যে বেলা ফাটায় পৌঁছে খাবেন! কমলা ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললে,—আচ্ছা এখন আর কথা বলবো না: দেখি, কুলিটা কোথায় গেল।

কমলা চলে যেতে প্রসাদদা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—শ্রীমন্ত, তোমাকে সমবেদনা না জানিয়ে পারছি না। এসো। চলো, ধরাচুড়ো খুলে স্নান করতে যাই। একটু ওপরের দিকে উঠলে চমৎকার ঝর্ণা আছে।

রামপুর থেকে ফাটা। মাইল পাঁচেক পথ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে সেই মুখে পথ চলা আরম্ভ। চটিতে যে আরো দুদণ্ড বিশ্রাম নেব, তার উপায় নেই। সময় নিয়ে এ পথে ফাঁকি চলবে না। যতো কষ্ট হোক্, অবসাদ আসুক, তবু যন্ত্রের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতে হবে।

রামপুর থেকে রওনা হয়েছি বেলা পৌনে দুটোয়। দেড় মাইল পথ হেঁটে বদলপুর চটিতে পৌঁছতে তিনটে বেজে গেল। সন্ধ্যের মধ্যে এখনো সাড়ে তিন মাইল পথ হাঁটতে হবে। পথে আর কোন চটি বা আশ্রয় নেই। শুধু মাঝে দু একটি পাহাড়ী গ্রাম, কিছু চায়ের দোকানের চালা দেখা যায়। বদলপুরে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করেছি।

—আর পারছি না শ্রীমন্ত। সামান্য পথ হেঁটেই পূরবী বসে পড়ে পথের ধারে শুকনো ঘাসের ওপর। পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে বলে,—পেশী টন্‌টন্ করছে। আর কমাইল হাঁটতে হবে?

—এখনো কমপক্ষে আড়াই মাইল। ওঠো, এ পথে পা দুটোকে আরাম দিতে চেয়ো না। দুর্বল হয়ে পড়বে।

—একটু বোসো শ্রীমন্ত।

—কিন্তু সবাই যে এগিয়ে যাচ্ছে।

—যাক্। তুমি যাবে না নিশ্চয়? পূরবী ফিরে তাকায় কাতর দৃষ্টিতে। বলে,—সত্যি আজ আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে শ্রীমন্ত। শরীরে একদম জোর পাচ্ছি না।

—এই পাহাড়ী পথে কষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে কি জানো, কষ্ট হচ্ছে হোক, যেতে যখন হবেই, তখন—

—সব বুঝতে পারছি। তবু একটু বোসো।

আমরা বসে থাকতে থাকতে কয়েকদল যাত্রী চলে গেল 'জয় নারায়ণ' 'জয় নারায়ণ' বলতে বলতে। কয়েকদল চড়াই ঠেলে যাচ্ছে কেদারনাথে—তাদের দেখলাম। বিপুল উৎসাহ নিয়ে পথ হাঁটছে। একদল আসছে, একদল যাচ্ছে। আর আসা-যাওয়ার পথের ধারে মরা ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসে আছি আমরা দুজন।

এই একবার নয়, পথে পূরবী আরো বার কয়েক বসলো, বিশ্রাম করলো। সত্যি, ওর চোখ মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারি যে কষ্ট হচ্ছে পথ হাঁটতে। টলতে টলতে যাচ্ছে কোনমতে। পা জড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাকে কিংবা পাথর ধরে টাল সামলাচ্ছে।

সন্ধ্যা নামছে। সূর্য গেছে পাহাড়ের আড়ালে। ওপারে হয়তো আলো আছে, কিন্তু এপারে অন্ধকার নামছে। শূন্য পথ। সামনে পেছনে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় আমরাই সব শেষের যাত্রী।

দূরে ফাটা চটি দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, কাছে—ওই তো ওখানে, কিন্তু পৌছতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যাবে। পাহাড়ী পথের হিসেব করা যায় না। তার ওপর পূরবী যে রকম ঢিমে-তালা ভাবে চলছে, তাতে চটিতে পৌছতে নিশ্চিতই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। রাত হওয়াটাও আশ্চর্য নয়।

—জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ! ফিরে দেখি দুটি ক্রাচে ভর দিয়ে তুলসীদাস আসছে। কাছে এলো তুলসীদাস। দাঁড়ালো। গামছা দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে বললে,—পা নেই, কী যে কষ্ট কি বলবো। আর পেরে উঠছি না, এবারে হয়তো পেছিয়ে পড়তে হবে। একটি পায়ের শক্তিতে আর বোধহয় আপনাদের সঙ্গে চলতে পারবো না। জয় নারায়ণ।

—অতো না হাঁটলেই পারো। সমবেদনা জানিয়ে বলি,—না হয় আরো দশদিন সময় বেশী লাগবে।

—বসে থাকতে পারিনে। বসে থাকলেই মনের জ্বলুনি বাড়ে। একা পথ হেঁটে আসছিলাম, পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে। আপনাদের দেখে একটু শান্তি পেলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে করুণ কণ্ঠে তুলসীদাস বললে, —কী এমন পাপ করেছি বলতে পারেন? তারপর স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে আবার বলে, —জানি না আর কতো কাল এই পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। ভেবেছিলাম, কেদারনাথ দর্শন করে শান্তি পাবো। কিন্তু শান্তি কই? আমি নিজের দুঃখে পাথর হয়ে গেছি, আর ওই কেদারনাথ জগতের দুঃখের ভার বয়ে পাথর হয়ে গেছে। ও পাথরে প্রাণ নেই।

—এই তোমার বিশ্বাস তুলসীদাস?

—হাঁ। তুলসীদাস আত্মগত ভাবে বললে,—বিশ্বাস নিজেই হারিয়ে বসে আছি বাবু।

বাকি পথটুকু আমাদের সংগেই এলো তুলসীদাস। যে গল্প একদিন বলেছে; আজ পথ হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো সেই গল্পই নতুন করে বললে। ওর স্ত্রীর নাম ছিল সতী। সতীকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতো ও। সেই সতীই কিনা পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালালো! পঙ্গু স্বামীর কথা একবার ভেবেও দেখলো না সে। এই তো বিশ্বাস, এইতো ভালোবাসা। এ জগতে ওই দুটি কথা একেবারে মিথ্যে। বিশ্বাস, ভালোবাসা বলে কিছুই নেই।

তুলসীদাসের কথায় পূরবী মন্তব্য করলে,—তুমি ঠিকই বলেছ তুলসীদাস। বিশ্বাস আর ভালোবাসা, ও দুটি কথা অভিধানেই দেখা যায়, জীবনে নয়।

পূরবীর কথা শুনে বিস্মিত হই।—একি তোমার মনের কথা পূরবী!

—হাঁ, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই বলছি।

—কিন্তু অভিজ্ঞতাই সব জিনিয়ের মাপকাঠি নয়।

—যাক্, তর্ক করতে চাই না। তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল না-ও হতে পারে। যদিও কথা শেষ হলো, তবু মন থেকে চিন্তা গেল না। শুধু চিন্তা নয়, সেই সঙ্গে কৌতূহল—পূরবীর জীবনে অভিজ্ঞতার সে ঘটনা কি, যার জন্যে বিশ্বাস আর ভালোবাসার ওপর আস্থা হারিয়েছে সে।

কোনমতে চটিতে পৌছতে পারলেই সে রাতের মতো নিশ্চিন্ত। আর

কিছু না হোক, শরীর তো বিশ্রাম পাবে। সারাদিন পথ হেঁটে মানুষগুলো সব আধমরা হয়ে পড়ে। একটু নড়ে চড়ে বেড়ানোর আগ্রহও থাকে না। শুধু যা হোক, ডাল, ভাত কি রুটি তরকারী খেয়ে শয্যা গ্রহণ করা।

রাত দশটা না বাজতে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুয়েছিলাম। গাঢ় ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাতে। পাশের ঘরে ইনিয়ে বিনিয়ে তারস্বরে কাঁদছে কোনো বাঙালী মেয়ে। সাধারণত কান্নার ভাষা থাকে না, কিন্তু এ কান্নার ভাষা আছে। যে ভাষা অতি কুৎসিত।

শুধু আমি নই, মাষ্টারমশায়ও জেগেছেন। প্রসাদদা এই মাঝরাতেও জপ করছিল, বন্ধ হয়ে গেছে জপ।

—ব্যাপার কি মাষ্টারমশায়? জিজ্ঞাসা করলাম।

—ঝগড়া থেকে কান্না। প্রায় আধঘণ্টা হলো শুনছি।

ঘরের পাশেই ঘর। মাঝে দরজা আছে, কিন্তু কপাট নেই। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অন্ধকার ঘর, কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। একটু রুক্ষ কণ্ঠেই জানিয়ে দিই, এরকম উদ্ভট সুরে কান্নাকাটি না করতে। আমার কথায় কান্না থামলো কিন্তু ফল হলো উল্টো। কে একজন মহিলা ঘ্যানঘেনে গলায় বলে ওঠে—কে তুমি, রাত দুপুরে ঘরে ঢুকতে এসেছো?

এর পরেই টর্চের তীব্র আলো পড়লো মুখে। শুনতে পেলাম নারী কণ্ঠ,—ও সেই সাধু, মেয়েছেলে সংগে না নিয়ে যে পথ হাঁটতে পারে না। ড্যাকরা—কান্না শুনে ওর ঘুম হচ্ছে না। বলে ডাকতে লাগলো—ও চন্দনা—চন্দনা।

—চলে এসো শ্রীমন্ত। মাষ্টারমশায় বললেন,—মিছে কথা বাড়িও না। এসো।

রাতের ঘটনার জের সকালেও চললো। শেষ রাতে ফাটা থেকে যাত্রা করে মৈখণ্ডায় এসে বসেছি একটু বিশ্রাম নেবো বলে, শুনতে পেলাম গত রাতের সেই কণ্ঠস্বর—ও চন্দনা, তোর কান্নায় ওই সাধুর ঘুম ভেঙেছিল।

এদের যেন কোথায় দেখেছি। মনে পড়েছে, গৌরীতীর্থে তপ্তকুণ্ডে এদের সংগে দেখা হয়েছিল।

—আমার মনে আছে বিস্তি মাসি। চন্দনা ভ্রূভঙ্গী করে বললে,—দেখো তুমি যেন ভুলে যেও না।

বিশ্রাম নেওয়া হলো না। যেমন বসেছিলাম, তেমন উঠে আবার হাঁটতে

আরম্ভ করেছি। আমিই এগিয়ে এসেছি সকলের আগে। কী জানি একা চলার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছে আজ।

মৈখণ্ডা পেরিয়ে এসেছি। সামনে বিউঙ্গ চটি। তাও পেরিয়ে এলাম। ভেতা চটি দেখতে পাচ্ছি। কাছেই।

ভেতা চটি, নালা চটি পার হয়ে চলেছি গুপ্তকাশীর দিকে। নালা চটি থেকে এক এক দলকে যেতে দেখলাম উখী মঠের পথে। তারা তুঙ্গনাথ দর্শন করে তবে যাবে বদ্রীনাথ। আশা করে বেরিয়েছিলাম, ওই পথে আমিও যাবো। কিন্তু যাওয়া হলো না এ যাত্রায়।

নানা চটি থেকে উৎরাই পথে নেমে মন্দাকিনী পার হয়ে চড়াই পথে পাহাড়ের বুকে পরম পুণ্যপীঠ উখীমঠ বা উষামঠ। পুরাকালে এখানে বাণাসুরের বাসস্থান ছিল। এখন কেদারনাথের পূজারী বা রাওলের বাসস্থান। শীতকালে এখান থেকেই কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়।

হিমালয়ের বুকে অন্যতম জনপদ এই উখীমঠ। বাজার, ডাকঘর, থানা, হাসপাতাল, ধর্মশালা, সদাব্রত ও ডাকবাংলা আছে। মন্দাকিনীর তীরে উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠ—গাড়োয়ালের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। এছাড়া উখীমঠের অন্যতম আকর্ষণ শিব ও পার্বতীর সুপ্রাচীন মন্দিরটি।

তুঙ্গনাথের আকর্ষণও কম নয়। উত্তরাখণ্ডের অন্যতম তীর্থ বারো হাজার ফুট উঁচু চন্দ্রশিলা পর্বত শিখরে তুঙ্গনাথ মহাদেবের মন্দির। এই চন্দ্রশিলা শিখর থেকে হিমালয়ের পূর্ণাঙ্গরূপ দেখা যায়। তুঙ্গনাথে আকাশগঙ্গা প্রবাহিত। তিন যোজন দূরে মান্ধাতা ক্ষেত্র।

গুপ্তকাশীতে পৌঁছে একটি দোকানে বিশ্রামের জন্যে বসেছি। বেলা সাড়ে দশটা বাজে, ছায়া শূন্য পথে প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে এসেছি। গরম পোষাক খুলে ফেলেছি, সর্বাঙ্গে চিটচিটে ঘাম, তার ওপর একটানা পথ হেঁটে পা দুটিও যারপরনাই অবসন্ন। এখনো হাঁটতে হবে। কুণ্ড চটিতে না পৌঁছনো অব্দি রেহাই নেই। আসার পথে বাসস্ট্যাণ্ডের অফিসে নাম লেখানো আছে, যাতে আজই টিকিট পাওয়া যায়।

আধঘণ্টারও বেশী সময় অপেক্ষা করেছি গুপ্তকাশীতে। তবুও আমাদের দলের কেউ এসে পৌঁছয়নি। আর অপেক্ষা না করে কুণ্ডচটির উদ্দেশ্যে পথ চলতে শুরু করি।

গুপ্তকাশী থেকে কুণ্ডচটি, পথের নির্মাণ কার্য চলেছে। দু এক বছরের মধ্যে এ পথে বাস চলবে আশা করা যায়। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙার কাজ চলছে। সেই সঙ্গে অগণিত মজুর, সারাদিন গাঁইতি চালিয়ে পাথর কাটছে, অপসারণ করছে পাথরের টুক্‌রো। পথের ওপর রাশি রাশি ভাঙা পাথর, সন্তর্পনে চলতে হচ্ছে।

অনেক নীচে নেমে এসেছি। মন্দাকিনীর ধারে ধারে পথ। ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। মাথার ওপর প্রখর সূর্য। পাহাড় ভেঙে উঠেছে। তারপর সেই শেষরাত থেকে এক নাগাড়ে চড়াই-উৎরাই পথে হাঁটা। পেটেও আগুন জ্বলছে। মনের মধ্যে এক চিন্তা, কখন পৌঁছবো কুণ্ডচটিতে।

অবশেষে কুণ্ডচটিতে পৌঁছলাম। ঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা। মন্দাকিনীর এপারে ওপারে দোকান-পাট, চটি, পান্থশালা।

পারাপারের পুলের কাছে একটা চা-খাবারের দোকানে টিনের প্লেট ঝুলছে। তাতে আঁকাবাঁকা বাংলা অক্ষরে কয়েকটি কথা।—'বংগালী ভদ্‌দ্র মহাদয়গণ, এখানে গরম চা, দুধ, বংলা পান, মিঠাই, লাডডু, রোটি, সব্‌জী ইত্‌আদী পাওয়া যায়! অনুগরহ করিয়া আসিতে অগ্‌গা হয়। বিন্‌ইত, ইনদর সিং। সাকিন, কুণ্ডচটি। গাড়োবাল।'

ইন্দ্রসিং-এর দোকানেই বসলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে লাডডু আর দুধ খেয়ে আপাততঃ শূন্য উদরকে শান্ত করি। দলের অন্যেরা আসুক, তারপর যাহোক হবে।

লালসিং কাছাকাছি কোথাও ছিল, দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। তাকে দোকানে বসিয়ে রেখে চলে এলাম নদীর ধারে। যাতায়াতের পথে মন্দাকিনীকে এতো কাছে কোথাও পাইনি। তাছাড়া স্রোতের গতিও এখানে মন্থর। যথেচ্ছ স্নানের আনন্দ উপভোগ করা যায়।

যাওয়া-আসার পথের মানুষ এখানে একত্র মিলেছে। মন্দাকিনীতে স্নানের আনন্দে মেতেছে অগণিত নর-নারী। কতো ধাঁচের, কতো রকমের মানুষ, তার হিসেব নেই। গোটা ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে এখানে, সমবেত তীর্থযাত্রীর সর্বাঙ্গীণ চেহারার মধ্যে। সর্বাঙ্গীণ রূপটি ফুটেছে ভালোই। শুধু একটি দলকে একটু বিসদৃশ ঠেকলো। কয়েকজন নারী-পুরুষ মন্দাকিনীর তীরে পাথরের ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে চা-চক্র বসিয়েছে। যাদের হাসি ঠাট্টা, কথা—সব কিছুর মধ্যে উগ্র আধুনিকতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এ-পথে ওরা যেন একটু বেমানান।

—জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ। ক্রাচে ভর দিয়ে মন্দাকিনীর তীরে নেমে এলো তুলসীদাস। পাশে এসে দাঁড়ালো। পরে আপন মনে হেসে উঠলো।

—কী, অতো খুশী কিসের?

—আজ তো খুশীর দিন। তাই হাসছি। হাসবো না! বলে আবার হেসে ওঠে উচ্চকণ্ঠে। এতোক্ষণে ভালো করে লক্ষ্য করি। কেমন যেন অস্বাভাবিক তুলসীদাসের চাউনি।

পকেট থেকে পাথরের একটা মূর্তি বার করলো তুলসীদাস। অর্ধখোদিত নারায়ণ মূর্তি। আমাকে দেখালো, নিজেও দেখলো অনেক সময় ধরে। তারপর কোথাও কিছু নয়, নারায়ণের অসমাপ্ত মূর্তিটি অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দিল মন্দাকিনীর জলে। ক্ষুধিত পাষাণের পাগলা মেহের আলির মতো চীৎকার করে উঠলো—সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।

—তুলসীদাস, কী হয়েছে তোমার?

—কী আবার হবে? খুশী। বলে একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে কপালে ঠুকতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে ফুলে ওঠে কপাল, রক্তও ঝরে। তারপর দুহাতে সেই রক্ত মেখে পাগলের মতো হেসে ওঠে।

সজোরে চেপে ধরি তুলসীদাসের হাত। জোর করে বসিয়ে রাখি নদীর কিনারে। আঁজলা ভরে জল তুলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিই ক্ষতস্থান। তারপর ওকে নিয়ে আসি ইন্দ্রসিং-এর দোকানে। সেখানে লালসিং-এর সহায়তায় তুলসীদাসের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিই। অচঞ্চল বসে আছে সে। টুঁ শব্দও করছে না। এবারে সুযোগ বুঝে আবার জিজ্ঞাসা করি, কী হয়েছে তার? এমন করছে কেন। উত্তর নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে আমার মুখের দিকে।

কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। কিছুতেই থামে না সে কান্না। ওর কান্না শুনে কৌতুহলী হয়ে আশ-পাশের লোকজন এসে জড়ো হয়েছে।

—তুলসীদাস। মোলায়েম সুরে বলি,—আমিতো তোমার পথের বন্ধু, বলো কী হয়েছে? বলো।

এতক্ষণে কতকটা সহজ হয় তুলসীদাস। বার কয়েক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, কুণ্ডচটিতে পৌঁছে ও দেখতে পেয়েছে তাকে। যে ছিল ওর ঘরণী—সেই সতীকে।

জিজ্ঞাসা করি—কোথায় দেখলে ?

—ওই তো ওখানে, পুলের কাছে। অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে সে আসছিল। প্রথমে চিনিতে পারিনি। চিনতে পারলে কি ভিক্ষের জন্যে হাত বাড়াতুম। —না, না—আমি ঠিক চিনেছি, ভুল আমার হয়নি। বলে এদিক ওদিক তাকাতে আরম্ভ করে তুলসীদাস।—ওইতো, ওই সেই হতভাগিনী।—দেখেছো ?

—কই !

—ওই তো দাঁড়িয়ে আছে, ওই তো সতী।

কৌতূহলী যারা তুলসীদাসের পাগলামী দেখতে ভিড় করেছিল, তাদেরি মধ্যে দাঁড়িয়ে মধ্যবয়সী এক অবাঙালী দম্পতি। 'সতী' নাম শুনে মহিলা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সরে যেতে চাইলেন ভিড়ের মধ্যে থেকে। কিন্তু আগেই-ভাগেই তুলসীদাস এসে দাঁড়িয়েছে তার মুখোমুখি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ভদ্র মহিলার মুখ। মহিলার বয়স হয়তো চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু দেহের সৌষ্ঠব থেকে এখনো তারুণ্যের জৌলুস নিঃশেষে মুছে যায়নি। মহিলার সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুর। পরনে ডুরে পাড় ছাপা শাড়ি। অঙ্গে নানা ধাঁচের অলংকার।

মহিলা একটু বিব্রত বোধ করছেন। মাঝে মাঝে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন স্বামীর মুখের দিকে। স্বামী ভদ্রলোকের অস্বস্তিটাও সহজে অনুমান করা যায়।

—চিনতে পারছো সতী ? তুলসীদাসের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো।

—না। মহিলার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সলজ্জকণ্ঠে বললেন,—তুমি যাকে খুঁজছো, তার নামেই আমার নাম। কিন্তু আমি সে নই। আমি কোনদিন তোমার ছিলাম না। আমি যার—তিনি আমার সঙ্গেই রয়েছেন।

তবুও তুলসীদাস অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার কল্পিত সতীর মুখের দিকে। মহিলার ঠোঁটের কোণে মৃদু অথচ করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন,—তোমার স্ত্রী বোধহয় আমার মতো দেখতে ছিল। স্ত্রীকে তুমি খুব ভালোবাসতে, না ? তারপর সেই স্ত্রী তোমাকে ত্যাগ করে চলে যায়, এই তো ? সত্যি বলছি, তোমার মতো স্বামীকে ত্যাগ করে যে স্ত্রী চলে যায়, সে নারী হতভাগিনী।

মহিলার চোখের কোণে জল দেখা দিল। তুলসীদাসের মুখের দিকে চেয়ে

অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে স্বামীকে বললেন,—চলো আমরা যাই। বেচারা আমাকে দেখে যদি ওর দুঃখ ভুলতে পারতো, যদি ওর হারানো স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারতো—তাহলে ওর দুঃখটা আমার প্রাণে বাজতো না। সত্যি ও পাগল না হয়ে যায়।

আমাদের দলের আর সকলে যখন কুণ্ড চটিতে পৌছলো তখন বেলা দেড়টা। পূরবী আর সীমা দস্তুরমতো কাহিল হয়ে পড়েছে। ইন্দ্রসিং-এর দোকানে এসেই ওরা শুয়ে পড়লো কাঠের পাটাতনের ওপর।

প্রসাদদা আর মাষ্টারমশায় এখানে এসেই গেছেন বাস কোম্পানীর টিকিট ঘরে। ফিরে এলেন টিকিট নিয়ে। তিনটের সময় যে বাস ছাড়বে, সেই বাসেই যেতে হবে আমাদের। সুতরাং এখনি তৈরী হয়ে নাও।

আজ খাওয়া দাওয়া যেমন তেমন। ইন্দ্রসিং-এর দোকানেই বসেছি চক্রাকারে। শুকনো রুটি আর সব্জি। শেষ পাতে দু'চামচ করে চিনি। শ্রীমতী রজনীর বাক্সে দু'শিশি আনারসের জেলি ছিল, বাক্স খুলে দেখলেন শিশি দুটি ভেঙে গেছে। কাপড় চোপড়ে জেল মাখামাখি। শ্রীমতী রজনী কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থা দেখে চোখ কপালে তুললেন। মনে হয়েছিল, খুবই হৈ চৈ করবেন শ্রীমতী। কিন্তু শুধু আপশোষ করেই ক্ষান্ত হলেন।

মাষ্টারমশায়ের কুলি হন্তদন্ত হয়ে এলো। বাস এখনি ছাড়বে। পৌনে তিনটেয়। রুদ্রপ্রয়াগের বাসগুলো পৌছে গেছে, এখনি গেট খুলবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোতে হলো। শ্রীমতী রজনীর বিষম লাগলো জল মুখে দিতে। দারুণ বিষম। মুখের জল মাথায় ঢালতে হলো।

সীমা বললে,—বৌদি তোমার নাম করছে মা।

শ্রীমতী রজনী কটমটিয়ে তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে।—এখন রঙ্গ ভালো লাগছে না। চল, ওদিকে আবার বাস ছেড়ে না যায়।

'জয় বদ্রী বিশাল কী জয়' হাজার হাজার কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠলো। রুদ্রপ্রয়াগগামী বাসগুলো ছাড়ছে একের পর এক। সামান্য পথ যেতেই দেখা হলো তুলসীদাসের সংগে। হেঁটে যাচ্ছে সে। চলমান বাসের পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাদের ধার ঘেঁষে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে ডাকি তুলসীদাসকে। বাসের ঘর্ঘর আওয়াজে ওর কানে পৌছয়নি আমার কণ্ঠস্বর।

সীমা বসে ছিল খাদের দিকে। খাদ দেখতে ভয়, তাই উঠে এলো এদিকে।

সীমার জায়গায় বসেছি আমি। অসমতল পার্বত্য পথের ওপর দিয়ে বাস চলেছে ধুলো উড়িয়ে। চন্দ্রপুরা, অগস্ত্যমুনি পেছনে রেখে চলেছি রুদ্রপ্রয়াগের পথে। সূর্যের তীর্যক আলো এসে বিঁধছে গায়ে। সেই আলোয় বাসের ভিতরেও দেখছি ধুলিকণার ঘূর্ণি।

—জল আছে শ্রীমন্ত? শ্রীমতী রজনী শুকনো গলায় বললেন,—দাও তো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। ওই শুকনো দাঁত ভাঙা রুটি খাওয়া, বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

জলপাত্র দিলাম শ্রীমতী রজনীর হাতে। চলতি বাসে ঝাঁকুনির মধ্যে আলগোছে জল খাওয়া দায়। মুখে জল ঢালতে সারা গায়ে ছিটিয়ে পড়লো। বললাম,—চুমুক দিয়ে খান। দোষ হবে না।

—না বাবা। শ্রীমতী রজনী বললেন,—তার চেয়ে তুমি ঠিক করে ঢেলে দাও তো আমার মুখে।

জলপাত্র সকলের কাছেই আছে। কিন্তু জল নেই। কুণ্ড চটিতে এসে কেউ-ই জল ভরে নেয়নি। ভুলে গেছে তাড়াতাড়িতে। শ্রীমতী রজনীর তৃষ্ণা মিটেছে। পূরবীরও জলের প্রয়োজন। কিন্তু সে-ও আলগোছে জল ঢালতে পারলো না মুখে। জল ঢেলে দিতে ফ্যাসাদ হলো। হেসে ফেললো পূরবী। মুখের জল ছড়িয়ে পড়লো আমার গায়ে।

—কী ছেলেমানুষী করছিস্। শান্তিলতা বললেন,—ত্যাখ, শ্রীমন্তর জামা কাপড় ভিজে গেল।

সামান্য কথা। এই কথাতেই রাঙা হয়ে উঠলো পূরবীর মুখ। জল খেলো না। আঁচলে মুখ মুছে হেঁট হয়ে সীমার দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলো। সেই একভাবে বসে থেকে মুখ তুললো রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে।

যাত্রাপথে অলকানন্দা-মন্দাকিনী সঙ্গমের ওপরে সচ্চিদানন্দ আশ্রমে উঠেছিলাম, এবারেও ভাগ্যগুণে স্থান পেয়েছি সেখানে। তবে অন্য একটি প্রশস্ত ঘরে।

কদিন পর—দিন তারিখের হিসেব নেই, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সীমান্ত খুঁজে পেয়েছি। সেই মানুষের পৃথিবী।

অজস্র মানুষের ভিড়ে রুদ্রপ্রয়াগ সরগরম। চটি, ধর্মশালা, হোটেল—কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। দোকানে, বাস কোম্পানীর ছাউনীতে, গাছতলায়, মন্দির অঙ্গনে, সর্বত্র যাত্রীর ভিড়।

যাওয়া-আসার পথের যাত্রীরা মিলেছে এখানে। যতো মানুষ এসে পৌঁছেচে, ততো মানুষ এখান থেকে যেতে পারছে না। হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ থেকে যে সংখ্যক বাস আসে, সে অনুপাতে কুণ্ডচটি ও শ্রীনগর পিপলকুঠিগামী বাসের সংখ্যা কম।

আশ্রম থেকে বাইরে এলাম। মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে এসেছি এপারে। ওপারে যতো মানুষ, এপারেও ততো। সন্ধ্যা হতে রুদ্রপ্রয়াগের জৌলুষ আরও বেড়ে যায়। দোকানে, হোটেলে, জ্বলে ওঠে হ্যাজাকের আলো। আশপাশের বাড়ীগুলোর কতক কতক যাত্রী নিবাস হয়ে উঠেছে।

এ অঞ্চলের লোকের এখন মরশুম। যে যেভাবে পারে দুপয়সা আয়ের চেষ্টা করছে। যাই হোক্ এসব দেশে ঠকাবার মানুষ নেই।

এপারে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে একটি আধুনিক ধাঁচের রেঁস্তোরা। নাম 'টুরিষ্ট কাফে'। খরিদ্দারের মনোরঞ্জনে চেষ্টার ত্রুটি নেই। রেঁস্তোরায় ঠাসা ভিড়। একটি চেয়ার খালি না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম।

এখানে দেখা হলো একদল বিদেশী পর্যটকের সঙ্গে। হিমালয়ে হিন্দুদের তীর্থস্থান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা এদের উদ্দেশ্য। শুধু কেদার-বদ্রী নয়, উত্তরাখণ্ডে যতো তীর্থ আছে, সবই দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই এরা পর্যটনে বেরিয়েছে।

রেস্তোরাঁর বাইরে এসেই দেখি শুভলক্ষ্মী পিল্লাইকে। দাঁড়িয়ে কমলালেবুর খোসা ফেলছে সে। আজ নতুন ধাঁচে শাড়ী পরেছে। বাঙালী মেয়ের মতো। গায়ে বাদামী রঙের স্কার্ফ। কটি রক্ত গোলাপ খোঁপায় গোঁজা। মুখে প্রসাধনের সুস্পষ্ট চিহ্ন। রেস্তোরাঁর উজ্জ্বল আলোয় ওর নাকছাবির পাথরটি জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শুভলক্ষ্মীই স্মরণ করিয়ে দিলে আজকের দিনটির কথা। পঁচিশে বৈশাখ। কবি-সম্রাটের শততম জন্মজয়ন্তী। রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগিনী এই দক্ষিণী ললনা শুভলক্ষ্মী। চলনে বলনে কতকটা রাবিন্দ্রীক। বললে,—আজ তোমার আবৃত্তি শুনবো।

—নিশ্চয়ই শোনাবো। নইলে তোমার সঙ্গীত দক্ষিণা যে পাবো না। চলো।

একটু তফাতে নির্জন টিলার নীচে এসে বসি দুজনায়। একটি নয়, পরপর রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাই শুভলক্ষ্মীকে। এবারে ওর গানের পালা। কিছু বলতে হলো না, শুভলক্ষ্মী গাইলো—

'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে।'

শুভলক্ষ্মীর দরদী কণ্ঠের গান শুনে তন্ময় হয়ে পড়ি। গান শেষ হয়ে গেছে, তবু তার সুরের রেশটুকু বাজছে আমার কানে। সত্যি, 'আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে।'

এই সন্ধ্যা রাত। নির্জন টিলার পাদদেশ। আর দুজনের নীরব মুহূর্ত। তবু যেন মুখর হয়ে উঠছে এই মুহূর্ত। নীরব মনেরও ভাষা আছে। মৌন সে ভাষা। মনে মনেই শোনা যায়।

—শ্রীমন্ত। শুভলক্ষ্মী অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলো।

—কিছু বলবে ?

—না, কী আর বলবো। বলে শুভলক্ষ্মী চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

রাত নামছে রুদ্রপ্রয়াগে। রাত নামছে পাহাড়ের দেশে। পাহাড়তলীর গ্রামে গ্রামে। দূরে কোথাও পাহাড়ী কুকুরের দল ডাকছে। এ পারের পাহাড়ে তার গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি।

সেই থেকে বসে আছি নির্জন টিলার পাদদেশে। এই রাত, এই অন্ধকার,—যেন আমাদের দুজনকে সম্মোহিত করেছে কোন্ মন্ত্রবলে। মনে হয়, শেষ হয়ে যাক্ এ রাত। এই নির্জনে নিঃশেষ হয়ে যাক একটি রাত। শুধু জেগে থাকুক দুটি মন, দুটি হৃদয়।

—শ্রীমন্ত। চলো ফিরে যাই।

—আরো একটু বোসো শুভলক্ষ্মী। এই নিসর্গশোভা কি তোমার ভালো লাগছে না ?

—তবু যেতে ত হবেই। মানুষ বড়ো অসহায় শ্রীমন্ত। শুভলক্ষ্মী মৃদু হেসে বলে,—ওঠো।

—না, আরো কিছুক্ষণ বোসো।

—লাভ কী ?

—ভালো লাগছে তাই বললাম।

—ভালো কি আমারো লাগছে না। শুভলক্ষ্মী উঠে দাঁড়ালো,—এসো, এখনো দিন বাকি আছে। সব ভালো লাগা মুহূর্তগুলো আজই শেষ কোরো না।

এই রাতের প্রথম প্রহরের কাব্যে পূর্ণচ্ছেদ টেনে ফিরে চলি দুজনায়।

শুভলক্ষ্মী বিদায় নিলে অলকানন্দার এপার থেকে। এপারেই একটি হোটেলে উঠেছে ও।

শুভরাত্রি। বলে বিদায় নিয়ে আমিও অলকানন্দার পুল পেরিয়ে অন্ধকারে পথ চিনে চিনে এলাম সচ্চিদানন্দ আশ্রমে।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার ঘর। কে কোথায় শুয়েছে জানি না। শোবার সময় মাথার কাছে টর্চ রেখে দিই। আজ ভুলে গিয়েছিলাম। একবার মনে হলো প্রসাদদাকে ডাকি। কিন্তু না। সারারাত বসে জপতপ করে হয়তো এইমাত্র ঘুমিয়েছে।

সেই অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে দেওয়াল ধরে ধরে সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে আসি। আমাকে আলো দেখাবে বলে চাঁদ এখনো জেগে রয়েছে। শেষ প্রহরের চাঁদ। যেন কিছুটা বিষণ্ন।

বাইরে বেরিয়ে আর ঘরে ফেরা হলো না। পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি সঙ্গমের ঘাটে। বসি সিঁড়ির একপ্রান্তে।

জ্যোৎস্নার চন্দন মেখে রাত হয়েছে রূপসী। কুয়াশার ওড়নার অবগুণ্ঠনে ঢাকা রূপসী রাত্রির মুখ। মৌন রাত্রি। না আছে তার কথা, না আছে ভাষা।

যাদু জানে এই রূপসী রাত্রি। তার যাদুতে সুপ্তিমগ্ন এই বিশ্ব চরাচর। সকলের অগোচরে দিবস-প্রিয়র কাছে অভিসারে যাবে বলে যাদুর মায়ায় সকলকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। নিঃসীম দিগন্ত জুড়ে রাত্রির অভিসারের পথ।

বসে আছি। শুধু বসে থেকে স্বপ্নের জাল বোনা। জানি, এই রাত আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না, জানি দিনের আলোর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে সে পারবে না, দিনের আলোর কাছ থেকে সে আত্মগোপন করবে পৃথিবীর অপর গোলার্ধে—তবু রাত্রির কাছে প্রার্থনা, আরো কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করুক।

যে চাঁদ ছিল আকাশপ্রান্তে, সে চাঁদ চলে পড়েছে দূর পাহাড়ের মাথায়। এখনি হারিয়ে যাবে ওই শেষ প্রহরের চাঁদ।

চাঁদ চলে গেল পাহাড়ের আড়ালে। পাহাড়ের ছায়া নিয়ে এলো অন্ধকার। দিনরাতের এই সন্ধিক্ষণে রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

'নমো হরায় দেবায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে।
তাপসায় মহেশায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনে॥'

উদাত্তকণ্ঠে শিব-স্তব আবৃত্তি করতে করতে ব্রাহ্ম মুহূর্তে সঙ্গমে স্নান করতে এলেন কৌপীন পরিহিত এক সন্ন্যাসী।

পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে জল। ঘূর্ণি সৃষ্টি করে দুই নদীর জলধারা একস্রোতে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। সেই জলস্রোতের মধ্যে অনায়াসে নেমে পড়লেন সন্ন্যাসী। অবগাহন স্নান করলেন। তারপর স্রোতের মধ্যে আবক্ষ নিমজ্জিত রেখে জলে জলে পূজা করলেন। পূজা শেষ করে শিবস্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে আবার উঠে গেলেন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে।

সূর্য-স্পর্শে অন্ধকার মুছে গেছে। এখন সকাল। ঘাটে আর আমি একা নই। আরো অনেকে এসেছে, ভোরের আলোয় সঙ্গমক্ষেত্র দেখতে। শুভলক্ষ্মীকে দেখতে পেলাম। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে আলতো পায়ে নীচে নামছে। আমাকে দেখে মুখ টিপে হাসলো। ভোরের আলোর মতো মিষ্টি ওর হাসি।

—শুভ প্রভাত। বলে পাশে এসে বসলো শুভলক্ষ্মী। জিজ্ঞাসা করলে, —কতোক্ষণ বসে আছো?

—অনেকক্ষণ। বলে, শেষরাতে ঘরের বাইরে এসে এখানে বসে থাকার কথা ব্যক্ত করলাম। শুনে শুভলক্ষ্মী না হেসে পারলো না। তারপর ও বললে, —বসে না থেকে চলো বেড়িয়ে আসি।

মন্দাকিনীর ওপারে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ। দুটি বাড়ী দেখা যাচ্ছে গাছপালার মধ্যে। হয়তো গ্রাম আছে ওখানে।

ঝুলন্ত সেতুর ওপর দিয়ে মন্দাকিনী পার হয়ে ওপারের পাহাড়ের পথ ধরে চলেছি। শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে ক্যামেরা আছে। এপার থেকে সঙ্গমের ছবি তুললো। একটি নয়, দুটি।

পায়ে চলা পথরেখা অনুসরণ করে ক্রমশঃ পাহাড়ের শীর্ষে উঠে এলাম। অদূরে একটি পাহাড়ী গ্রাম চোখে পড়লো। পাহাড়ের ঢালুতে কিছু বাড়ীঘর, লোকজন. ফসলের জমি, এই নিয়ে গ্রাম।

যতো কাছে মনে হয়েছিল ততো কাছে নয়। উৎরাই পথে নেমে, পৌঁছতে অনেক সময় লাগলো।

আমাদের দেখে গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কোত্থেকে সব ছুটে এলো। দুচোখে বিস্ময় নিয়ে সবাই আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে-মেয়েরা। টুকটুকে গায়ের রং, আপেলের মতো রাঙা গাল, কামরাঙার

মতো লাল ঠোঁট। কিন্তু ওদের দেহশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেছে অযত্ন অবহেলায়। পরনে ময়লা ছেঁড়া ঘাঘরার মতো পুরুপুরু কাপড়ের জবরজঙ পোষাক। বোটকা গন্ধ ছাড়ছে পোষাক থেকে। পায়ে জমে রয়েছে ময়লা। মাথার চুল রুক্ষ। জট বেঁধে গেছে। দারিদ্রের নির্মম অভিশাপে এরা জর্জরিত।

শুধু ছোট ছেলে মেয়েরা নয়, আশপাশের ক্ষেতে কাজ করছিল যারা, তারাও ছুটে এসেছে। নানা বয়সের নারী-পুরুষ! শুভলক্ষ্মী কয়েকটি ছবি তুললো ওদের। ওরা অবাক হয়ে দেখলে ছবি তোলা।

শুভলক্ষ্মী ওদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করলে। তারপর ছোট শিশুদের হাতে মেঠাই কিনে খাবার জন্যে কিছু পয়সাও দিলে। সব শেষে একটি ফুটফুটে শিশুর চিবুক স্পর্শ করে স্নেহ চুম্বন দিয়ে আমাকে ডেকে বললে,—চলো শ্রীমন্ত, অনেক দেরী হয়ে গেছে।

যে পথে এসেছিলাম, সেই পথেই ফিরছি। কিছু পথ এসে দুজনে একই সঙ্গে থমকে দাঁড়াই। পথের পাশে অগভীর খাদের নীচে দুটি তরুণ-তরুণী কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে মুখোমুখি বসে কথা বলছে।

শুভলক্ষ্মী চুপি স্বরে বলে,—ওদের একটা ছবি নিলে বেশ হতো শ্রীমন্ত—দেখছো ওরা কতো নিবিড় ভাবে বসেছে। মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে ছাখো—বিহ্বল ওর চোখ। বুঝতে পারছো ওর চোখের ভাষা।

—পারছি বৈকি। ওদের ছবি তুমি তুলো না।

—কেন?

—সব কেনর জবাব হয় না শুভলক্ষ্মী। চলো, আমাদের সাড়া পেলে ওদের স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

কিছু পথ নীরবেই এলো শুভলক্ষ্মী। তারপর পাহাড়ী তরুণ-তরুণীর প্রসঙ্গ-সূত্রে বললে,—ওদের জীবনে যা সত্যি, তোমার আমার জীবনে তা অলীক কল্পনা-বিলাসের সামিল। সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবনবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাইতো আমাদের জীবন থেকে জীবন উহ্য হয়ে যাচ্ছে।

—হঠাৎ ও কথা মনে হলো কেন?

—সব কেনর জবাব হয় না শ্রীমন্ত। বলে শুভলক্ষ্মী অদূরে একটি ঝোপের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে,—ওই ছাখো কী সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে।

পথের অদূরে একটি পুষ্পিত লতার ঝোপ। থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে, প্রজাপতির পাখার মতো বহুবর্ণে রঞ্জিত ফুল।

মনের আনন্দে ফুল তুলি। সবৃন্ত ফুল। গন্ধ নেই। রূপ সর্বস্ব। রং আছে, চটক আছে, নেই শুধু সুরভি।

সুরভি না থাক, রূপ তো আছে। সৌন্দর্যই তো রূপে। ফুলগুলি দিতে চাই শুভলক্ষ্মীকে। দিতে চাই ওর আলগা খোঁপায় পরিয়ে। শেষ পর্যন্ত ফুলের আলগা তোড়া শুভলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বলি,—খুশী হয়েছো তো?

—হ্যাঁ। ছোট একটা কথায় জবাব দিয়ে শুভলক্ষ্মী চলতে আরম্ভ করে।

পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছে একটা গাছের ছায়া পেয়ে একটু বসার স্পৃহা জাগলো শুভলক্ষ্মীর। বসলোও,—তারপর ফুলের তোড়া থেকে কয়েকটি শুকনো ফুল তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলতে লাগলো পথের পরিচয়ের কথা। পথে অচেনা অজানা কতো মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু কদিনের এই পরিচয়ের মধ্যে যদি কোন মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা জন্মে থাকে, সে মানুষ আমি। কিন্তু এই পরিচয় ক্ষণিকের, আত্মীয়তাও দুদিনের। ভ্রমণের পালা চুকলে আবার যে যার নির্দিষ্ট ঠিকানায় ফিরে যাবে। তখন হিসেব-নিকেশ চুকে উদ্বৃত্ত থাকবে স্মৃতি। এমন একদিন আসবে, যেদিন স্মৃতির রঙও ফিকে হয়ে যাবে। মানুষের মনেও যে মরচে পড়ে।

বেলা বারোটা। সচ্চিদানন্দ আশ্রমে পৌঁছেই মুখোমুখি হলাম প্রসাদদার।
—তোমার কী কোন আক্কেল নেই শ্রীমন্ত, রাত থাকতে বেরিয়ে এখন ফিরছো। ছিঃ ছিঃ, তুমি মানুষ না কী। যাও, ঘরে যাও। ছাখো গে। বলে প্রসাদদা আমাকে আরো খানিক কথা শোনালো। তারপর হাত ধরে ঢুকিয়ে দিলে ঘরের মধ্যে।—এই যে মূর্তিমান এসেছে।

—শ্রীমন্তদা। সীমা বসেছিল, উঠে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নার সুরে বলে—কোথায় ছিলে শ্রীমন্তদা?

মুহূর্তে ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায়। পূরবী গুম হয়ে বসেছিল, আমার দিকে একবার পলকের জন্যে ফিরে চেয়ে মুখ ফেরালো।

শান্তিলতা বোধহয় বাইরে ছিলেন, আমি এসেছি শুনে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। শ্রীমতী রজনী রান্না করছিলেন, আমি আসার পর থেকে তিনি অনবরত খুন্তি চালাচ্ছেন কড়ায়।

—তোমার শ্রীমন্তদার হারিয়ে যাবার বয়েস আর নেই সীমা। বলে সীমার মাথায় সস্নেহে হাত রাখি।—খুব চিন্তায় পড়েছিলে, না?

—বলি চিন্তায় পড়বে না? শ্রীমতী রজনী খুন্তি আস্ফালন করে বললেন,—সেই কোন রাতে বেরিয়েছো, আর এই এলে। বলে গেলে কেউ ভাবতো না। বুঝলে? সেই সকাল থেকে তোমার খোঁজ করছে মেয়ে দুটো। তুমি কি ওদের কথা একবারও ভেবেছো? সীমা তো কেঁদেই সারা।

—সত্যি সীমা, তুমি বুঝি খুব কেঁদেছো?

—বাঃ, আমি বুঝি একা কেঁদেছি। সীমা সলজ্জকণ্ঠে বললে—রাঙাদিও লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে।

—বেশ করেছে। শ্রীমতী রজনী বললেন,—তুই বড় বেশী বাচাল সীমা।

—ঠিক আছে, আমি আর কোন কথা বলবো না। সীমা আমাকে ছেড়ে পূরবীর কাছে গেল।

—যাও শ্রীমন্ত। তরকারীর কড়া নামিয়ে রেখে শ্রীমতী রজনী বললেন,—স্নান করে এসো। ওঁরাও গেছেন।

—আজও কী লালসিংকে রান্না করতে দেন নি? জিজ্ঞাসা করলাম শ্রীমতী রজনীকে।

—না। তবে লালসিং আমাকে খুবই সাহায্য করছে। এক রকম সে-ই তো সব করে। বলে এঁটো হাত ধুতে গেলেন শ্রীমতী রজনী।

খেতে দিয়ে মুস্কিলে পড়লেন শ্রীমতী রজনী। সীমা ডালমাখা ভাত মুখে দিয়েই বলে উঠলো,—ডালে নুন দিতে ভুলে গেছো মা।

—তা হবে। শ্রীমতী রজনী চচ্চড়ি পরিবেশন করতে করতে বললেন—ভুল-চুক হয় বৈকি সীমা। একটু করে নুন মেখে নাও সব।

চচ্চড়ি মুখে দিয়ে ওই সীমাই আবার বলে ওঠে—নুনে পুড়ে গেছে মা!

—বলিস কী।

—হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা, বড্ড নুন হয়েছে। সীমার কথায় সমর্থন জানায় পূরবী।

—শ্রীমন্তদার কথা ভেবেই মা ভুল করে ডালের নুন চচ্চড়িতে দিয়েছে ডবল করে। সীমা টিপ্পনি কেটে বলে,—নয়তো এরকম ভুল তো মার হয় না। তবে ভালোই হয়েছে, ডাল চচ্চড়ি একসঙ্গে মাখলে সমস্যা মিটে যাবে।

সীমার কথায় আমরা সবাই এক সঙ্গেই হেসে উঠি। শ্রীমতী রজনী গুমরে বলে উঠলেন,—ডেঁপো মেয়ে।

—বাড়ী ফিরেই ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন জ্যাঠাই মা। পূরবী ভাতের গ্রাস মুখে দিয়ে বলে,—ও ডেঁপোমি সেরে যাবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আশ্রম সংলগ্ন শিব-মন্দিরের পাশে অশ্বত্থের ছায়ায় কম্বল বিছিয়ে শুয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ঘুমোবো না। কিন্তু অশ্বত্থের ডালে বসা পাখীর ডাক শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙলো পূরবীর ডাকে। সূর্যদেব তখন পাটে বসেছেন।

—বাব্বাঃ এতো ঘুমোতে পারো? সেই দুপুর থেকে ঘুমোচ্ছো। পূরবী বলে,—চলো বেড়িয়ে আসি।

—বেড়াতে যাবে, কোথায়?

—কাছাকাছি। কাল সকালেই তো চলে যেতে হবে। চল, আজ রুদ্রপ্রয়াগ জায়গাটি একটু ঘুরে ঘুরে দেখে আসি।

—আর কেউ যাবে না।

—না বোধহয়। দুপুরের পর সীমা বেরিয়েছে প্রসাদদার সঙ্গে।

—সেই সঙ্গে তুমিও গেলে না কেন?

—যদি বলি, তোমার সঙ্গে যাবো বলে।

—বলাটা তো দোষের নয়। ঠিক আছে, তুমি বোসো, আমি চোখে মুখে জল দিয়ে এখুনি আসছি।

বেড়াতে যাবো বলে বেরিয়েও কোথাও যাওয়া হলো না। সঙ্গমের ঘাটে বেড়াতে এসে, 'সেই যে কিছুক্ষণ বসবো' বলে বসলাম, তারপর আর ওঠার ইচ্ছে রইলো না। ঘাটের সিঁড়িতেই বসে রইলাম, পূরবী আর আমি।

—কথা বলছো না কেন? পূরবী জিজ্ঞাসা করলে।

—বলবার মতো কথা নেই বলে! পূরবীর মুখের দিকে চেয়ে বলি,—তাছাড়া আজ সন্ধ্যে থেকে মনটা যেন কী রকম ফাঁকা হয়ে গেছে। কিছু ভালো লাগছে না। মাঝে মাঝে এই ভালো না লাগাটা আমাকে পেয়ে বসে। কিছুতে এড়াতে পারি না। হয়তো এও এক রকমের মানসিক ব্যাধি।

—তোমার মনে ব্যাধি হবে—এ যে অসম্ভব শ্রীমন্ত। আর মানসিক ব্যাধিতে যে ভোগে, সে নিজেও সে ব্যাধির কথা স্বীকার করে না। ব্যাধিগ্রস্ত মনে কী কোন বোধ শক্তি থাকে? থাকে না।

কোন কথা না বলে, নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে হাসি।

—হাসছো কেন?

—এমনি নিজের কথা মনে করে হাসি এলো।

—ভাখো, তুমি বড্ড বেশী অহংকারী।

—তা হবে।

—শুধু তাই নয়, তোমার মতো আত্মকেন্দ্রিক মানুষ আমি দেখিনি।

—তাহলে বলো নতুন কিছু দেখলে।

—তুমি কি নিজের কথা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করো না।

—সময় উদ্বৃত্ত থাকলে করি, নয়তো নয়।

পূরবী গুম হয়ে বসে রইলো। ও হয়তো জানে না, এই মুহূর্তে আমি ওর কথাই ভাবছি। বুঝতে পারি না, আজ কেন আমাকে কথা দিয়ে জয় করতে চাইছে ও। কেন আজ ওর কথার সুরে ব্যাকুলতা। তবে কী ও আজ নিজেকে প্রকাশ করতে চায় একজন তীর্থপথিকের কাছে।

—পূরবী। নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু উত্তর এলো না। আবার ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি—পূরবী, আজ কী হয়েছে তোমার?

—কী হলে খুশী হও?

—ত্থাখো, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেন তুমি অনর্থক কথার খোঁচা দিয়ে আমাকে বিব্রত করতে চাইছো।

পূরবী নিরুত্তর।

সেই রাত্রির কথা মনে এলো। যেদিন এই সঙ্গমের ঘাটে বসে রাঙাদি আর সীমার কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। সেই কথাগুলো এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সীমা বলছিল, 'তুমি ভুল করেছো রাঙাদি।' পূরবী বলেছিল, 'ভুল করেই তো মানুষ ভুল শোধরায়।'

যে পূরবীকে দেখছি আজ কদিন, সে তো শুধু বাইরের দেখা। কদিনে অনুভব করেছি, ভিন্ন সত্তার দুই নারী নিয়ে এক পূরবী। যে পূরবীর একজন অহরহ আর একজনের সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। শামুকের মতো আবরণের আড়ালে ও একজনকে গোপন রেখেছে সযত্নে। সে আবরণ ঠুনকো। মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে।

—শ্রীমন্ত, আমার একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দেবে? পূরবীর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ। গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জিজ্ঞাসা করলে,—নিজেকে বঞ্চনা করে কি অপরকে ভালোবাসা যায়?

—না।

না। এই না-এর পেছনে কোন কিন্তু নেই। তবু ওই ছোট একটি কথার জবাব পূরবীর মনঃপূত হলোনা। কিন্তু ওকে আমি কেমন করে বোঝাবো,

আত্মবঞ্চনা করে কোন কিছু করতে চাওয়া বৃথা। স্নেহ, প্রেম, প্রণয়—এসবের মধ্যে আত্মবঞ্চনা চলে না। যেখানে বঞ্চনা সেখানে সবই ভূয়ো। স্নেহ, প্রেম, প্রীতির কথা সেখানে শুধু ফাঁকা আওয়াজের সামিল।

—তবে কেন সবাই বলে আমি ভুল করেছি। এই পৃথিবীতে এমন একজনকেও পেলাম না, যে আমাকে সমর্থন করেছে। পূরবী অকস্মাৎ আমার দুটি হাত চেপে ধরে উতলা কণ্ঠে বলে,—আজ আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে। বলতে হবে। বলতে হবে, আমি ভুল করেছি কিনা?

—তোমার মন কী বলে?

—আমার মন!

একটি কি দুটি মুহূর্ত। তারপর 'আমার মাথা ঘুরছে শ্রীমন্ত'—শুধু এই কটি কথা বলে পূরবী ঢলে পড়ে আমার কোলের ওপর। নাম ধরে ডাকি। সাড়া নেই। মূর্ছা গেছে। অস্ফুট গোঙানির শব্দ। চিবুকে হাত দিই—চোয়াল চেপে রয়েছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। হাত-পা আড়ষ্ট।

মূর্ছা ভাঙলো প্রায় আধঘণ্টা বাদে। কোনমতে উঠে বসলো পূরবী। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে,—আমার মনের মৃত্যু হয়েছে শ্রীমন্ত।

—এখন ওসব চিন্তা কোরো না। চল বাসায় ফিরে যাই।

—এই সিঁড়ি ভেঙে এখন উঠতে পারবো না! একটু বোসো।

পুরোনো প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ দিলাম না পূরবীকে। হালকা কথায়, গল্পে কিছু সময় অতিবাহিত করে তারপর ফিরে এলাম বাসায়। পূরবীকে এখনো বেশ ক্লান্ত বোধ হচ্ছে! ঘরে ঢুকেই মেঝের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

শান্তিলতা জিজ্ঞাসা করলেন,—কীরে, তোর শরীর খারাপ হয়নি তো?

—না। পূরবী পাশ ফিরে শুয়ে বলে,—আমি ভালোই আছি মা।

পরদিন।

কপালগুণে বাসের টিকিট মিললো। বেলা এগারোটা নাগাদ পিপলকুঠি-গামী বাস ছাড়বে।

কোনমতে স্নানাহার সেরে বাসে ওঠা। ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি হয়ে বসা। তারপর সেই ক্লান্তিকর বাস যাত্রার পুনরাবৃত্তি।

এবারের পথ যেন আরো দুর্গম। যেমন বিপদজনক বাঁক, তেমনি অসমতল সঙ্কীর্ণ পথ। তারপর এতো ধুলো যে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকানোই দায়।

বাসের চাকার সঙ্গে সময়ের চাকাও ঘুরছে। কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছে, তবে সাময়িক যাত্রা বিরতি। এ পথের সর্বত্র 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক'। ওপরের বাস গুলি না পৌঁছনো পর্যন্ত, আমাদের বাস ছাড়বে না।

সকলের সঙ্গে আমিও নেমেছি কর্ণপ্রয়াগে। অলকানন্দার সঙ্গে এখানে পিণ্ডর গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে। অলকানন্দার জলে পিণ্ডর গঙ্গার ধারা আত্ম-বিসর্জন দিয়েছে। অলকানন্দায় মিলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডরগঙ্গা তার নিজের নামটুকুও হারিয়েছে।

কর্ণধন্য কর্ণপ্রয়াগ। মহাভারতের অন্যতম নায়ক কুন্তীপুত্র কর্ণের স্মৃতি বিজড়িত এই সঙ্গমতীর্থ। তাঁরই নামে নাম।

এখানে কর্ণ তাঁর পিতা সূর্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন। এখানে কঠোর তপস্যায় লাভ করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ।

বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে সঙ্গমতীর্থ বেশ কিছু দূরে। আসার পথে.বাসের জানালা দিয়ে দেখেছি মাত্র। সে পুণ্য সঙ্গম তীর্থের ধুলো আর মাথায় দেওয়া সম্ভব হলো না।

এরই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে প্রসাদদা অলকানন্দার জল মাথায় দিয়ে এক শিশি জল ভরে এনেছে। সেই শিশির জল ছিটিয়ে দিলে সকলের মাথায়। বললে,—ব্যাপ্‌টাইজ করে নিচ্ছি।

প্রসাদদার ওই এক বাতিক, মাথায় জল ছিটানো। পথ চলতে দেখেছি, কোথাও ঝর্ণায় জল ঝরছে দেখেই, অমনি জল মাথায় দিতে ছুটলো। তাছাড়া থলে ভরতি করে ছোট ছোট শিশি এনেছে। জল ভরে শিশিতে লেবেল আঁটাও এক বাতিক। ওই জল সঙ্গে নিয়ে যাবে। রেখে দেবে গৃহদেবতা মদন মোহনের সিংহাসনের নীচে।

রুদ্রপ্রয়াগগামী বাস একটির পর একটি পৌঁছলো। তারপর আমাদের বাস চলার ছাড়পত্র পেল।

কর্ণপ্রয়াগ থেকে নন্দপ্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগে সামান্যসময়ের জন্যে বাস দাঁড়ালো। দূর থেকে দেখলাম নন্দ আর অলকানন্দা সঙ্গম।

প্রসাদদাকে ডেকে বললাম,—নন্দপ্রয়াগের জল তো স্পর্শ করা হলো না।

—ধুলো তো মাখছি। জল না হয় নাই-বা স্পর্শ করলাম। জল হলো লিকুইড পুণ্য, আর ধুলো হলো সলিড। বুঝেছো। প্রসাদদার কথায় না হেসে পারলাম না। মাষ্টারমশায়ও হেসে ফেললেন।

ইতিমধ্যে বাস চলতে আরম্ভ করেছে। সংকীর্ণ পথ আরো সংকীর্ণ হচ্ছে। তার ওপর তেমনি ধুলো। সবচেয়ে অসুবিধে আমাদের বাস রয়েছে সবার পেছনে। সমস্ত ধুলোটাই ভোগ করছি আমরা।

প্রসাদদা হাতে তালি দিয়ে নাম গান করছে। রাধাকৃষ্ণের নাম। আরও ক'জন অবাঙালী যাত্রী, তারাও প্রসাদদার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছে, 'জয় রাধে কৃষ্ণ, জয় রাধে কৃষ্ণ—রাধা কৃষ্ণ বল মন।'

দুর্গম পথ অতিক্রম করে চামোলীতে এসে পৌঁছলাম অপরাহ্ণ বেলায়। অলকানন্দার তীরে এই পার্বত্য জনপদ—ছোটখাটো শহরের মতো। রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও বদ্রীনাথের পথের মিলন স্থান। তহশীল আদালত, বনবিভাগের আফিস, কালেক্টারী, পুলিশ চৌকী, হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মশালা ও সদাব্রত, ডাক-তার ঘর, ডাকবাংলো ইত্যাদি সবই আছে এখানে। চামোলীর প্রাকৃতিক দৃশ্যও যারপরনাই মনোরম।

চামোলী থেকে পিপলকুঠি। সামান্য পথ। বেলা চারটে আন্দাজ বাস ছাড়লো চামোলী থেকে। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছলাম পিপলকুঠিতে।

আজকের মতো শেষ হলো ক্লান্তিকর যাত্রার। পাহাড়ের বুকে ক্ষুদ্র জনপদ এই পিপলকুঠি। দোকান-পসার, বাড়ীঘর, লোকজন, ডাকবাংলো, ওঁ বিভাগের অফিস, পুলিশফাঁড়ি—সবই আছে।

ঘরের জন্য বিশেষ খোঁজাখুজি করতে হলো না। বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছেই দোতলায় একটি ঘর সংগ্রহ করা গেল। চমৎকার বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। সামনে পেছনে চওড়া বারান্দা। তাছাড়া বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে হিসাবে ভাড়াও এমন কিছু বেশী নয়, মাথাপিছু আট আনা।

সর্বাঙ্গে ধুলো, স্নান না করলে এ ধুলো যাবে না। এ সময়ে স্নান করাও যুক্তিযুক্ত নয়। ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর হতে পারে। শুকনো গামছা দিয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আর মুখ হাত-পা ধুয়ে যেটুকু স্বস্তি পাওয়া যায়—সেইটুকু। আজ আর রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা না করাই

ভালো। শ্রীমতী রজনী কিন্তু শুনলেন না, তাঁর মত, বসে থাকার চেয়ে রান্না করে সময় কাটানো ভালো।

লালসিং কাঠকুটো তরিতরকারী এনে দিয়েছে। রজনীবাবু রুদ্রপ্রয়াগ থেকে মূলো, বাঁধাকপি আর টম্যাটো কিনে এনেছেন। সুতরাং রাতের ব্যবস্থা যে ভালোই হবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

শ্রীমতী রজনী বসলেন রান্না করতে। প্রসাদদা চৈতন্যচরিতামৃত খুলে বসেছে। তাঁকে ঘিরে আর সবাই। রান্না করলেও শ্রীমতী রজনীর কান আছে এদিকে। যেখানে ভালো লাগছে, বলছেন—ওই জায়গাটা আর একবার পড়ো প্রসাদ।

ঘরে বসে থাকা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। বাইরে এলাম। কাছাকাছি খানিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখে আবার চটিতে ফিরছি। সিঁড়ি পথে উঠতে দেখা হলো বিস্তি মাসির সঙ্গে—কী গো, কেমন আছো? চিনতে পারছো তো? বলে বিচিত্র মুখভঙ্গী করলে বিস্তিমাসি।

কোন কথা না-বলে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠছি, কানে এলো বিস্তিমাসির আরও কথা।—আমায় চিনতে পারবে কেন, চোখ যে অন্ধ হয়ে গেছে আগুনের হলকায়।

সিঁড়িতে উঠতে বিস্তিমাসি, বারান্দায় এসে কমলা ঘোষ। কমলা ময়দা মাখছে বারান্দার কোণে বসে। আমাকে দেখে ও ডাকলো—আসুন দাদা, এবারে চা করবো।

—এখন আর চা খাবো না।

—একটু খান। ফার্স্ট ক্লাশ পাতা চা। এক পাউণ্ড সঙ্গে এনেছিলাম। মাঝে মাঝে মুখ বদলে নিই। আসুন।

কমলা বেশীক্ষণ আসে নি, আমাদের পরে ওরা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রওনা হয়েছে। সন্ধ্যের সময় পৌছতে পারতো, কিন্তু চামৌলী পেরিয়ে বাস বিকল হয়ে যায়, তাই আসতে রাত হয়ে গেছে। চায়ের জল গরম করতে বসে কমলা বলছে আজকের অভিজ্ঞতার কথা। প্রায় তিন ঘণ্টা বাস বিকল হয়ে পড়ে ছিল রাস্তার মাঝখানে। সন্ধ্যার পর ফের বাস ছাড়ে। বিপদজনক পার্বত্য পথে সাধারণভাবে সন্ধ্যের পর বাস চলে না। চলে না কেন কমলা আজ তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছে। কি যে ভয় করছিল তার, বলবার নয়। বারবার মনে হয়েছে, এই বুঝি খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়লো বাস, এই বুঝি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল সব!

বারান্দার এক কোণে আরও দুটি চোখ প্যাট প্যাট করছে। ওকে চিনি। বিন্তিমাসির বোন-ঝি। চন্দনা।

—কাকে দেখছেন? কমলা জিজ্ঞাসা করলে।

—ওই মেয়েটিকে।

—দেখার মতো বটে। মেয়েটি শুনতে না পায় এমন ভাবে কমলা বলতে লাগলো,—ওর সঙ্গে এর আগেও তিনটি রাত কাটিয়েছি। ও যে কী জঘন্য সে কথা বলবার নয়। আরো একজন আছে ওর সঙ্গে, মাসি বলে ডাকে। মাসি না ছাই—

বিন্তি মাসি আসছে দেখে কমলা চুপ করলো। বিন্তিমাসি এসেই বোনঝির কানে কানে ফিস ফিসিয়ে কিছু বলতেই বোনঝি হাসতে আরম্ভ করলে ফিক্ ফিক্ করে। কদর্য হাসি।

—হাসি দেখুন না? কমলা চাপা গলায় বললে,—দেখলে গা জ্বালা করে। একটু পরেই বিন্তি মাসির গলা—অ চন্দনা, কৃষ্ণলীলা দেখেছিস।

—দেখেছি। হাত মুখ নেড়ে চন্দনা বলে,—তুমি ছাখো মাসি। অমন গেরুয়া না পরে একেবারে ধরাচুড়ো পরাই ভালো।

বিন্তি মাসির কোলের ওপর ঢলে পড়ে চন্দনা সুর টেনে বললে,—মাসি, শুধু আমাকেই কেউ দেখলে না। রাধা না হতে পারি, রাধার বাড়ীর ঝি হতে দোষ কি—কী মাসি, কথা বলছো না যে?

মাসি-বোনঝির ধরন-ধারণ দেখে না হেসে পারি না। এ পৃথিবী এক আজব চিড়িয়াখানা।

চা-পানান্তে ঘরে এলাম। প্রসাদদার চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আজ রাতের মতো শেষ হয়েছে। শ্রীমতী রজনীর রন্ধন পর্বও শেষ।

আজ ভরিবৎ করে অনেক কিছু রেঁধেছেন শ্রীমতী রজনী। বাঁধাকপির ডালনা, হিং-বড়ির ঝাল আর টম্যাটোর চাটনী। হিং-বড়ি বাড়ী থেকে এনেছেন উনি।

খেতে বসে গল্প ফেঁদে বসলেন মাষ্টারমশায়। গল্প আর শেষ হয় না। সেই এঁটো হাতেই বসে রইলো সবাই। শেষটা রজনীবাবুর কথায় গল্পে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন মাষ্টার মশায়।

রাত এগারোটা হলো শয্যাগ্রহণ করতে। রাত থাকতে বাস ছাড়বে,

অন্ততঃ পৌনে চারটেয় উঠতে হবে। সুতরাং এই সময়টুকু নিশ্চিন্ত নিদ্রার প্রয়োজন।

সবাই শয্যা গ্রহণ করেছি, শুধু প্রসাদদা জেগে বসে। এক কেদারপুরীতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখেছি। নয়তো প্রতি রাত্রেই প্রসাদদা দুটো আড়াইটে পর্যন্ত জপতপ করেন।

গাঢ় ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাতে। কমলা চীৎকার করছে, চীৎকার করে বলছে,—আমি কারবালা ট্যাংকের মেয়ে, দেখি তোমাদের শায়েস্তা করতে পারি কিনা।

পরক্ষণে শুনতে পেলাম বিন্তি মাসির গলা—ভারী আমার শায়েস্তা করনেওলা খাঁর মেয়ে, তুমি আমাদের শায়েস্তা করবে। বলি, তুমিও পয়সা দিয়ে আছো, আমরাও পয়সা দিয়ে আছি—তুমি থাকবে তোমার মতো আমি থাকবো আমার মতো—

—ভদ্দরলোকের মতো থাকো না কেন। তোমরা রাতদুপুর অব্দি বেলেল্লাপনা করবে, আর আমরা তাই সহ্য করবো? কমলা রূঢ় কণ্ঠে বললে, —ও সব হবে না।

পরক্ষণে শুনলাম অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ—ওসব সহ্য করবো না, গলা-ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দেবো। মাসি-বোনঝি—বলবো আর কী। ছিঃ ছিঃ তীর্থে এসেও নোংরামী।

কথা থেকে ঝগড়া। ঝগড়ার পরিণতি কান্নায়। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে বিন্তি মাসি। এতো সময় মুখ বুঁজে সহ্য করছিলাম, এবারে অসহ্য মনে হলো। দরজা খুলে বললাম—ত্মাখো বাছা, চুপ করো। এখানে আরও মানুষ আছে—ভুলে যেওনা এটা তোমাদের ঘর-বাড়ী নয়।

মাষ্টারমশায় সাতে পাঁচে থাকেন না, বিরক্তিতে তিনিও শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসেছেন। বেশ মিষ্টি স্বরেই বললেন—চুপ করো তোমরা। কান্নাকাটি ঝগড়া ঝাঁটি করতে হয়, ঘরে ফিরে কোরো।

কান্নার রেশ চললো আরো খানিক সময়। তারপর সব চুপচাপ। শুধু কমলা ঘোষকে বলতে শুনলাম—আমি তোমাদের শিক্ষা দেবো। বলে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিলে, সে কারবালা ট্যাংকের মেয়ে।

বাকি রাতটুকু আর ঘুম এলো না চোখে। সবে তন্দ্রা এসেছে এমন সময় রজনীবাবু ডেকে তুললেন সবাইকে।

পৌনে চারটে বাজে। বাস ছাড়বে সাড়ে চারটেয়। কুলিরা মালপত্তর গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। এই অবসরে আমরা বাইরে এলাম। কলতলায় দারুণ ভিড়! কতোক্ষণে যে চোখে মুখে জল দিতে পারবো ঠিক নেই।

এরই মধ্যে চায়ের দোকানগুলো খুলেছে! প্রতিটি দোকানে চা পিয়াসীর ভিড়। একগ্লাস চায়ের জন্যে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়।

কতো চেনা মুখ দেখছি। পরিচয় নেই—তবু মনে হয় যেনো কতো পরিচিত এরা! কতোজনকে হৃষীকেশ থেকে দেখছি। কতো নারী-পুরুষ। শুধু দুচোখের চেনায় এরা পরিচিত!

চটিগুলো শূন্য হয়ে পড়েছে। একরাতের আশ্রয় ছেড়ে চলেছে যাত্রীদল। সকলের মুখে বদ্রীবিশালের নামে জয়ধ্বনি। আর কণ্ঠে কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি!

পিপলকুঠি থেকে যোশীমঠ! উনিশ মাইল পথ, দূরত্ব এমন কিছু নয়। কিন্তু পথ অত্যন্ত বিপদ সংকুল। যে কোন মুহূর্তে চরম বিপর্যয় ঘটতে পারে। একদিকে গভীর খাদ, খাড়াই নেমে গেছে অতল গভীরে। যেখানে বয়ে চলেছে খরস্রোতা অলকা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে বুক দুরু দুরু করে ওঠে। চড়াই পথে যতো উপরে উঠছে বাস, খাদ ততো গভীর হচ্ছে।

এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে চলেছে বাস! পাথর পড়ে পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় মধ্যে এক জায়গায় বাস দাঁড়িয়েছিল। সুন্দর মনোরম এ পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

যে দিকে চাই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। ঘন অরণ্য নয়, পাহাড়ে পাহাড়ে পাইন, ফার প্রভৃতি গাছের অবিন্যস্ত শ্রেণী। মাঝে মাঝে লতা, গুল্ম, ঝোপ। কোথাও অজস্র বনফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ।

মাঝে মাঝে পাহাড়ী গ্রাম নজরে পড়ছে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা চলমান যাত্রীবাহী বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে দেহাতী ভাষায় উল্লাস প্রকাশ করছে। আর কখনও যাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে—'বদ্রী বিশাল কী জয়'।

বেলা সওয়া নটা।

ধুলোর ঝড় উড়িয়ে বাসগুলো পৌছলো যোশীমঠে। হিমালয়ের বুকে এই রমণীয় পার্বত্য শহর। ভারত-সভ্যতার পুণ্যপীঠ। শঙ্করাচার্যের স্মৃতি ধন্য।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হয়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্লাবন থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। শঙ্করের উপনিষদ ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে একটি সুসংবদ্ধ দার্শনিক মতবাদ পরিস্ফুট হয়েছে। এই মতবাদ শঙ্কর-দর্শন নামে পরিচিত। শঙ্কর-দর্শনের মূল কথা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। অর্থাৎ জগতের কোন সত্তা নেই এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। শঙ্কর বলেন, মায়া নামে ভ্রম সংঘটনকারী এক শক্তি আছে, ব্রহ্ম যে শক্তি প্রভাবে জগৎ রূপে প্রকাশিত। মায়া অঘটন পটিয়সী। এবং এক অনির্বচনীয় শক্তি। শঙ্কর আরো বলেন, জগৎ প্রবাহ অনাদি, সুতরাং মায়াও অনাদি। ব্রহ্ম মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বদ্ধ জীবের কাছে এই জগৎ সত্য। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিদ্ তাঁর কাছে জগতের কোন সত্তা নেই, কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য। শঙ্করের এই মতবাদ মায়াবাদ নামে পরিচিত।

মায়াবাদী শঙ্কর ভারতবর্ষে বেদান্ত দর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁর সময়ে হিন্দু সভ্যতা এক নতুন যুগের সূচনা করে।

হিমালয়ের এই পুণ্যপীঠে শঙ্কর প্রতিষ্ঠা করেন জ্যোতির্মঠের। ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের বুকে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত এই মঠের ঐতিহাসিক তাৎপর্যও কম নয়। হিমালয়ের এই পথে তিব্বত ও চীন ভূখণ্ড থেকে অহিন্দু ভাবধারার প্লাবন না আসতে পারে, তারই জন্যে শঙ্কর এই দুর্গম হিমালয়ের বুকে জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই জ্যোতির্মঠ হিন্দু সংস্কৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ।

শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত নরসিংহ এবং জ্যোতিশ্বর মহাদেবও প্রাচীন ভারতের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। অনেকে এই নরসিংহ মূর্তিটিকে এক আশ্চর্য বস্তু বলে মনে করেন। দুষ্প্রাপ্য এই পাথরের মূর্তিটি সত্যিই বিস্ময়কর।

অলকানন্দার অপর পারে বাসুদেব, নবদুর্গা, জ্যোতিশ্বর, রবিশ্বর এবং সীতাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আজও তীর্থপথিকের দল মাথা নত করে করজোরে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে।

যোশীমঠের গুরুত্ব কোন দিক দিয়ে উপেক্ষার নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে যেমন যোশীমঠের গুরুত্ব সমধিক, তেমনি এ অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব। চীন ও তিব্বত সীমান্ত এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। যোশীমঠে তাই ভারতের সেনাবাহিনীর গুরুত্ব পূর্ণ ছাউনী গড়ে উঠেছে।

রমণীয় পার্বত্য শহর এই যোশীমঠ। সুন্দর সুন্দর বাড়ী ঘর, বিশ্রামগৃহ,

বাজার, হাসপাতাল, ডাক ও তার ঘর, বিভিন্ন বিভাগের সরকারী আঞ্চলিক দপ্তর প্রভৃতিতে যোশীমঠ সমৃদ্ধ। শীতকালে এই যোশীমঠ থেকেই বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়।

এখান থেকে একটি পথ নীচে নেমে গেছে অলকানন্দাকে অনুসরণ করে। অন্য একটি পথ চলে গেছে ভবিষ্যবদ্রীর দিকে। ঐ পথই নীতি পাশ হয়ে চলে গেছে তিব্বতের দিকে। কৈলাসগামী যাত্রীগণ এই পথেও কৈলাসে পৌঁছতে পারে। যদিও বদ্রীনারায়ণ হয়ে একটি পথ মানা গিরিপথ খোলিঙ্গমঠ হয়ে এই পথেই এসে মিশেছে।

ভবিষ্যবদ্রী যোশীমঠের আট মাইল দূরে। মনোরম এই পথের মধ্যে কোন চটি বা ধর্মশালা নেই। পঞ্চবদ্রীর মধ্যে অন্যতম এই ভবিষ্যবদ্রী। অনেকে বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন বদ্রীনাথ যাত্রীদের অগম্য হয়ে উঠবে। এবং তখন এই ভবিষ্যবদ্রীই হবে তীর্থ-পথিকের আকাঙ্খিত পীঠ। ভবিষ্যবদ্রীর পথেই পড়ে তপোবন।

যোশীমঠ থেকে উৎরাই পথে নেমে ধৌলী বা বিষ্ণুগঙ্গা যেখানে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে—সেই সঙ্গম ক্ষেত্রের নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুপ্রয়াগ রমণীয় বদ্রীভূমির প্রবেশদ্বার। এই পথ চলে গেছে নারায়ণের লীলা-নিকেতনে।

যোশীমঠ থেকে পায়ে চলা পথ আরম্ভ। তবে বদ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত পথের নির্মাণ কার্য চলছে, হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে ওই পথেও চলবে মোটরবাস।

যোশীমঠ থেকে রওনা হতে বেলা দুটো বাজলো। সন্ধ্যের মধ্যে আট মাইল পথ হেঁটে তবে পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছতে হবে।

'জয় বদ্রী বিশাল কী জয়'। যোশীমঠ থেকে পাকদণ্ডী পথ নেমে গেছে বিষ্ণুপ্রয়াগ সঙ্গমে। অগণিত নর-নারীর মিছিল চলেছে এই পথ ধরে। সকলের মুখেই বদ্রীবিশালের নামে জয়ধ্বনি।

গ্রামের ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে। দু-একটা পয়সা পাবে এই আশায়। ছমাস ধরে চলবে তীর্থযাত্রীর দল—ওরাও এমনি করে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে পথের ধারে। সামান্য একটি কি দুটি পয়সা—তাই পেয়ে ওদের কতো না আনন্দ। না দিলেও মুখভার করবে না।

উৎরাই পথে নামছি। অদূরেই বিষ্ণুপ্রয়াগ। দুই নদীর ধারা মিশেছে। অলকানন্দা আর বিষ্ণুগঙ্গা। দেবর্ষি নারদ এই সঙ্গম ক্ষেত্রে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করে সর্বজ্ঞত্ব বর লাভ করেছিলেন।

বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছতে ভাসমান মেঘ এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে ভাসমান মেঘ পাহাড় ডিঙিয়ে গেল অন্যদিকে।

ঠিক সময়ে আমরা সঙ্গম ক্ষেত্রে পৌঁছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। নইলে এই অতর্কিত বর্ষণে ভিজতে হতো।

সামনে চড়াই। তারপর পুরোনো পথ বন্ধ হয়ে আছে, নতুন পথের নির্মাণ কার্য চলছে। পাহাড়ের গায়ে অস্থায়ী পায়ে চলা পথ। যেমন সংকীর্ণ তেমন অসমতল। কোথাও এতো সংকীর্ণ যে পাহাড় ধরে ধরে চলতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই বিপদ।

নারায়ণের নাম নিয়ে সেই সংকীর্ণ পথে চলেছে তীর্থপথিকের দল। 'জয় নারায়ণ'—এই কথার মধ্যে কী এক শক্তি লুকিয়ে আছে, যে শক্তিতে অশক্ত যাত্রীরাও পথ হেঁটে চলেছে।

কতো নর-নারীকে দেখছি, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, শরীর দুর্বল, অথচ ডাণ্ডি বা কাণ্ডি ভাড়া করার সামর্থ নেই, চলেছে লাঠি ঠুকে ঠুকে দুটি পায়ের ওপর ভরসা করে। কখনো বসছে পথের ধুলো কাদার ওপর, দেহ এলিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। আবার 'জয় নারায়ণ' বলে লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। যে পথিক পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছে, চটি আর কতদূর।

পার হয়েছি বলদেও চটি। লক্ষ্য পাণ্ডুকেশ্বর। এখনও পাঁচ মাইলেরও বেশী পথ হাঁটতে হবে। বলদেও চটি থেকে ঘাট চটি সওয়া তিন মাইল রাস্তা। মধ্যে আর কোন চটি নেই।

এ পথের দৃশ্যও মনোরম, কিন্তু চলার পথ দারুণ বিপদসঙ্কুল। মাঝে মাঝে ঝর্ণার জল পড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পথ। কোন মতে হামগুড়ি দিয়ে পার হতে হয়। জল পড়ে পাথরে শ্যাওলা জমে আছে, একটু নড়চড় হলে পা পিছলে পড়তে হবে প্যাচপেচে কাদা জলের মধ্যে। তার ওপর এ-পথে মালবাহী গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়ার ঝামেলাও বেশী। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে এইসব মালবাহী পশুদের পথ করে দিতে হয়। ডাণ্ডিওয়ালারাও মাঝে মাঝে পেছন থেকে 'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার' বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। হয়তো ডাণ্ডিতে চেপে চলেছেন কোন শেঠ, কোন মহাশয়, কিংবা অশক্ত বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা।

বলদেও চটি থেকে ঘাট চটি। এর মধ্যে কতোজনকে দেখলাম, চলতে

না পেরে পথের ধারে বসে পড়েছে। কতোজন আকুল নয়নে পথ চলতি যাত্রীদের দেখছে আর ক্লান্ত কণ্ঠে বলছে আপন মনে, জয় নারায়ণ।

পথিমধ্যে একজন প্রায় বৃদ্ধ বিচিত্র প্রকৃতির বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। পরনে শতছিন্ন ফুলপ্যান্ট, ওভার কোট, মাথায় সেকেলে শোলার টুপি। হাতে একটি শৌখীন ছড়ি। চোখে নিকেলের চশমার একটি ডাটি নেই, কানের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা। মুখময় খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ। পথের ধারে একটি পাথর খণ্ডের ওপর কম্বল বিছিয়ে বেশ আমিরী চালে বসে আছেন ভদ্রলোক। হাতে আধপোড়া সিগারেট।

—দেশালাই আছে? পাশ কাটিয়ে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক। ব্যাগ থেকে দেশালাই বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিই। সিগারেট ধরিয়ে পরপর কয়েকটি টান মেরে আকাশের দিকে মুখ করে ধোঁয়া ছাড়লেন।—দাঁড়াও, ভাই, একসঙ্গে যাবো।

কম্বল কাঁধের ওপর ফেলে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।—চলো ভাই।

কিছু পথ এসে জানতে চাইলেন আমার নাম ঠিকানা। নাম ঠিকানা শুনে বললেন,—তাহলে তো আমাদের দেশের লোক! আমার বাড়ী কাঁটালপাড়ার ঠাকুরপাড়ায়।

—আমার মামার বাড়ীও কাঁটালপাড়ায়। দাদামশায়ের নাম শুনে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভদ্রলোক বললেন,—তর্করত্ন মশায় আমার পিতৃতুল্য। তুমি তাঁর দৌহিত্র—বহুত আচ্ছা ভাই! বলো 'জয় বদ্রীবিশালকী জয়'।

চুপ করে রইলাম! ভদ্রলোক আমার হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন,—কী ভগবানের নাম নিতে এতো দ্বিধা কেন? তুমি কি নাস্তিক!

—কারো নাম নিতে আমার দ্বিধা নেই। তবে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোন কিছুই নেই!

—তার মানে? সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন,—তুমি আছো, আমি আছি—আর তিনি থাকবেন না, সে কী হয়। তিনিও আছেন। সব কিছুর মধ্যেই তিনি।

—তাই যদি হয়, তবে তাঁর জন্যে এতো মাথাব্যথা কেন? কী দরকার তাঁকে খুঁজে বেড়াবার।

—ছেলে মানুষ, তাই অমন করে বলছো। বয়স হোক, বুঝবে।

ঈশ্বর আছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম- অনু-পরমাণুর মধ্যে তাঁর প্রকাশ। শুধু এই জগতেই তিনি সীমাবদ্ধ নন। তিনি জগতের অতিরিক্ত। তাঁর অনন্ত শক্তির বিকাশ অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে অনন্তকাল ধরে চলবে। 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ'।—ঘাট চটি অব্দি ঈশ্বরতত্ব বোঝাতে বোঝাতে এলেন ভদ্রলোক।

সন্ধ্যে হয়ে এলো প্রায়। ঘাট চটিতে পৌঁছে দেখা হলো দলের অন্যান্যদের সঙ্গে। সকলের মুখেই এক কথা—আজ আর এগানো যাবে না। পাণ্ডুকেশ্বর আরো দু মাইল দূরে। পথে সন্ধ্যা হয়ে যাবে নিশ্চিত, তখন পাহাড়ের পথে চলা বিপদজনক।

ঘাটের এক চটিওয়ালাও বারবার নিষেধ করলে। এখন আর রওনা হওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আমাদেরি চোখের সামনে কয়েকটি দল পাণ্ডুকেশ্বরের পথে রওনা হলো নারায়ণের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে।

'জয় বদ্রীবিশাল কী জয়'—প্রসাদদার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও সমস্বরে ঘোষণা করি, 'জয় বদ্রীবিশাল কী জয়'। তারপর একযোগে ঘাট চটি ছেড়ে পাণ্ডুকেশ্বরের উদ্দেশ্য পথ চলি।

সামনে একটি পাহাড় কেটে তৈরী হচ্ছে পথ। পাথর ধ্বসিয়ে ফেলা হচ্ছে ডিনামাইট দিয়ে। এখনো পাহাড়ের ওপরে কাজ করছে মজুরেরা। পাথর সরিয়ে ফেলছে। অস্থায়ী পায়ে চলা পথ নদীর তীর দিয়ে। সেই পথ দিয়ে যাত্রীদল চলেছে ভয়ে ভয়ে। সকলের দৃষ্টি পাহাড়ের ওপরের দিকে। কখন আলগা পাথর গড়িয়ে পড়বে ঠিক নেই। একজন দেহাতী পথচারীর মুখে শুনলাম, গতকাল পাথর চাপা পড়ে দু জন যাত্রী মারা গেছে। একজন গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে।

বিপদজনক পথটুকু পার হতেই প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগলো। পাণ্ডুকেশ্বর এখনো কতদূর? পথ যেন ফুরোয় না আর। যতো চলেছি, ততোই দীর্ঘ হচ্ছে পথ।

সন্ধ্যা নেমেছে পাহাড়ের দেশে। ফিকে অন্ধকার। অস্পষ্ট পথ রেখা। সামনে পেছনে বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। কোন মতে পথ দেখে এগিয়ে চলা। একই সঙ্গে রওনা হয়েছিলাম ঘাট চটি থেকে। কিছু পথ একসংগে এসে পরস্পরের কাছ থেকে সকলকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

পথের ওপর বসে পড়েছেন শান্তিলতা। দুটি পাথরের ফাঁকে পা পড়ে পায়ের শিরায় টান ধরেচে। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না চেষ্টা করেও। কাতর কণ্ঠে বললেন,—পা সোজা করতে পারছি না শ্রীমন্ত। কী করে বাকি পথ হেঁটে যাবো ?

—চিন্তা করবেন না। বলে হাঁটু গেড়ে বসে শান্তিলতার আহত পায়ের পেশী ম্যাসেজ করতে আরম্ভ করি।

—আহা, করছো কি শ্রীমন্ত, আমার পায়ে হাত দিচ্ছ তুমি ?

—কেন, আমি কী ? চুপ করে বসুন আপনি, দেখুন এখনি অস্বস্তি কেটে যাবে।

—তোমার মাষ্টারমশায় কি এগিয়ে গেছেন ?

—হাঁ। সবাই এগিয়ে গেছেন।

—কিন্তু তুমি সকলের পেছনে কেন ?

—আমি পেছনে থাকতেই ভালোবাসি।

কিছুক্ষণের মধ্যে শান্তিলতার পায়ের অস্বস্তি কেটে গেল। বেশ সহজ ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। শান্তিলতাকে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে এসেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম বিন্তিমাসির গলা।—ও চন্দনা, চন্দনা, আমারে ফেলে রেখে তুই কি সত্যিই এগিয়ে গেলি।

চন্দনার কোন সাড়া শব্দ নেই। অন্ধকারে পথের ধারে দাঁড়িয়ে বিন্তিমাসি একনাগাড়ে চন্দনাকে ডেকে চলেছে।—ও চন্দনা, রাক্ষুসী—বুড়ো মানুষটার ওপর কি তোর দয়ামায়া নেই। তোর কি পাখা গজিয়েছে, ও চন্দনা—

আমাদের দেখে বিন্তিমাসির চীৎকার থামলো। অনুনয় জানিয়ে বললে, —আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। অন্ধকারে কিছু ঠাওর করতে পারছিনে।

শান্তিলতা বললেন,—এসো।

বিন্তিমাসি বোধহয় অন্ধকারের মধ্যে আমাকে চিনতে পারেনি। আমিও ধরা দিলাম না—কী দরকার। ও আসছে আসুক আমাদের সঙ্গে।

পাণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছে প্রথমেই দেখা হলো চন্দনার সঙ্গে। একটি দোকানের সামনে পথ চেয়ে বসেছিল। মাসির অপেক্ষায়। বিন্তিমাসি তো ওকে দেখেই যা না-বলার তাই বললো। চন্দনা সে কথায় কান না দিয়ে বললে, —মাসি তুমি কার সঙ্গে এলে ?

—পথে কী সাথীর অভাব। বলে আমার মুখের দিকে ফিরে চাইলো।—হুঁ।

চন্দনা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে আরম্ভ করে। হেসে গড়াগড়ি যাবার যোগাড়। বিস্তিমাসি দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—হেসে মরছিস কেন মুখপুড়ি, তোর অঙ্গে কি জ্বলুনি ধরলো। আ মরণ।

ওদিকে থাকবার জায়গা হয়েছে একটি নীচের তলার ঘরে। ঘরের মধ্যে একরাশ কাঠকুটো, বেঞ্চি, ভাঙা তক্তাপোশ—এইসব। এছাড়া আর ঘর পাওয়া যায়নি।

আজ পথশ্রমে সকলেই যারপরনাই ক্লান্ত, অবসন্ন। দোকান থেকে পোড়া পোড়া রুটি আর লাড্ডু খেয়েই রাতের আহার শেষ করতে হলো। এই রাতে আর রান্না করতে কার মন চায়। তাছাড়া এতো ছোট ঘর যে রান্নার আয়োজন করাও অসম্ভব।

রাত নটা না বাজতে যে যার শয্যা গ্রহণ করেছে। শুধু ঘরের কোণে প্রসাদদা বসে বসে পাণ্ডুকেশ্বরের ইতিবৃত্ত বলছে। মহারাজা পাণ্ডু মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনমধ্যে ভ্রমণ করতে করতে এখানে এসে এক মৃগরূপী তাপসকে হত্যা করেন। তাপস মৃত্যুকালে মহারাজ পাণ্ডুকে এই বলে অভিশাপ দিয়ে গেলেন যে, স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংসর্গে মিলন মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হবে। শাপগ্রস্ত পাণ্ডু তখন ভগবান বিষ্ণু এবং দেবাদিদেবের নিকট শাপমুক্তির আশায় এখানে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। মহারাজ পাণ্ডুই এখানে নারায়ণ এবং শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সে শিব মন্দিরের অস্তিত্ব এখানে নেই, শুধু দেখা যায় যোগবদ্রী মন্দির অঙ্গনে একটি লিঙ্গ মূর্তি বর্তমান।

এই পাণ্ডুকেশ্বরের নিকটে নদীর ঝুলন্ত সেতু পার হয়েই চলে গেছে লোকপালের পথ। লোকপাল বা হেমকুণ্ডে শিখগুরু গুরুগোবিন্দ সিং পূর্ব জন্মে তপস্যা করেছিলেন বলে কথিত আছে। বৈকুণ্ঠের সদা জাগ্রত প্রহরী জয়া এবং বিজয়া এই লোকপালেই অধিষ্ঠান করেন। শোনা যায় লক্ষ্মণও এখানে কিছুকাল তপস্যায় রত ছিলেন। চোদ্দ হাজার দুশ পঞ্চাশ ফুট ওপরে, মনোরম হ্রদ হেমকুণ্ড যুগ-যুগান্তর ধরে তীর্থ পথিককে আকর্ষণ করছে। এখানে গুরুদ্বার এবং ধর্মশালা আছে।

এ পথে কেউ সূর্য ওঠার অপেক্ষায় থাকে না। তীর্থ পথিকের দিন—রাত থাকতেই আরম্ভ হয়।

'জয় বদ্রী বিশাল কী জয়'। অন্য দিনের চেয়ে আজ যাত্রীদের কণ্ঠস্বর আরও উচ্চগ্রামে বাঁধা। আজই হবে যাত্রার পরিসমাপ্তি। আজই তীর্থ পথিকের দল পৌঁছবে নারায়ণের লীলাভূমি বদ্রী ক্ষেত্রে।

রাতের শেষ প্রহরে যাত্রা শুরু করেছিলাম। পথে ভোর হলো। এ বেলার যাত্রা শেষ হবে হনুমান চটিতে পৌঁছে।

ভোর হয়েছে, কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। গাঢ় কুয়াশায় সব কিছু আচ্ছন্ন। যতো বেলা বাড়ছে, ততো গাঢ় হচ্ছে কুয়াশা। গাড়োয়ালী কুলিদের ধারণা বৃষ্টি নামবে।

কিন্তু যতো কুয়াশা হোক্, তবু আজ যে মনোরম পথ ধরে আমরা চলেছি তার তুলনা নেই। দুধারে পাইন গাছের অরণ্য, সুন্দর লতা, গুল্ম, ঝোপ-ঝাড়। ফুল ফুটে আছে লতায় গুল্মে, ছোট ছোট গাছে। বিচিত্র ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। প্রজাপতি উড়ছে ফুলে ফুলে, পাখীরা গান গাইছে গাছের ডালে বসে। তারই মধ্যে কুয়াশা জড়ানো পথ অনুসরণ করে চলেছে বিচিত্র নর-নারীর মিছিল।

পথিমধ্যে দুটি কিশোর বালককে দেখলাম। চন্দন চর্চিত ললাট, গলায় যজ্ঞোপবীত আর রুদ্রাক্ষের মালা। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। পথের ধারে দাঁড়িয়ে গাইছে—

'বদ্রীনারায়ণ, নারায়ণ, না-রা-য়-ণ,
লক্ষ্মী নারায়ণ, নারায়ণ, না-রা-য়-ণ'

লক্ষ্মী-নারায়ণের নাম গান। অপূর্ব ভাবরস সিঞ্চনে ওই দুটি পংক্তি রূপ পেয়েছে এক অনবদ্য সঙ্গীতে। দুটি পংক্তিই একভাবে গেয়ে চলেছে দুটি কিশোর বালক। সামনে পথের ওপর একটি তাম্রপাত্র। তীর্থ পথিকের দানে সে পাত্র পূর্ণ।

পূরবী বিহ্বল হয়ে শুনছে ওই দুটি কিশোর বালকের নাম কীর্তন। সবাই এগিয়ে গেছে, ওর পা বাড়াবার নাম নেই।

—চলো। পূরবীর পাশে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলি,—সবাই যে এগিয়ে গেছে।

—যাক! পূরবী নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে,—তুমিও যাও না। মিছে দেরী করছো।

যেতে যেতে তবু পিছন ফিরে চাই। পূরবী তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বালক-কণ্ঠের নাম কীর্তন শুনছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি। পাহাড় দেশের আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা

দায়। ক্ষ্যাপাটে আবহাওয়া। ছিল কুয়াশা, তার ওপর হলো মেঘ। কুয়াশা যেন রূপান্তরিত হলো মেঘে।

প্রকৃতির দৃশ্যপট বদলে গেল। দূরের দৃশ্য ঢাকা পড়েছে মেঘে। পাহাড়ের সে ছায়া ছায়া রূপও আর দেখা যাচ্ছেনা।

চলেছি মেঘলোকের মধ্যে দিয়ে। কুয়াশার বিন্দু টপটপিয়ে ঝরছে পাইন গাছের চিকন পাতা থেকে।

বাতাসও এলো সময় বুঝে—ঝড় নয়, বাতাস। সঙ্গে কনকনে শীতের প্রবাহ। থেমে গেছে চলমান মিছিলের কণ্ঠস্বর! সে উল্লসিত জয়ধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু চড়াই পথে উঠতে দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে আপন মনে উচ্চারণ করছে—জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ।

শীতে হাত পা অসাড় হয়ে যাবার উপক্রম। হাতের মুঠিও শিথিল হয়ে আসছে, লাঠি ধরে রাখা দায়। প্রতিটি যাত্রীর চোখে মুখে এক জিজ্ঞাসা—চটি আর কতো দূর?

চটি এখনো অনেক দূর। হনুমান চটির আগে আর আশ্রয় মিলবে না। সামনে পিছনে বেশী দূর দৃষ্টি চলে না। ঘন মেঘের পর্দা টানা।

তীর্থ-পথিকের মিছিল চলেছে। নীরব মিছিল। মাঝে মাঝে কাণ্ডি ও ডাণ্ডিওয়ালার কথা শোনা যাচ্ছে—'হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার'। কখনো মালবাহী পশুদলের রক্ষকও 'হুঁশিয়ার' বলে হাঁকছে।

—মাসি, ও মাসি—সামনের পথ থেকে আর্ত চীৎকার কানে এলো।—মাসি, শিগগির ধরো, মরে গেলাম।

পরক্ষণেই বিন্তিমাসির কথা শুনতে পেলাম—তুই মর না। মরলে আমার হাড় জুড়োয়।

তাড়াতাড়ি ছুটে যাই। আমি আর একজন অবাঙালী সহযাত্রী। গিয়ে যা দেখলাম, শিউরে উঠতে হয়। খাদের ধারে একটি গাছের শিকড় ধরে ঝুলছে চন্দনা। পা দুটি শূন্যে। আর বিন্তিমাসি দুচোখ কপালে তুলে হত-ভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চন্দনা চেষ্টা করছে শিকড় ধরে ওপরে উঠতে। পারছে না। চিন্তা করার সময় কই এ-অবস্থায়। আর দুএক মিনিটের বেশী সময় চন্দনা ধরে রাখতে পারবে না গাছের শিকড়।

তখন—

বিপদের ঝুঁকি নিয়েও চন্দনাকে টেনে তোলা হলো। অবাঙালী সহযাত্রী

ভদ্রলোকের সত্যিই সাহস আছে। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে গাছের শিকড় ধরে কয়েকফুট নীচে নেমে চন্দনাকে তুলে ধরলেন সবল হাতে! আমি শুধু তাঁকে সাহায্য করেছি মাত্র।

বিপদ মুক্ত হয়েও চন্দনা খানিক সময় হতবাক দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—আপনি আমাকে বাঁচালেন।

—আমি নই—বলে সহযাত্রী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললাম,—উনি না থাকলে হয়তো তোমাকে উদ্ধার করা আমার একার পক্ষে সম্ভব হতো না।

ডাণ্ডিওয়ালাকে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াতেই এই বিপদ। পা হড়কে পড়ে যায়। ভাগ্যিস্ শিকড়টা ধরে ফেলেছিল তাই বাঁচোয়া, নইলে যা ঘটতো তা কল্পনা করতেও শিউরে উঠতে হয়।

সহযাত্রী ভদ্রলোক চন্দনার ধন্যবাদ ফিরিয়ে দিলেন। বললেন,—কিছুই করেন নি তিনি। যা কিছু করেছেন, তিনিই স্বয়ং। তারপর, 'জয়নারায়ণ, জয় নারায়ণ' বলতে বলতে এগিয়ে চললেন।

বিনায়ক চটি পেছনে রেখে লামবগড়ের পথে চলেছি। লামবগড় থেকে হনুমান চটি আরো মাইল চারেক দূরে। আজ যেন কী হয়েছে। এই সামান্য মাইল দুই পথ হাঁটতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগল।

লামবগড়ে পৌঁছে চা-পানের প্রত্যাশায় একটি দোকানের সামনে বসেছি। দেখছি পথের দিকে। কতো চেনা-অচেনা মুখ। কেউ লামবগড়ে ক্ষণকাল বিশ্রাম নেবে বসে অপেক্ষা করছে, কেউ অপেক্ষা না করে এগিয়ে যাচ্ছে।

—শ্রীমন্ত। শুভলক্ষ্মী সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কখন এলে?

—এইতো আসছি।

—চা খাবে?

—না! তুমি তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও। চলো—দেখছো না আজকের আবহাওয়া।

—শুধু তাই নয় শুভলক্ষ্মী, সামনে আরো চড়াই পথ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। শুনছি এখান থেকে হনুমান চটির মধ্যে তেমন কোন আশ্রয় নেই আর।

যদিও চলেছি শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে, তবু পেছন থেকে আর একজন আমাকে টানছে। সে পূরবী। ভাবছি, তাকে কী পিছনে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে। সে এখনো এলো না কেন! তবে কী এখনো সে পথে দাঁড়িয়ে কিশোর বালক দু'টির নাম কীর্তন শুনছে।

—কী ভাবছো? শুভলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে।

—আর একজনের কথা ভাবছি। ভাবছি, সে এখনো আসছে না কেন!

—তবে একটু বসো। শুভলক্ষ্মী মৃদু হেসে বললে,—সে আসুক।

—তাকে তুমি চেনো?

—চিনি বৈকি।

পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে মসৃণ একখণ্ড পাথর। তারই ওপর পাশা-পাশি দুজন বসে থাকি পূরবীর অপেক্ষায়।

চোখের সামনে কতো যাত্রীদল চলে গেল, কিন্তু পূরবী এলো না। চন্দনাকেও দেখলাম, বিস্তিমাসির সঙ্গে পথ চলছে। আমাকে দেখে চন্দনা মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালেও, কোন কথা বলে নি। তবে বলার ইচ্ছে ছিল।

বসে থাকতে থাকতে বৃষ্টি নামলো। পাইন বন আলোড়িত হলো ঝড়ো হাওয়ার স্পর্শে। বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে বসে রইলাম পূরবীর আসার পথ চেয়ে।

অবশেষে পূরবীও এলো। সঙ্গে না আছে ছাতা, না আছে বর্ষাতি। সবই আছে কুলির কাছে, সঙ্গে নিতে ভুলে গেছে।

বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে পূরবী। কাঁপছে ওর শীর্ণদেহ তনুলতা। দেহের রক্তের উষ্ণতা নেই তাই অমন করে কাঁপছে। কাঁপছে বিবর্ণ মুখ, হাতের লালচে আঙুলের ডগা নীল হয়ে গেছে। অনুচ্চকণ্ঠে বললে,—আমারই ভুল হয়েছিল শ্রীমন্ত, তোমার সঙ্গে না এসে। হনুমান চটি অব্দি কেমন করে যাবো, তাই ভাবছি। আজ মনে হচ্ছে, এ পথে না এলেই ভালো হতো!

—কিন্তু এসেছো যখন, তখন শেষ পর্যন্ত তোমায় যেতে হবে। বলে পূরবীকে তার ভিজে স্কার্ফটা গা থেকে খুলে ফেলতে বলি।

—এটা ছিল বলেই গায়ের জামা শুকনো আছে। ভিজে স্কার্ফ গা থেকে খুলে ফেললো পূরবী।

শুভলক্ষ্মীর গায়ে ওভারকোট, স্কার্ফ দুইই ছিল। ওভারকোটটি খুলে পূরবীকে দিলো। হাসিমুখে শুভলক্ষ্মীর ওভারকোট পরলো সে। তারপর আমার ছাতার মধ্যে এসে বললে,—আমার জন্যে তোমাদের দুজনেরই কষ্ট হল শ্রীমন্ত।

—তা হোক্। শুভলক্ষ্মীও মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে,—তোমার কষ্ট আমাদের দুজনে না হয় ভাগ করে নিলাম।

পাশা-পাশি পথ চলেছি তিনজনে। হোক চড়াই, তবু স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছি। মেঘ বৃষ্টি আর বাতাস—যতো কষ্টই হোক্, তবু আমরা কষ্টের মধ্যে থেকে আনন্দ-রসটুকু আহরণ করতে করতে সামনের পথ পিছনে রেখে হনুমান চটির পথে অনায়াসে এগিয়ে চলেছি।

—এই মেঘ, বৃষ্টি আর কনকনে বাতাস—পূরবী বললে, তবু আজ বড়ো সুন্দর লাগছে।

—এ পথ তো সুন্দরের পথ—শুভলক্ষ্মী বললে, এ পথে কোন কিছুই অসুন্দর নয় ভাই।

—হাঁ—পূরবী চারদিকে চোখ বুলিয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বললে, কিন্তু আজ আমার এতো ভালো লাগছে কেন বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু এই তুমিই একটু আগে বলেছো, এ পথে না এলেই ভালো হতো।

—ওটা কথার কথা। পূরবী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—আজ আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে শ্রীমন্ত। সবকিছু মনে হচ্ছে রূপ কথার মতো।

—কিন্তু রূপকথা এ নয়। শুভলক্ষ্মী বললে,—এখানে কোন কিছুতে কল্পনার ভেজাল নেই। যা কিছু চোখে দেখছি, অনুভব করছি,—তাই নিয়েই তো এতো ভালো লাগা।

বেলা এগারোটা।

হনুমান চটিতে পৌছে তবে নিশ্চিন্ত। এখানে কয়েকঘণ্টার মতো যাত্রা বিরতি। বিশ্রাম। তারপর আবার সেই পথ। এবেলা পথ চলেছি দুর্যোগের মধ্যে, না জানি এরপর কেমন পথ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

পথ চলেছে তীর্থপথিকের দল। সারাটি পথ মুখর হয়ে আছে নারায়ণের জয়ধ্বনিতে। কিছু পথ উৎরাই-এ নেমে আবার চড়াই পথের শুরু। সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম পথ। বৃষ্টির জলে ভিজে সে পথ হয়েছে পিছল।

খাদের দিকে ফিরে চাইতে ভয় হয়। খাদের গভীরে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। অলকাপুরী থেকে ছুটে আসছে কোথায় যাবে? সমুদ্রে—মহাসমুদ্রে।

অজস্র উপলখণ্ডের বাধা অতিক্রম করে অলকানন্দা ছুটে চলেছে। কানে আসছে তার কলোচ্ছ্বাস। সংগীতের মত মিষ্টি তার ছন্দের ঝঙ্কার।

পাহাড়ের গায়ে, খাদের মধ্যে কত রকমের ফুল ফুটে রয়েছে। বিচিত্র সে ফুলের সমারোহ। কিন্তু একটি ফুল তুলতেও মন চায় না। মনে হয়, থাক। ওরা ফুটে থাক। যে ফোটেনি, সে-ও ফুটুক।

সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। সময়ের সঙ্গে পথও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। তবু প্রতি মুহূর্তের জিজ্ঞাসা—আর কতদূর। কতোক্ষণে দেখবো নারায়ণের নিকেতন।

'বদ্রীনারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ,
লক্ষ্মী নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।'

সুমধুর কণ্ঠস্বর কানে এলো। কে গাইছে এমন করে। পিছনে ফিরে চাই। শুভলক্ষ্মী আসছে। তারই কণ্ঠে ভক্তিরস সিঞ্চিত এই দুটি কলি।

—দাঁড়িয়ো না শ্রীমন্ত। শুভলক্ষ্মী বললে,—চলো। এখন নিজেকে নিজের জন্যেই রাখো।

আরো কিছুদূর। আরো কিছুপথ। তারপর দৃষ্টির দর্পণে প্রতিফলিত হলো নারায়ণের লীলা নিকেতন বদ্রীক্ষেত্র!

'জয় বদ্রী বিশাল কী জয়'—'জয় বদ্রী বিশাল কী জয়'—বারে বারে উচ্চ কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিই।

দূরে নয়নাভিরাম বদ্রীপুরী। শ্রীভগবানের লীলা নিকেতন। অলকানন্দার পশ্চিম তটে নারায়ণ পর্বতের পাদদেশে রমণীয় বদ্রীক্ষেত্র। পূর্বপারে নর-পর্বত। দক্ষিণে ঋষিগঙ্গা। দূরে কাছে তুষারাচ্ছাদিত অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ। নারায়ণ পর্বতের পারে নীলকণ্ঠের ধ্যান-গম্ভীর শিখর আকাশ স্পর্শ করেছে।

মাথা নিচু হয়ে আসে। দুচোখে প্রত্যক্ষ করি আমার ঈপ্সিতকে। মনে হয়, স্বর্গের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন ভক্তের প্রতীক্ষায়।

যুগ যুগান্তর ধরে মর্তের মানুষ ছুটে এসেছে এই পথে। বিপদকে সে মানুষ পরোয়া করেনি, হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ বাধাকে তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে এই পথে। দুঃখের মূল্যে সে মানুষ পেয়েছে অক্ষয় আনন্দ। যে আনন্দ জীবনের দুর্লভধন।

যুগ চলে গেছে নিঃশব্দে, শতাব্দী চলে গেছে যুগের আবর্তে। কতো ঝড়, ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে লক্ষ পথিকের পায়ের চিহ্ন—তবু এ পথ চিরদিনের পথ।

সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এগিয়ে চলেছে নর-নারীর মিছিল। আর চড়াই উৎরাই নয়—সরল পথের ওপর দিয়ে যাত্রীদল চলেছে। আকাশ পরিষ্কার, তবে একেবারে মেঘমুক্ত নয়। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়েছে নীলকণ্ঠের শিখরে পশ্চিমের পর্বত গাত্রে।

কিন্তু একি হলো!

পরিষ্কার আকাশ অকস্মাৎ ঢেকে যায় ঘন কুয়াশার আস্তরণে। অসতর্ক মুহূর্তে শুরু হলো তুষার পাত। পেঁজা তুলোর মত তুষার ঝরছে সারা আকাশ জুড়ে। বর্ষাতি গায়ে দিয়ে তুষারের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে প্রতিটি যাত্রী তৎপর। ছাতা মাথায় দেওয়া অসম্ভব। বিন্দু বিন্দু তুষার পড়ে ছাতা ভরে যাচ্ছে। ধরে রাখা দায়।

পায়ের নীচে মাটি আর নেই। এবার বাকি পথ বরফের ওপর দিয়ে যেতে হবে। দূরে দেখা যাচ্ছে বদ্রীপুরী। তাইতো এই তুষারপাতের মধ্যেও এগিয়ে যেতে পারছে যাত্রীদল দুচোখের সান্ত্বনা নিয়ে।

এদিকে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের আলোর বর্ণচ্ছটা, অন্যদিকে এক নাগাড়ে তুষারপাত। সেই সঙ্গে, নতুন উপসর্গ, ঝড়ো বাতাস। প্রকৃতির—এ-এক বিচিত্র লীলা খেলা।

পুরু বরফের আস্তরণের ওপর সদ্যঝরা তুষার। প্রতি পদক্ষেপেই চিন্তা, পা পিছলে না যায়। আবার কোথাও কোথাও বরফ গলে রয়েছে। পা ডুবে যাবার ভয়। এছাড়া ঘোড়ার খুরের গর্তও লক্ষ্য রেখে চলতে হচ্ছে।

আগে লাঠি ঠুকে দেখতে হচ্ছে বরফ শক্ত আছে কি-না, তারপর পা বাড়ানো। একটু অন্যমনস্ক হবার জো নেই।

কতোজনকে দেখছি, কেউ পা পিছলে পড়ছে বরফের ওপর, কেউ গর্তে পা ফেলে বাপ্‌রে মারে করে উঠছে।

একে প্রচণ্ড শীত, তার ওপর এই তুষারের কামড়, এছাড়া ঝড়ো হাওয়ার আস্ফালন—নারায়ণের এ কী পরীক্ষা শুরু হলো যাত্রীদের নিয়ে। কতো নর-নারী তো নারায়ণের নাম ভুলে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করেছে। কতোজন বরফের ওপর লাঠি ভর করে দাঁড়িয়ে, 'হা নারায়ণ, হা নারায়ণ' করছে।

—বাবা, আমি যে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি নে—অপরিচিতা এক বৃদ্ধার কাতর কণ্ঠস্বর শুনলাম। বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন পথের ধারে। ছাতা বা বর্ষাতি সঙ্গে নেই। শুধু একটি তুলোট কম্বল গায়ে জড়ানো। সর্বাঙ্গ তুষার কণায় ঢাকা। বৃদ্ধা মুখ দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছেন।

—কী হয়েছে আপনার ? জিজ্ঞাসা করেও সাড়া পেলাম না। শুধু শ্বাস টেনে চলেছেন বৃদ্ধা। কি করব ঠিক করতে না পেরে বললাম,—ভুলে যান আপনার কষ্ট হচ্ছে। নারায়ণের নাম করুন।

—না-রা-য়-ণ, না-রা-য়-ণ—বলে বরফের ওপর ঢলে পড়লেন বৃদ্ধা।

পেছনেই আসছিল প্রসাদদা। হন্তদন্ত হয়ে এসে বৃদ্ধার নাড়ি টিপে, বুকে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।—সব শেষ।

—সব শেষ !

কত সহজে সব শেষ হয়ে গেল।

প্রশ্ন করি,—কী হবে প্রসাদদা ?

—কী আবার হবে। চলো।

—উনি পড়ে থাকবেন এখানে ?

—উনি তো চলে গেছেন।

আশ্চর্য মানুষ প্রসাদদা। আমার চোখে জল দেখে বললে,—কাঁদছো কেন। বোকা ছেলে—চলো।

—কিন্তু ভগবানের এ কী অবিচার প্রসাদদা !

—মানুষের আইনে আর ঈশ্বরের বিধানে তফাৎ আছে শ্রীমন্ত। আমার কাঁধে হাত রেখে প্রসাদদা বললে,—ওই বৃদ্ধার জীবন শেষ হলো এইটাই সত্যি কথা। জীবনতো ধরে রাখবার সামগ্রী নয়। বাড়ির পাচিলের চৌহদ্দির মধ্যে একদিন যে জীবন শেষ হতো, সেই জীবন বদ্রীপুরীর পথে শেষ হলো। আমি এই সহজ কথাই বুঝি।

আর দূরে নয়, কাছে। চোখের সামনে বদ্রীনারায়ণের সুরম্য মন্দির।

নারায়ণ পর্বতের পাদদেশে অলকানন্দার পশ্চিমতটে নানা পুষ্প সুশোভিত উপত্যকায় এই বদ্রীনারায়ণের কথা হিন্দুদের প্রাচীন পুঁথি পুরাণে সর্বত্র উল্লেখ আছে। বৃহৎ তরুরাজি বর্জিত এই উপত্যকায় ছোট কণ্টকময় ঝাড় ও বহু ধরনের রঙিন সুগন্ধী ফুলের গাছ দেখা যায়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই উপত্যকা জুড়ে বিচিত্র ফুলের সমারোহ—এই স্থানকে স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত করে তোলে।

এই স্থানের আর এক নাম বদ্রীবন। এই বদ্রীবন নারায়ণের বাঞ্ছিত স্থান। দেবর্ষি নারদ এই বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলেন। এজন্য বদরীক্ষেত্রকে নারদ ক্ষেত্রও বলা হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ এই পথে স্বর্গযাত্রা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রিয় শিষ্য ও সখা উদ্ধবকে বদরীবনে তপস্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বদ্রীবিশালের যে মূর্তি আজও পূজিত হচ্ছে, নারদও এই মূর্তিকে পূজা করেছিলেন।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধগণের হিন্দু বিদ্বেষ কারণে এই মূর্তি কোন এক সময়ে অলকানন্দার গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। তারপর দাক্ষিণাত্যের আদিগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য ভারত পরিক্রমার কালে এই বদরিকাশ্রমে উপনীত হন। ঐশী প্রেরণায় তিনি অলকানন্দার গর্ভ থেকে নারায়ণের মূর্তি উদ্ধার করেন।

বর্তমান এই মন্দিরটি নির্মিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তদানীন্তন গাড়োয়ালের মহারাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শোনা যায়, এই মহারাজা দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে বদ্রীনারায়ণের নামে ধর্ণা দিয়ে পরে দেবতার আশীর্বাদে রোগমুক্ত হন। পরে প্রাতস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ ঐ মন্দিরের পূর্ণ সংস্কার সাধন করেছিলেন। মন্দিরের সুবর্ণ খচিত অংশ রাণী অহল্যাবাঈ-এর কীর্তি নিদর্শন।

'পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল, হেম মন্দির শোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহত নিরমল, শ্রী বদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
শেষ সুমিরন করত নিশিদিন, ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্।
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি, শ্রীবদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, ধনিকর, ধূপদীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয়, শ্রীবদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্॥'

বদ্রীনারায়ণের স্তুতি গান করছে ভক্ত জনেরা। করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত নর-নারী। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে আরম্ভ হলো আরতি। অপূর্ব সে দৃশ্য। নিতান্ত নাস্তিক যে তারও মাথা নীচু হয়ে আসে—মুহূর্তের জন্যে সে ভুলে যায় যে সে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী।

আরতি শেষ হলো। কতক যাত্রী চলে গেল, কতক মন্দিরের অংগনে প্রাংগণে এই শীতের মধ্যেও ভিড় করে রইলো নারায়ণের নির্বাণ রূপ দর্শন করবে বলে।

গীতা পাঠ ও বিষ্ণুর সহস্র নাম আবৃত্তির পর শুরু হলো নির্বাণ দর্শন পর্ব। শুধু পূজারীর একক কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া আর কোন শব্দ ঝংকার নেই। দর্শনার্থীর হৃদয় ভরে যায় এই নির্বাণ দৃশ্য অবলোকন করে। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কেমন যেন আত্মসম্মোহিত হয়ে পড়ে অপেক্ষমান নর-নারী। এই নির্বাণ মুহূর্ত সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের।

মন্দিরের দ্বার আজ রাতের মতো বন্ধ হলো। একে একে সমবেত নর-নারী ফিরে গেল রাতের আশ্রয়ে।

—তুমি যাবে না শ্রীমন্ত? মাষ্টারমশায় ডাকলেন,—এসো—আর বসে থেকে কী করবে।

—চলুন মাষ্টার মশায়। তবু বার বার ফিরে চাই মন্দিরের বন্ধ দ্বারের দিকে। দেবতা বন্দী ওই মন্দিরে, দেবতা মুক্ত ভক্তের অন্তরে।

মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আশ্রয়ে ফিরে এসেছি। বসেছি ঘরের কোণে আপন শয্যাপ্রান্তে। তারপর বদ্রী-নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করেছি সকলের সঙ্গে। কিন্তু কি জানি কেন, আজ এই মুহূর্তে আমি কেমন যেন এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পঙ্গু হয়ে পড়েছি।

মনের পর্দায় শুধু একটি ছবিই দেখছি—পদ্মাসনে উপবিষ্ট নারায়ণ, কানের মধ্যে শুধু একটি সুরই বাজছে—

বদরীনারায়ণ—নারায়ণ—না-রা-য়-ণ,
লক্ষ্মী নারায়ণ—নারায়ণ—না-রা-য়-ণ

সেই একভাবে বসে আছি। জানি না কত রাত হয়েছে। একসময় শুনতে পেলাম প্রসাদদার কথা—অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড় শ্রীমন্ত।

অন্যসময় হলে হয়তো প্রসাদদার কথায় সাড়া দিতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে

একটি কথাও এলো না মুখে। শুধু বাতির আলোয় দেখতে পেলাম প্রসাদদা বিছানা ছেড়ে উঠে আমার কাছেই আসছে।

কাছে এলো প্রসাদ দা। আমার কাঁধে হাত রাখলো। জিজ্ঞাসা করলে, —এমন করে বসে আছো কেন? শুয়ে পড়।

—প্রসাদ দা, আজ আমার মনটা হঠাৎ পঙ্গু হয়ে গেছে কেন বলতে পারো। কী যে ভাবছি, আর কী যে ভাবছি না, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ও কিছু নয় শ্রীমন্ত। শুয়ে পড় তো লক্ষীছেলেটির মতো।

প্রসাদদা এক রকম জোর করেই শুইয়ে দিলে আমাকে। লেপ কম্বলে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়েছি। চোখের সামনে তখনো নারায়ণের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি।

মানস নেত্রে সেই জোতির্ময় মূর্তি প্রত্যক্ষ করতে করতে কখন যে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি সে খবর জানি না।

রাত শেষ হয়েছে।

শুনতে পেলাম বদ্রী নারায়ণের নাম কীর্তন। কোনো নারী কণ্ঠ গাইছে—

'নারায়ণং ভজ নারায়ণং, নর নারায়ণং, বদ্রী নারায়ণম্'

দরজা খুলে বাইরে এলাম। আর সকলে ঘুমোচ্ছে অকাতরে। দোতলার সংকীর্ণ বারান্দায় এসে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে শুনি সুমধুর নাম কীর্তন। ওই একটি কলিই বারবার গাইছে কোন সুরেলা কণ্ঠ। পাশের ঘর থেকে আসছে ওই কীর্তনের সুর। কে গাইছে এমন করে।

গান শেষ হলো। একটু পরেই পাশের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। বেরিয়ে এলো শুভলক্ষ্মী সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে।

—আমি এই ঘরেই ছিলাম শুভলক্ষ্মী।

—আমি জানতাম না।

—এসো নীচে যাই।

—এখনি বাইরে যাবে? রোদ উঠুক।

—এসোই না। অলকার তীরে গিয়ে বসি।

অলকানন্দার হিম-গলিত ধারা ছুটে চলেছে পাথরের বাধাকে তুচ্ছ করে। স্বর্গ দুহিতা অলকানন্দা। একদিকে গোমুখী হতে এক ধারা, অপরদিকে

অলকাপুরী থেকে আর এক ধারা—এই দুই মিলিত ধারা অলকানন্দাগঙ্গা রূপে প্রবাহিত। কিছুদূর এসেই অলকানন্দার সহিত অলকাপৃষ্ঠ থেকে নন্দা এসে মিলিত হয়েছে। তারপর আরও কিছু পথ অতিক্রম করে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী গঙ্গা অলকানন্দায় আত্মনিবেদিতা। এই সরস্বতী গঙ্গার সঙ্গমে কেশব প্রয়াগে বেদ-ব্যাসের তপস্যার আসন।

পুণ্যভূমি বদরিকাশ্রমের ওপর দিয়ে অলকানন্দার অমৃতধারা ছুটে চলেছে। সকল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর যেন অলকানন্দার অপেক্ষায় ছিলেন। স্বর্ণধারা অর্থাৎ কাঞ্চনগঙ্গার ধারা মুখে কুবের তাঁর ঐশ্বর্য নিবেদন করেছেন অলকানন্দায়।

প্রাচীন পুঁথি পুরাণে অলকানন্দা সম্পর্কে অজস্র কাহিনী আছে। অলকাকানন্দার জলধারার সঙ্গে সে কাহিনী ভেসে যায় নি।

সূর্য উঠছে। গাঢ় কুয়াশার জাল ছিঁড়ে সূর্যের আলো এসে পৌঁছেচে। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও অলকানন্দার হিম গলিত ধারায় অবগাহন করছেন কয়েক জন সাধু-সন্ন্যাসী। অলকানন্দার তীরে শিলাসনে বসে সন্ধ্যা-পূজা করছেন গেরুয়াধারী কয়েকজন সাধু।

অলকানন্দার তট থেকে এলাম মন্দিরে। নারায়ণ দর্শনান্তে ফিরে এসেছি ঘরে। এবারে তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করার পালা।

প্রথমেই তপ্তকুণ্ডে স্নান। তারপর পূজারীর হাত দিয়ে বদ্রীনারায়ণের পূজো দেওয়া। পূজান্তে নতুন করে আবার বিগ্রহ দর্শন করে প্রসাদ গ্রহণ। তারপর পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণের জন্যে ব্রহ্মকপালে গমন।

ব্রহ্মকপালের পৌরাণিক কাহিনী এই—দেবাদিদেব শিব এক সময় ব্রহ্মার অতিথি রূপে কিছুদিন ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন। তারপর শিবলোকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ব্রহ্মার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গেলেন। দেখলেন, ব্রহ্মা আপন পুত্রী সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গ লাভের চেষ্টা করছেন। শিব ব্রহ্মাকে নিরস্ত হতে বললেন। শিবের কথায় ব্রহ্মার মন থেকে অসৎ কামনা তিরোহিত হলো না। শিবের ক্রোধ বহ্নি প্রজ্জলিত হলো। সেই ক্রোধের ফলে ব্রহ্মার পঞ্চম শির দেহচ্যুত হয়ে শিবের ত্রিশূলে গ্রথিত হলো। শিব বহু চেষ্টা করেও ব্রহ্মার শির ত্রিশূল চ্যুত করতে না পেরে ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিলেন। ভগবান বিষ্ণু আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনে ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ শিবকে বললেন যে দেবতাগণের তপোভূমি পবিত্র বদ্রী ক্ষেত্র, বহু তপ্ত তীর্থ আছে সেখানে,

সেখানে গেলে শিবের ত্রিশূল থেকে ব্রহ্মার পঞ্চম শির স্খলিত হবে এবং তপ্তকুণ্ডে স্নান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবেন শিব। ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ অনুযায়ী শিব বদ্রীক্ষেত্রে উপনীত হলেন। নারদকুণ্ড অতিক্রমে করে তপ্ত-কুণ্ডে পৌছতেই ব্রহ্মার শির শিবের ত্রিশূল থেকে স্খলিত হয়ে পৃথিবীতে পতিত হলো। তারপর তপ্তকুণ্ডে স্নান করে পাপমুক্ত হয়ে শিব ফিরে গেলেন আপন আলয়ে। সেই থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে ব্রহ্ম কপাল। স্বর্গতুল্য বদ্রীক্ষেত্রে আপন বংশধরের প্রতীক্ষায় মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা নিত্য বাস করেন। এখানে তাঁদের বংশধর কর্তৃক পিণ্ড ও তর্পণ দানে সেই সব আত্মা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

আকাশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু আবহাওয়ার বিচিত্র মতিগতি এখানে। তপ্তকুণ্ডে স্নান করে উঠেছি যখন, তখন ধোঁয়াটে মেঘ জমেছে আকাশে। ব্রহ্মকপালে বসেছি পিণ্ড দানের উদ্দেশ্যে, শুরু হলো পেঁজা তুলোর মতো তুষার বর্ষণ।

পিণ্ডদান করে উঠেছি যখন, তখন সর্বাঙ্গ তুষার ঢাকা। হাত-পা অসাড়। পা বাড়াবার সামর্থও নেই। যেদিকে চাই, যতদূর দৃষ্টি যায়—সব কিছু শুভ্র তুষার চাদরে ঢাকা।

ক'জন গাড়োয়ালী রক্ষী এলো। যাত্রীদের সাবধান করে বলে গেল, ঘরে ফিরতে। এ অবস্থায় বাইরে থাকা মানে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।

তুষারপিচ্ছিল পথ ধরে ঘরে ফিরেছি। বন্ধ ঘর। জানালা দরজা খোলাও চলবে না। হু হু করে তুষার কণা ঘরে ঢুকবে।

বেলা দশটায় শুরু হয়েছে তুষারপাত। সেই অবিরাম তুষার বর্ষণ চললো দুপুর অব্দি। এর মধ্যে কারো নিষেধ না শুনে কয়েকবার বাইরের বারান্দায় এসেছি। দেখেছি তুষারপাতের দৃশ্য। দেখেছি সমগ্র উপত্যকা জুড়ে এক অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ বদ্রীনারায়ণের অন্ন প্রসাদ এলো। পাণ্ডা ধীরেন ভট্ট নিজের হাতে পরিবেশন করলেন। ভাত, ডাল, আলুর তরকারী আর মালপো। খাওয়াদাওয়ার পর মনে করেছিলাম বাইরে যাবো। কিন্তু যাওয়া হলো না। ক্ষণিক বিরতির পর আবার সেই তুষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বিকেল, সন্ধ্যে, রাত—বন্দী রইলাম ঘরের মধ্যে। রাতে ধীরেন ভট্ট এলেন তীর্থ মাহাত্ম্য শোনাতে। আরম্ভ করলেন—

'বহূনি সন্তি তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে।
বদরী সদৃশং তীর্থ ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥'

স্বর্গ-প্রতিম বদরীবন ভক্তবৎসল নারায়ণের অতি প্রিয় স্থান। এখানে নারদাদি ঋষি অধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা শ্রীভগবানের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। নারায়ণ এই বদরীবনের স্বামী।

স্বর্গসদৃশ বদরীবন নারায়ণের লীলা ভূমি। সহস্র বর্ষের সাধনায় যে ফল পাওয়া যায় না, একবার বদ্রী মূর্তি দর্শনে সেই সুলভ ফল লাভ করা যায়। 'কাশ্যাং বৈ মরণান্মুক্তি, বদরীশ মূর্তি দর্শনান্মুক্তি।'

নারদশীলা, গরুড়শীলা, বরাহশীলা, মার্কণ্ডেয়শীলা ও নরসিংহশীলা—এই পাঁচটি নিয়েই পঞ্চশীলা। দেবর্ষি নারদের নামধন্য নারদশীলা। নারায়ণের দর্শন কামনায় এই বদ্রী বনে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন দেবর্ষি। নারায়ণ তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবর্ষির সুমুখে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, হে দেবর্ষি তুমি যে শিলাসনে বসে তপস্যা করেছো, ওই শিলাসনে আমি নিত্য নিবাস করবো। ঐ শিলা স্পর্শে নর মুক্তি পাবে।

দুরাচারী হিরণ্যকশ্যপকে বধ করতে স্বয়ং ভগবান ভয়ংকর নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন। হিরণ্যকশ্যপ বধের পরেও তার নৃসিংহরূপ তিরোহিত হলো না দেখে ভক্তগণ প্রার্থনা করলেন, হে নারায়ণ, তুমি ওই ভয়ংকর মূর্তি ত্যাগ করে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ ধারণ করো এবং কোন অবস্থায় তুমি এই বদরীবন ত্যাগ করো না। ভক্তজনের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ তথাস্তু বলে পুনরায় চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করলেন। আর নৃসিংহরূপী ভগবান তখন থেকে বদ্রীক্ষেত্রে শিলারূপে অবস্থান করছেন।

কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে বিনতার গর্ভে গরুড়ের জন্ম। বিষ্ণু ভগবানের বাহন হবার বাসনায় গরুড় বদরিকাশ্রমের দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্বত শিখরে কঠোর তপস্যায় রত হন। গরুড়ের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান দর্শন দিলেন এবং বরদান করলেন। গরুড়ের পুত পবিত্র নাম ধন্য গরুড় শিলা। যেখানে তপস্যায় ভগবানের দর্শন লাভ হয়।

ত্রেতাযুগে মৃকণ্ড ঋষির পুত্র মার্কণ্ডেয় শিশু বয়সে বদ্রীক্ষেত্রে নারায়ণের তপস্যা করেন। নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে বর প্রার্থনা করতে বলেন। মার্কণ্ডেয়

আনন্দে প্রার্থনা করেন যে, নারায়ণ যেন ভক্ত জীবগণকে মোক্ষ প্রদান করেন এবং শিলাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। মার্কণ্ডেয় শিলা স্পর্শে মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

বরাহশিলার ইতিবৃত্ত এই যে, ত্রেতাযুগে দানবের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেবগণ ভগবানের আরাধনা করেন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দানব বিনাশ-হেতু ভগবান বরাহরূপে আবির্ভূত হন। এবং দানব বিনাশ করে দেবগণের শান্তি ফিরিয়ে আনেন। বরাহ শিলায় শ্রীভগবান আজও অধিষ্ঠিত।

বদরিকাশ্রমে আরো বহু গুপ্ত এবং প্রকট তীর্থ আছে। মাতা মূর্তি, উর্বশী পীঠ, শেষ নেত্র, সনকাদি আশ্রম—বদ্রীক্ষেত্রের নিকটেই অবস্থিত।

বদ্রীপুরী থেকে প্রায় চার মাইল দূরে বসুধারা। দুর্গম পথ। সুউচ্চ পর্বত হতে এই ধারা বায়ুতাড়িত হয়ে অনেক নিম্নে পতিত হচ্ছে। শোনা যায়, পাপীর ওপর এই নির্মল বারি বর্ষিত হয় না।

ভারতের অন্তিম গ্রাম মানা বদ্রীক্ষেত্র থেকে দুমাইল দূরে। এই মানা গ্রামের ওপর দিয়েই কৈলাসের পথ। এখানে সরস্বতী গঙ্গার ভয়ংকর রূপ দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। গিরি সংকটের মধ্যে পাষাণে পাষাণে ব্যাহত হয়ে সরস্বতী গঙ্গা অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে।

বদরীপুরী থেকে বার তের মাইল দূরে সতোপন্থ বা সত্যপথ মহাতীর্থ। এই পথে প্রথমে লক্ষ্মী বন। অবর্ণনীয় এই লক্ষ্মীবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য। তরংগায়িত সবুজ ভূমির চারদিকে চির তুষারাবৃত গিরি শিখর দর্শকের মনকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে অভিভূত করে। মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন স্বর্গারোহণের পথে সতোপন্থ হ্রদের নিকটেই পতিত হয়েছিলেন। এখানে যে ত্রিভুজ শিলাটি বর্তমান, কথিত আছে সেই শিলা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তপস্যার আসন। এখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হলে গিরি প্রাচীরে স্বর্গারোহণের সপ্তস্তর সিঁড়ি দেখা যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই পথেই স্বর্গারোহণ করেন। এখানে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়।

বদ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পাণ্ডা ধীরেন ভট্ট তীর্থের সুফল প্রার্থনা করতে বললেন। যে যেমন পারে দক্ষিণাদি দান করে সংকল্প করে সুফল প্রার্থনা করলে। শুধু বিরত রইলাম আমি। দক্ষিণা দিয়েছি, কিন্তু সংকল্প করে সুফল প্রার্থনা করিনি। কি প্রার্থনা করবো। যা কিছু দেখেছি, শুনেছি, উপলব্ধি করেছি—সেই তো আমার তীর্থের সুফল। নতুন করে আর কী চাইবো—যা আমি চাইলেই পেতে পারি।

রাত্রে বদ্রীনারায়ণের প্রসাদ এলো। পুরী, তরকারী, মালপো আর লাড্ডু জাতীয় মেঠাই। আজ আর সন্ধ্যের পর মন্দিরে যাওয়া হয় নি। আবহাওয়া বাদ সেধেছে।

আহারাদির পর শয্যা গ্রহণ করেছি। তখনো গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত হচ্ছে। শীতও পড়েছে তেমনি। লেপ কম্বল মুড়ি দিয়েও শীত যায় না। আশ্চর্য মানুষ প্রসাদদা, এই শীতের মধ্যেও শুধু একটি কম্বল জড়িয়ে ঘরের কোণে বসে জপ করছে। এতো করে সবাই মিলে বলা হলো, তবু শয্যা গ্রহণ করলে না প্রসাদদা।

কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্॥
পুণ্য শ্লোকো নলো রাজা পুণ্য শ্লেকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্য শ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্য শ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

ঘুমভেঙে শুনি মাষ্টারমশায়ের কণ্ঠস্বর। শয্যায় উপবেশন করে মাষ্টারমশায় আত্মগতভাবে শ্লোক আবৃত্তি করছেন। প্রসাদদা ঘরের কোণে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে মালা জপ করছে।

প্রসাদদা।—ডেকে সাড়া পেলাম না। ভালো করে লক্ষ্য করি, প্রসাদদা জেগে নেই। ঘুমোচ্ছে। বোধ হয় জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে শেষ রাতে। এখনো তুলসীর মালা হাতে ধরা।

আজ শেষ দিন। এবারের মতো যাত্রায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে ফিরে যেতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। কদিন আগে মর্তের ঠিকানা হারিয়ে এসেছিলাম স্বর্গের ঠিকানা খুঁজতে। স্বর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছে আবার ফিরে যেতে হবে পুরনো ঠিকানায়।

আজ রাত আর দিনের সন্ধিক্ষণে মনের একতারায় কোথায় রামকেলী সুর বাজবে, তা নয়—পূরবীর সকরুণ মূর্ছনায় একতারার তার কঁকিয়ে কাঁদছে।—আজ ফিরে যেতে হবে, এই কথা মনে করেই বাউল মনের এই কান্না।

সকাল হয়েছে। ঘরের বাইরে এসেছি। নর পর্বতের ওপার থেকে দিনের প্রথম সূর্য উঠছে। নীলকণ্ঠের তুষারাচ্ছাদিত শিখরে পড়েছে প্রভাত সূর্যের আলো। আকাশ পরিষ্কার। ফিকে কুয়াশা যেটুকু ছিল তাও ধীরে ধীরে উবে গেল।

অলকানন্দার তীরে এসে দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি গলিত হিম ধারার কলোচ্ছ্বাস—পাষাণে পাষাণে আহত হয়ে জল ফেটে পড়ছে।

একটি পাথর খণ্ডের ওপর বসে আছি। মনের মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রবৃত্তি। কী করেছি, কী দেখেছি আর কি শুনেছি। সবই লেখাজোকা আছে স্মৃতির ডায়েরীতে।

কেন এসেছিলাম এই দুর্গম পথে! কোন বাসনা, কোন আকাঙ্ক্ষার বীজ কি মনের গোপনে ছিল না? ছিল। কিন্তু কী সে বাসনা, কী সে আকাঙ্ক্ষা—তা যেন নিজেই জানি না।

বেলা আটটা বাজে। নটার মধ্যেই শুরু হবে প্রত্যাবর্তনের পালা। কিছুতেই ফিরে যেতে মন চাইছে না। মনে হয়, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এখানে না হোক হিমালয়ের কোলে কোথাও বাসা বেঁধে থাকি। কিন্তু এ সবই যেন অলীক কল্পনা। যা সহজে ভাবা যায়, তাতো সব সময়ে বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যায় না।

—শ্রীমন্তদা। কমলা ঘোষ ডাকছে। মা-পিসিকে নিয়ে সে যাত্রা শুরু করেছে। জিজ্ঞাসা করলে, আমরা তিনরাত্তির কাটিয়ে যাবো কিনা। বললাম, —না আজই যাবো। একটু বাদেই।

জয় নারায়ণ। গৌরীকুণ্ডে দেখা হবে।—বলে মা-পিসিকে নিয়ে কমলা রওনা হলো।

এরপর অলকানন্দার তীর ছেড়ে বাসায় এলাম। ওখানে বদ্রী-নারায়ণের মন্দিরে এসেছি দেবতাকে শেষ বারের মতো দর্শনের আশায়।

শেষ বারের মতো বলছি এই কারণে, দুর্গম তীর্থে বারবার আসা হয়ে ওঠে না। আরও দর্শনার্থীর সঙ্গে করজোড়ে আমার শেষ প্রণাম রাখলাম শ্রীনারায়ণের পায়ে। পূজারী ধীরেন ভট্ট নারায়ণের চরণতুলসী আর চরণামৃত দিলেন হাতে হাতে। তারপর কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে মন্দিরের সোপান বেয়ে নীচে নেমে এলাম।

শুনেছি বদ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে পিছন ফিরে দেখতে নেই। কেন দেখতে নেই, তার উত্তর কেউ স্পষ্ট করে দিতে পারে না। কিন্তু কেন ফিরে দেখবো না—তাই অলকানন্দার পারে এসেও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে দেখি বদ্রীনারায়ণের মন্দিরের শীর্ষদেশ। দেখি ধ্যানমৌন নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ, দেখি নর-নারায়ণ পর্বতের প্রচ্ছদপট।

—বাবুজী! পিছু পিছু আসছিল লালসিং। আমার সঙ্গে সে-ও দাঁড়িয়ে আছে।

—কিছু বলবে লালসিং।

—আপ চলিয়ে বাবুজী।

—চলো।

এসেছিলাম চড়াই পথে, চলেছি উৎরাই পথে। যে পথ অতিক্রম করেছিলাম সাড়ে চার ঘণ্টায়, সেই পথ এলাম পৌণে তিন ঘণ্টায়। হনুমান চটিতে পৌঁছে সাময়িক যাত্রা বিরতি। তারপর কিছু খেয়ে দেয়ে আবার পথ চলা।

হনুমান চটি থেকে সামান্য পথ এসেছি হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো দুটি ক্র্যাচের দিকে। পথের ধারে খাদের পাশে আগাছার মধ্যে পড়ে রয়েছে দুটি ক্র্যাচ। মনটা ছ্যাৎ করে উঠলো। ক্র্যাচ দুটি তুলসী দাসের।

শুধু দুটি ক্র্যাচ নয়, আরো নীচে একটি গাছের ডালে জড়িয়ে আছে কম্বল। ওই কম্বলটি মুণ্ডকাটা গণেশে প্রসাদদা দিয়েছিল তুলসীদাসকে।

মুহূর্তে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। তুলসীদাস নেই। খাদের গভীরে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টেনেছে। কুণ্ড চটিতে সেই মহিলাকে দেখে সে মনে করেছিল, সেই মহিলাই তার স্ত্রী সতী। তারপর থেকেই তুলসীদাস কেমন যেন হয়ে যায়, পাগলের মতো। পাগল সে হয়নি। পাগল হলে সে এমন করে মরতে পারতো না। তবে কি সেদিন তুলসীদাস সত্যিই তার সতীকে দেখেছিল।

তুলসীদাস! পথে যাকে দেখেছিলাম। তীর্থপথিকের ভিড়ে সে-ও একজন। কতো আশা নিয়ে, ভিক্ষা করতে করতে দুটি ক্র্যাচে ভর করে চলেছিল দুর্গম তীর্থে। ইহজন্মে তার সাধ আর পূর্ণ হলো না। স্বেচ্ছায় নিজেকে মৃত্যুর অন্ধকারে মিশিয়ে দিয়ে ব্যর্থ জীবনের অবসান ঘটালো!

—শ্রীমন্ত। প্রসাদদার কণ্ঠস্বর ভারী,—ক্র্যাচ দুটি দেখেই চিনেছি, তাছাড়া ও কম্বলটা আমারি ছিল। এসো দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

—লাভ লোকসানের কথা নয় প্রসাদদা, আমি ভাবছি সেই মহিলার কথা—

বলে আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরি প্রসাদদার হাত।—আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না—তুলসীদাস মরে গেছে।

প্রসাদদার মুখে করুণ হাসির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটলো। আমার কাঁধে হাত রেখে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে,—চলো—সবাই এগিয়ে গেছে।

—যাক্।

—তোমার কী হলো বলো তো শ্রীমন্ত?

—কিছু না। কিছু হলে তোমাকে বলে বোঝাতে পারতাম প্রসাদদা। বলে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলি।

পণ্ডুকেশ্বর পৌঁছতে সন্ধ্যে হলো। রাস্তার ওপরেই একটি চটির দোতলায় দুটি ঘর পাওয়া গেল। ঘর দুটি বেশ বড়ো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকালে তেমন খাওয়া দাওয়া কারো হয়নি। এসেই শ্রীমতী রজনী রান্নার তোড়-জোড় শুরু করলেন। কোথায় কাঠ, কোথায় কি, এই সব ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে উঠেছে লালসিং।

প্রসাদদা এই ঠাণ্ডার মধ্যেও গা ধুয়ে এসে বসলো চৈতন্য-চরিতামৃত নিয়ে। শ্রীমতী রজনী বললেন,—বারান্দার কোল ঘেঁষে বোসো প্রসাদ, আমার রান্না করাও হবে আবার চৈতন্য-চরিতামৃতও শুনতে পাবো।

সীমা বললে,—শেষে ধর্মকথা শুনতে গিয়ে তরকারীতে যেন দুবার নুন দিয়ে বসো না।

—তোর সব তাতেই ন্যাকামী। শ্রীমতী রজনী মুখ ঝাঁমটা দিয়ে বললেন, —কাজ না থাকে তো খৈ বাছ না। সব সময়ে পেছনে লাগা কেন।

সীমাও হার মানবার মেয়ে নয়। কথা না বলে কচি মেয়ের মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো।

—আবার ছেলেমানুষী শুরু করলি। ধাড়ী মেয়ে।

—এবারে আর বকলে কেঁদে ফেলবো কিন্তু। বলে মায়ের চিবুক স্পর্শ করে সীমা বলে,—আজ কি রান্না করবে মা। পাঁপড় ভাজা খেতে ইচ্ছে করছে। চলো, পাঁপড় ভাজবে।

—ভাজবো। খিচুড়ী আর পাঁপড় ভাজা। শ্রীমতী রজনী বললেন,—আর কিছু করবো না আজ।

—শ্রীমন্তদা, চলো তো গরম পকৌড়ী খেয়ে আসি। বলে সীমা রাঙাদিকে ডাকলো,—যাবে রাঙাদি। নীচের দোকানে পকৌড়ী ভাজছে দেখে এসেছি।

রাঙাদি এলো না। সীমাকে নিয়ে এলাম নীচের খাবারের দোকানে। গরম পকৌড়ি আর চা নিয়ে বসেছি দোকানের সামনে কাঠের পাটাতনের ওপর।

শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হলো দোকানে বসে থাকতেই। চটিতে জায়গা না পেয়ে ওরা আশ্রয় নিয়েছে কাছেই একটি দোকানে। বললাম,—আমাদের ঘরে জায়গা আছে। দরকার হলে চার পাঁচজনের ব্যবস্থা হতে পারে। বলে আমাদের চটি দেখিয়ে দিলাম।

—দরকার বুঝি তো তোমাদের ওখানে যাবো।—

—চা খাবে ?

—শুধু চা খেতে রাজী নই।

—আমরা যা খেয়েছি তাই খাবে। গরম পকৌড়ি আর চা।—এসো।

আজ শুভলক্ষ্মীকে কেমন মন মরা বোধ হলো। মুখে হাসির রেখাগুলো তেমন স্পষ্ট নয়। স্বচ্ছ দৃষ্টিও কেমন নিষ্প্রভ। কিছুটা উদাসীনও। কথা বলছে, কিন্তু কথার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ নেই। নিষ্প্রাণ।

দোকানে বসে থাকতে পরিচিত আরও নর-নারীর সঙ্গে দেখা হলো। অচেনা যাত্রীও দেখলাম। তারা বদ্রী নারায়ণের পথে পাণ্ডুকেশ্বরে রাতের মতো আশ্রয় নিয়েছে।

প্রতিটি চটি, দোকানে যাত্রীর ভিড়। পথশ্রমে সকলের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। রাতের মতো নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চাই।

শুভলক্ষ্মী চলে গেল বিদায় নিয়ে। বলে গেল, কাল সকালে আবার দেখা হবে।

সীমাকে নিয়ে চটিতে ফিরেছি। এদিকে শ্রীমতী রজনীর রন্ধন পর্ব শেষ। শুধু পাঁপড়গুলো ভেজে দিলেই হয়। খিচুড়ি আর পাঁপর ভাজা।

রাত সাড়ে নটা।

আহারাদির পর যে যার শয্যা গ্রহণ করেছি। শুধু প্রসাদদা বিছানা পেতে চুপচাপ বসে রইলো। ঘরের কোণে বাতি জ্বলছিল, আপনা থেকে নিভে গেল বাতাসে। অন্ধকার ঘর। চুপচাপ শুয়ে আছি সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে। বারবার তন্দ্রা আসছে। আবার সে তন্দ্রা ছুটে যাচ্ছে। কী যেন এক চিন্তার নাগপাশে জড়িয়ে রয়েছি আমি। ভাবছি—এবারের যাত্রাপর্বের কথা।

অশান্ত মনের তাড়নায় এসেছিলাম এই পথে, ফিরে চলেছি পুণ্যভূমি কেদার-বদ্রী দর্শন করে। অচেনা অজানা দেশে এসেছি, দেখেছি অদেখা দৃশ্য, পেয়েছি না-পাওয়া ঐশ্বর্য। নদী, পাহাড়, ঝর্ণা, অরণ্য, তুষারাচ্ছাদিত গিরিশৃঙ্গ—দেবতা, মন্দির, সাধু-সন্ন্যাসী—আর দেখেছি অগণিত তীর্থ-পথিককে।

কিন্তু কী দেখেছি, কী করেছি, কী শুনেছি—আজ কিছুরই হিসেব পাচ্ছি না। কতদিন হল এসেছি এপথে, বোধ হয় একমাস হয়ে গেছে—কিন্তু দিন তারিখের হিসেব নেই! শুধু এইটুকু জানি, এসেছিলাম যে পথকে সামনে রেখে, পিছনে ফিরে চলেছি সেই পথ অনুসরণ করে। আসার পথে যে উন্মাদনা ছিল, ফেরার পথে সে উন্মাদনার ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু জের টেনে চলার প্রবৃত্তি।

এলোমেলো চিন্তার খেই ধরে কখন যে চোখে ঘুম নামলো জানি না। শুধু এইটুকু জানি, প্রসাদদার ডাকে শেষ রাতে ঘুম ভেঙেছে।

প্রতিদিনের মতো আজও সূর্য ওঠার আগেই শুরু হলো আমাদের পথ চলা। আজই পায়ে হাঁটা পথের শেষ। যোশীমঠ থেকে আরম্ভ হবে সেই ক্লান্তিকর বাসে চলা।

ঘাট চটিতে পৌঁছে দেখা পেলাম শুভলক্ষ্মীর। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। ও আমাকে দেখতে পায়নি, নাম ধরে ডাকতে তবে ফিরে তাকালো। বললে—দাঁড়াও আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

তারপর দুজন একই সঙ্গে চলেছি। এক সময় শুভলক্ষ্মী বললে,—মনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে শ্রীমন্ত। আসার পথে মন যেন মাতাল হয়ে ছিল, আর এখন নেশাটা টুটে গেছে, শুধু অবশিষ্ট আছে অবসাদ। কদিন বেশ ছিলাম, না? বেশ আনন্দে কেটে গেছে। কতো দেখেছি, কতো শুনেছি—জীবনটা নতুন করে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু সে সব নতুনত্ব বিসর্জন দিয়ে আবার সেই পুরোনো জীবনকে ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছি। সত্যি, আজ যেন কিছুতে ভাবতে পারছি না, আমরা ফিরে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে কদিন অন্ধের মতো শুধু পথে পথে, চলেছি—কী দেখেছি, কী পেয়েছি, হিসেব মেলাতে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কেন বলো তো?

—অমন হয়। কেন তা বলতে পারবো না। বলে পাশাপাশি পথ চলি।

পথে যেতে যেতে আরও অনেক কথা বলে শুভলক্ষ্মী। আমি নীরব। শুধু ওর কথা গুলো একমনে শুনি। বেশ বুঝতে পারি পথের বিরহে কাতর হয়েছে শুভলক্ষ্মী। শুধু ওর মনে নয়, আমার মনের একতারাতেও আজ বাজছে বেদনার করুণ রাগিণী। আজই পৌছব যোশীমঠ। তারপর সেখান থেকে কে কখন কোথায় যাবে কে জানে! শুভলক্ষ্মী পিল্লাই ফিরে যাবে ওর দেশে—কেরলে। সেখানে কোনদিন নারিকেল কুঞ্জছায়ায় দাঁড়িয়ে কি ও ভাববে, কেদার বদ্রীর পথে একজন বাঙালী যুবকের সান্নিধ্যে এসেছিল ও। হয়তো ভাববে না। হয়তো কোনোদিন কেনো মুহূর্তে আজকের পরিচিত পথিক বন্ধুটির ছবি ওর মনের মুকুরে প্রতিফলিত হবে না। শুভলক্ষ্মী ফিরে যাবে ওর দেশে, যেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে ওর আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবী।

—একা শুভলক্ষ্মী নয়—যে, যে ঠিকানা থেকে এসেছে, ফিরে যাবে সেই ঠিকানায়। এ পথে আসাটা যেমন সত্যি, ফিরে চলাটা তারও চেয়ে আরও সত্যি। শুধু আসা-যাওয়ার কয়েকটা দিন হয়ে রইলো স্বতন্ত্র। লাভের অঙ্কে জমা রইলো কয়েকটা দিনের স্মৃতি। কিছু কথা, কিছু ঘটনা, আর কিছু—

—কী ভাবছো? শুভলক্ষ্মীর জিজ্ঞাসা শুনতে পেলাম। সে আসছে আমার পেছনে পেছনে। বললাম,—কী যে ভাবছি, তাই ভাবতে পারছি না।

শুভলক্ষ্মী হাসলো। মৃদু এবং করুণ ঝংকার ওর হাসিতে। বললে,—কদিন বেশ ছিলাম, না?

কথা না বলে মৃদু হেসে সমর্থন জানাই ওর কথায়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। এই মুহূর্তগুলো ভরে উঠেছে নানা চিন্তায়। অসংলগ্ন আর এলোমেলো সে চিন্তা।

'জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ'—অপরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু পরিচিত মুখ। মুহূর্তে মনের মধ্যেকার একতারাটি তীব্র নিখাদে বেজে উঠলো। ললিতা—মেয়েটির নাম ললিতা। গৌরীকুণ্ডে সেই দোকানে দেখেছিলাম। ওরই রান্না খিচুড়ি খেয়ে সে সন্ধ্যায় অমৃতের স্বাদ পেয়েছিলাম।

ললিতা আসছে ঘোড়ায় চেপে। দূর থেকে আমাকে দেখেই 'জয় নারায়ণ' বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কদিনে কতো বদলে গেছে ললিতা। গৌরীকুণ্ডে দেখেছিলাম, কতো ফর্সা ছিল ওর মুখ। সে মুখশ্রী অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। হবেই তো, পথের ক্লান্তি তো পথিককে ক্ষমা করবে না।

ললিতা ঘোড়া দাঁড় করিয়েছে। ভাবছে ঘোড়া থেকে নামবে কিনা। আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছি ওর মুখের দিকে চেয়ে। শুধু পরস্পরের চোখের পর্দায় পরস্পরের প্রতিবিম্ব, নয়তো কারো মুখে কোন কথা নেই। এই মুহূর্তে দেখা হওয়া যতো আনন্দের, তার চেয়ে শতগুণ বেদনা রয়েছে পরবর্তী মুহূর্তের জন্তে। চলে যেতে হবে পরস্পরের পথে—এই তো এই মুহূর্তে সবচেয়ে সত্যি কথা।

—জয় নারায়ণ, ললিতা অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে,—জয় নারায়ণ।

—জয় নারায়ণ।

এই সম্ভাষণ আর প্রতি সম্ভাষণ—এ ছাড়া আর কোন কথা নয়। পরক্ষণেই ললিতার ঘোড়া চলতে আরম্ভ করে। অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকি। এখনি তো ললিতা অদৃশ্য হয়ে যাবে অদূরে পথের বাঁকে। তবু দাঁড়িয়ে দেখি, যতক্ষণ তাকে দেখা যায়।

—ও মেয়েটি কে? শুভলক্ষ্মীর কথায় চমক ভাঙে। সত্যি, আমি যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

—তোমার চোখে জল কেন শ্রীমন্ত? শুভলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি কাঁদছো?

—দু ফোঁটা জল যদি ঝরে থাকে, ঝরুক না—বলে চলতে আরম্ভ করি। —জানো শুভলক্ষ্মী, জীবনের এক জায়গায় একটা তার বাঁধা আছে। সে তারটি বড়ো সূক্ষ্ম। একটু আঘাত লাগলেই বেজে ওঠে। আমি জানি পথের পরিচয় পথেই ফুরিয়ে যায়। ক্ষণিক মিলন যদি সত্যি হয়, তবে বিরহ মিথ্যে হবে কেন। তোমার আমার কথা ধরো, পথে দেখা হয়েছে, পরিচয় হয়েছে—তোমাকে কাছে পেয়ে যতোখানি আনন্দ পেয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ পাবো, যখন তুমি চলে যাবে আমার নিকট সান্নিধ্য থেকে। তুমি চলে যাবে কেরলে, যেখানে তোমার বাড়ী। আমাকে যেতে হবে ভেজা মাটির দেশ বাংলায়।

—তুমি বড়ো বেশী ভাবপ্রবণ।

—ও অপবাদ এর আগেও অনেকে দিয়েছে।

—দেবেই তো।

—আমার কথা অন্তরকম। আমাকে যারা সেন্টিমেন্টাল বলে, তাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন—সেন্টিমেন্ট বাদ দিয়ে কি মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে?

ঘাট চটি পার হয়ে কিছু পথ এসে দেখা হলো সীমা আর প্রসাদদার সঙ্গে। পাশাপাশি দুটি পাথরে বসে দুজন তালমিছরী চুষছে। আমাদের দেখে প্রসাদদা বললে,—এ রকম হাঁটলে যোশীমঠ পৌঁছতে বেলা দুপুর হয়ে যাবে হে।

—আজ এতো তাড়া কিসের প্রসাদদা। যখন হোক্ পৌঁছলেই হবে। বলে জিজ্ঞাসা করি,—আর সকলে কোথায়?

—এগিয়ে গেছে। প্রসাদদা উঠে দাঁড়ালো। জল পাত্র থেকে আলগোছে কয়েক ঢোক জল খেয়ে বললে,—চলো।

যেতে যেতে প্রসাদদা গান ধরল—

'আমি খুঁজে বেড়াই যারে,
যে আমার মনের মানুষ—তারে।
খুঁজে খুঁজে সারা হলাম
তবু তারে পেলাম না।'

কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই। শুধু তাই নয়, এই পথটুকু যেমন সংকীর্ণ, তেমনই বিপদজনক। সন্তর্পণে না চললে বিপদ অনিবার্য।

উৎরাই পথে নামতে দেখা হলো পূরবীর সঙ্গে। পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পায়ের পেশী টিপছে।

—কী হলো রাঙাদি? সীমা জিজ্ঞাসা করলে।

—আর পারছি না সীমা। পায়ের শিরগুলো এমন টেনে ধরেছে, কি বলবো। বলে অবসন্ন পূরবী গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

—পথ তো ফুরিয়ে এসেছে পূরবী। আর কিছু পথ গেলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ। তারপর যোশীমঠ সামান্য পথ। পূরবীকে সাহস দিয়ে বলি,—এসো—এটুকু পথ অনায়াসে হাঁটতে পারবে তুমি।

নীচে দেখা যাচ্ছে অলকানন্দার জল রেখা। কানে আসছে তীব্র জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। যতো নীচে নামছি সে শব্দ আরও স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর।

একটু আগেও আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। শুধু পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার ওপর ছিল ধূসর মেঘের সংকেত। দেখতে দেখতে সে মেঘ ছড়িয়ে পড়লো সারা আকাশে। উতলা বাতাস ফিরে এলো ঝড় হয়ে।

নিকটেই বিষ্ণুপ্রয়াগ। সামান্য দু-এক ফার্লং পথ। এ পথটুকুও নিশ্চিন্তে

অতিক্রম করা সম্ভব হলো না। এলো বৃষ্টি। মুষল ধারায়। ঝড় আর বৃষ্টি—প্রতিটি যাত্রীকে নাস্তানাবুদ করে তুললো।

ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে যাত্রীদল চলেছে বিষ্ণুপ্রয়াগের পথে। মাথা গোঁজার মতো নিরাপদ আশ্রয় আছে সেখানে। ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীদল নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছনোর ব্যাকুল আগ্রহে সংকীর্ণ পিচ্ছিল পথ ধরে হেঁটে চলেছে।

প্রসাদদা চীৎকার করে ডাকছে মাষ্টারমশায়কে।—দাঁড়ান মাষ্টার মশায়, আপনার মেয়েকে ধরুন।

সত্যি, পূরবীর দুর্দশা দেখে কষ্ট হয়। বেচারার স্কার্ফ উড়ে গেছে ঝড়ে। শাড়ি সামলাতে পারছে না। বারবার পিছলে যাচ্ছে পা। তবু দাঁড়াবে না। লাঠি ঠুকে ঠুকে উৎরাই পথে নামছে। সীমার হাতে ধরেছে প্রসাদদা। সীমার লাঠি কখন যেন হাত ফস্কে পড়ে গেছে খাদের মধ্যে। শুভলক্ষ্মী শক্ত মেয়ে, তবুও ভয় পেয়ে আমার একটি হাত চেপে ধরেছে। বারবার বলছে,—আমার ভীষণ ভয় করছে শ্রীমন্ত। কেবলই মনে হচ্ছে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে।

—ভয় কি শুভলক্ষ্মী।

—যদি পাথর গড়িয়ে পড়ে ওপর থেকে, যদি পা পিছলে পড়ে যাই। সভয়ে আমার হাত আরও জোরে আঁকড়ে ধরে শুভলক্ষ্মী।

—আমি তো আছি শুভলক্ষ্মী। যদি কিছু ঘটে—কথা শেষ হলো না। পিছন থেকে লালসিং আর শের বাহাদুরের চীৎকার শুনলাম—বাবুজী, বাবুজী—পত্থর গিরতা হৈ। বাবুজী—

ফিরে চাই ওপরের দিকে। বিরাট একখণ্ড পাথর পাহাড়ের শীর্ষ থেকে গড়িয়ে পড়ছে। কোথায় পড়বে কে জানে। চিন্তার সময় নেই। শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মাথা গুঁজে বসে পড়ি পথের ধারে। হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর আর কিছু মনে নেই। মনে করতে পারি না। কি যে ঘটে গেল, তা বলতে পারবো না। শুধু মনে আছে সেই মুহূর্তে আমার চোখে বিশ্বের জমাট বাঁধা অন্ধকার নেমে এসেছিল।

কদিন পর।

অবসন্ন চেতনায় চোখ মেলে চাইলাম। দিনান্তের আলো এসে পড়েছে

জানালার কাঁচের শার্সিতে। শার্সির আড়ালে দূরে কোন পর্বত শীর্ষ। শুনতে পেলাম একজনের উদ্দেশে আর একজনের উচ্চারিত আশ্বাস বাণী।—জ্ঞান হয়েছে।

দু চোখ বন্ধ করলাম। আলো যেন অসহ্য। সূর্য না নিভুক, আমার এই দুটি চোখের তারা অনায়াসে তার আলোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

অন্ধকার।

স্পষ্ট দেখছি সেই পাথর খণ্ডটি গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের শীর্ষ থেকে। শুভলক্ষ্মীর হাত ধরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। শুভলক্ষ্মী তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। যে দৃঢ় মুষ্টিতে আমার হাত ধরেছিল, তার সে বজ্রমুষ্টিও শিথিল হয়ে এসেছিল।

—বাবুজী—এক আর্ত চীৎকার সেই মুহূর্তে মর্মে এসে বিঁধেছিল। সে কণ্ঠস্বর পরিচিত। লালসিং-এর।

আবার চোখ মেলে চাইলাম। কাঁচের শার্সিতে তখনো দিনান্তের আলোর রক্তিম স্পর্শ। তখনো আমার অবসন্ন চেতনা জুড়ে আশ্চর্য এক কুহেলিকা। যেন অদেখা জগতে জন্ম নিয়েছি আমি, যেখানে সাথী শুধু দিনান্তের শেষ সূর্য।

তারপর কৌতুহলী দুটি মুখ দেখলাম। একজন নারী, একজন পুরুষ। কী যেন দেখছে আমার চোখের তারায়।

—আমি কোথায় এসেছি!

—যোশীমঠ হাসপাতালে। পুরুষ কণ্ঠ পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন,—আপনি আহত হয়েছিলেন।

—ও। আমার সঙ্গে আর একজন ছিল, তার নাম শুভলক্ষ্মী; সে—সে কেমন আছে?

ভদ্রলোক ফিরে চাইলেন—তরুণীটির মুখের দিকে। উত্তর দিলে তরুণীটি,—সে ভালোই আছে।

—সে ভালো আছে? স্বস্তির নিঃশ্বাসেও জ্বালা। বললাম,—তবে সে ভালো থাক। আর সবাই কোথায়?

—বাইরে অপেক্ষা করছেন একজন ভদ্রলোক, আর আপনার গাড়োয়ালী কুলি লালসিং।

—আপনি বুঝি ডাক্তার? বলে তরুণীর মুখের দিকে ফিরে চাই।

—আমি নার্স।

—বুঝেছি!

ডাক্তারের ইংগিতে ঘরে ঢুকলো প্রসাদদা। পেছনে লালসিং। লালসিং ঘরে ঢুকেই বাবুজী বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো। প্রসাদদা তাকে শান্ত করলে।

—প্রসাদদা।

—কী ভাই।

—জানি তুমি মিথ্যে বলবে না,—শুভলক্ষী কোথায়?

—সে ঠিকই আছে শ্রীমন্ত। তার জন্যে ভেবো না। বলে প্রসাদদা আমার শয্যা প্রান্তে বসলো।

ক্রমে আমি নিজের অবস্থা উপলব্ধি করি। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ডান পাটিও জখম হয়েছে। হাঁটুর কাছে প্লাষ্টার করা। তবে পায়ের আঘাত গুরুতর নয়।

এরপর একে একে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি। রজনীবাবু, মাষ্টারমশায়, শ্রীমতী রজনী, শাম্মিলতা, পূরবী, সীমা—তারা কেমন আছে, তারা কেউ আসেনি কেন? এসব জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রসাদদা একই কথা বলে,—কারো জন্যে অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না শ্রীমন্ত। এখন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর দেখবে সব কিছুই যেমন ছিল তেমনি আছে।

—আজ কদিন হলো, আমি এখানে আছি প্রসাদদা?

—আজ দুদিন।

—দুদিন! কিন্তু মনে হচ্ছে পথের সঙ্গে বাঁধা সুতোটা ছিঁড়ে এসেছি একযুগ আগে। স্মৃতির রং যেন ফিকে হয়ে গেছে। কী জানি, বারবার মনে হচ্ছে এই পৃথিবীটাই যেন আমার কাছে নতুন করে জন্ম নিয়েছে।

আরো কতো কথা বলার ছিল, কিন্তু বলা হলো না। ডাক্তারের কথা মতো প্রসাদদা আর লালসিং চলে গেল। যাওয়ার আগে লালসিং বলে গেল কাল আবার ও আসবে দেখা করতে।

তিন দিন, তিন রাত পার হয়ে গেল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় এসেছে প্রসাদদা আর লালসিং। কথা বলেছে, গল্প করেছে—কিন্তু ওরা কেউ আমার কথা শোনে নি, কোন জিজ্ঞাসার স্পষ্ট জবাব দেয়নি। বুঝতে পারি সব কিছুর মধ্যে বিরাট এক গরমিল রয়ে গেছে। তবুও মনকে বোঝাই হাসপাতালের বাইরে গিয়ে আবার সেই সব চেনা মুখের দেখা পাবো।

রাতে। ঘুম আসছে না। শুয়ে আছি। পাশে আরও কজন অসুস্থ নর-নারীর শয্যা। তার-ই মধ্যে একা বসে আছে নার্স দময়ন্তী মিশ্র। সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, যে আমাকে ঋণী করেছে। জানি না, দময়ন্তীর ঋণ শোধ করবার সুযোগ কোনদিন পাবো কিনা।

কদিন পর ম্লান স্মৃতিপট আবার স্পষ্ট চিন্তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সব চিন্তায় মধ্যেও এক দুশ্চিন্তা—হাসপাতালের বাইরে এসে কোনও পরিচিত মুখ দেখতে পাবো কি না। কেননা, আমার রোগশয্যায় আর কেউ তো এলো না। পূরবী তো আসতে পারতো। আর তো কিছু নয়, শুধু চোখের দেখা আর মুখের কথা। মাষ্টারমশায়ও কি একবার তাঁর স্নেহসম্ভাষণ জানাতে আসতে পারলেন না। কিন্তু কেন? কদিনের পরিচয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে কি এতটুকুও আত্মীয়তার স্পর্শ নেই! আর শুভলক্ষ্মী। ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব দেখে যে ভয় পেয়েছিল! যার দুর্বল হাত জড়িয়ে ধরেছিল আমার হাত! সেই পাথরটাকে গড়িয়ে পড়তে দেখে শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে আমি পাহাড়ের পাথরের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর কী হয়েছিল আর মনে নেই। সে, সে ত আসতে পারতো একবার!

তবে কি শুভলক্ষ্মী নেই!

নার্স দময়ন্তীর জল ভরা দুটি চোখের মৌন ভাষা বলে দিলে, শুভলক্ষ্মী আর এই পৃথিবীতে নেই।

বারবার আমি শুভলক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করি দময়ন্তীকে। উত্তর দেয় না দময়ন্তী, অন্য কথার অছিলায় আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। তারই মধ্যে দেখি দময়ন্তীর দুটি চোখে জল টলমল করছে। যে কথা সে বলতে পারলো না তার মুখের ভাষায়, সে কথা স্পষ্ট হয় তার চোখের জলে।

যদিও তারপর দময়ন্তী সব কথা বলেছে আমাকে। পাথরের আঘাতে আহত, অচেতন দুটি তরুণ-তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে একদল যাত্রী। হাসপাতালে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অপর তরুণটি আর কেউ নয়, আমি। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে জীবনের আশংকা প্রকাশ না করলেও, ভেবেছিলেন, হয়তো স্মৃতিশক্তি চিরতরে নষ্ট হতে পারে আমার। কিন্তু সে আশংকা মিথ্যে হয়ে গেছে। আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয়নি।

দুচোখ জলে ভরে উঠলো। শুভলক্ষ্মী নেই। এই পৃথিবীর সঙ্গে সব

দেনা-পাওনা চুকিয়ে চলে গেছে অন্তলোকে। যাক্। যে যাবে, সে চলে যাক। কিন্তু আমাকেও সে নিয়ে গেল না কেন? সেখানে তার একা থাকতে ভয় করবে না!

দময়ন্তী মুছিয়ে দিলে আমার চোখের জল। বললে,—ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

—হাঁ। ম্লান হেসে বলি,—আমাকে যে এখনো বাঁচতে হবে।

রাত ভোর হলো।

ঘুম ভাঙতে দেখি প্রসাদদা আর লালসিং এসে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আমাকে নিতে এসেছে।

আজ-ই আমি মুক্তি পাবো।

—প্রসাদদা, শুভলক্ষ্মীর দেহটাকে ছাই করে দিয়েছো কোথায়?—আর সত্যি কথাটা গোপন কোরো না। আমাকে একবার নিয়ে যেতে হবে সেখানে। কিছু না পারি তার চিতাভস্মের ওপর দুফোঁটা চোখের জল তো দিয়ে আসতে পারি। প্রসাদদার দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলি,—প্রসাদদা আমি সব জানি। শুভলক্ষ্মী নেই।

—আমি তোমাকে ঠিকই নিয়ে যাবো সেখানে। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলেছেন, মনটাকে কিছুদিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম দেবার জন্যে।

—আমার মানসিক বিপর্যয় ঘটবার আর সম্ভাবনা নেই প্রসাদদা।

প্রসাদদা আমার কথা শুনে মৃদু হাসলো। বললাম—আর সবাই চলে গেছে বোধহয়। এখন বুঝতে পারছি, শুধু তুমিই আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছো, তুমিই শুধু আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারলে না। কেন বলো তো?

প্রসাদদা আমার একটি হাত আলতো ভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে এনে মৃদু হেসে বললে,—ছেড়ে যেতে পারিনি শ্রীমন্ত।

তারপর একে একে পরিচিত সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি। সকলেই কুশলে আছে।

শুনলুম, সেই দিনই রজনীবাবু আর মাষ্টারমশায় আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে পিপলকুঠির উদ্দেশে রওনা হন। যাবার আগে সীমা নাকি আমার জন্যে খুবই কেঁদেছিল। সে যেতে চায়নি। বাসে ওঠার আগে পর্যন্ত তার সে কী আকুতি। বাসে উঠেও প্রসাদদাকে ডেকে বলেছিল, ও কেমন থাকে, হরিদ্বারের ভোলাগিরি আশ্রমে টেলিগ্রাম করে জানিও প্রসাদদা।

সেখানে আমরা কদিন থাকবো। শ্রীমন্তদা সুস্থ হলে তাকে আমার কথা বোলো।

বোধহয় সীমার জন্যেই আমার দুটি চোখ জলে ভরে উঠলো। অনুচ্চকণ্ঠে বললে প্রসাদদা,—কাঁদছো কেন শ্রীমন্ত, তুমিতো একাই এসেছিলে।

সত্যি কথা। আমি একাই এসেছিলাম। সাথী ছিল আমার বাউল মন। সে যেমন ছিল তেমন আছে।

—এই লালসিং—প্রসাদদা বললে,—তোমার জন্যে ওর যে কী আকুলি বিকুলি, কী বলবো।

লালসিংকে কাছে ডাকলাম। টেনে নিলাম ওর হাত দুটি। বললাম, —তোমার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না লালসিং—যদি আবার কখনো এ-পথে আসি, তোমার জন্যেই আসবো।

—বাবুজী, তুমি আজই চলে যাবে? লালসিংয়ের কণ্ঠস্বরে কান্নার আবেগ।

—বোধহয় আজই যেতে হবে। শুনে লালসিং আর দাঁড়ালো না, দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে চলে গেল ঘরের বাইরে।

হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স—যাঁরা আমাকে সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে ঋণী করেছেন, তাঁদের সবাইকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসপাতালের বাইরে এলাম। হাসপাতালের বাগান থেকে দুটি আধ ফোটা রক্তগোলাপ তুলে এনে দময়ন্তী আমাকে উপহার দিলে। সে রক্ত গোলাপ দুটি সানন্দে হাতে নিয়ে বলি,—আমার মনে থাকবে, দূরদেশী এক পথিককে ভগ্নি দময়ন্তী দুটি সুন্দর গোলাপ উপহার দিয়েছিল।

পথে নেমে প্রসাদদা মনে করিয়ে দিলে শুভলক্ষ্মীর চিতাশয্যা দেখার কথা। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলাম অচঞ্চল। মনের মুকুরে ভেসে উঠলো কেরল-কন্যা শুভলক্ষ্মী পিল্লাই-এর অম্লান প্রতিবিম্ব। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়লো গাল বেয়ে। যোশীমঠের পথের ধুলোয় সে জলবিন্দু মিশে রইলো।

শুভলক্ষ্মী নেই। সে চলে গেছে আর এক পৃথিবীতে। যেখানে জীবন অনন্ত। যেখানে জন্ম-মৃত্যুর সীমার মধ্যে জীবন চিহ্নিত নয়। শুভলক্ষ্মী চলে গেছে সেই অমৃত লোকে। সেখানে অনন্ত সুখ-শান্তি তাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করুক।

—যাবে না? প্রসাদদা জিজ্ঞাসা করলে।

—না।

—